ইতস্ততঃ

বহু লক্ষ যুগান্তর-'সাময়িকী' পাঠকের অভিনন্দন প্রাপ্ত ইতস্ততঃ বাংলা সাহিত্যে অভিনব ব্যঙ্গ কৌতুকের ধারা। চলতি খবর বা সমকালীন আলোচিত বিষয় নিয়ে কৌতুক সৃষ্টির নামে আসল-সত্যটির দিকে তীর্যক দৃষ্টিপাত। গুরু বিষয়ে লঘু আলোচনা, কদাচিৎ গুরুও। আলোচনায় সবাই আছে। ভাইরাস, উট, হাতী, বানর, হনুমান সাপ, ব্যাঙ, সিনেমা, থিয়েটার ট্রাম বাস ভিখারী, স্কুল ফাইন্যাল, আত্মহত্যা, বিবাহ, প্রেম বোমা, পরীক্ষার খাতা ছেঁড়া, চুরি, প্রতারণা, জালিয়াতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কুমারী, সধবা, বিধবা, বিবাহবিচ্ছেদ, পুলিস, দেবদেবতা, সবাই একাসনে। একটা যুগের সমাজ চিত্র। আড়ম্বরহীন ঘটনার ভিতর দিয়ে সবাইকে দেখা। শুধু দু'হাতে দু'খানা দর্পণ—একখানা কংকেভ আর একখানা কনভেক্স। দর্শনীয় বস্তু কখনো বেজায় বেঁটে দেখাচ্ছে, কখনও বেজায় লম্বা দেখাচ্ছে। এ দু'য়ের যোগে মোটের উপর একটা সামঞ্জস্য বজায় থাকছে।

লেখক-পরিচিতি

এই গ্রন্থের লেখক পরিমল গোস্বামী পাবনা ও পরে ফরিদপুর জেলার অধিবাসী। পিতা বহুভাষাবিৎ, কবি, প্রবন্ধলেখক ও গ্রন্থকার প্রদীপ, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকার লেখক বিহারীলাল গোস্বামী, পাবনা জেলার এক হাই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন।

লেখক ১৯২০ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি এ পাস করেন এবং ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীতে অল্প দিন শিক্ষালাভ করেন। তারপর ১৯২৩ সালে নন-কলিজিয়েট পরীক্ষার্থী রূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাস করেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ প্রবন্ধলেখক রূপে। তারপর বনফুলের সঙ্গে কিছুদিন একত্র বাসকালে ছোট ছোট ব্যঙ্গ রচনা লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯২৬ সালে মাসিক বসুমতীতে প্রথম ব্যঙ্গ গল্প প্রকাশিত হয়। তারপর কল্লোল, উপাসনা, প্রভৃতি কাগজে লেখেন। ১৯৩২ সালের শেষে সুপ্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ-মাসিক শনিবারের চিঠির সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৬-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন।

১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে প্রতি সপ্তাহে সিনেমা ও থিয়েটার সমালোচনা করেন। ১৯৩৮ সালে এক বছর সচিত্র ভারত, ও ১৯৩৯ সালে কিছুদিন সবুজপত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর সহযোগী রূপে অলকা মাসিক সম্পাদনা করেন।

১৯৪৫ মার্চ থেকে যুগান্তর ম্যাগাজিন সেকশনের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

লেখকের অন্যান্য বই

বারো ভূতের আসর
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প
ম্যাজিক লণ্ঠন
সপ্তপঞ্চ
পথে পথে
মারকে লেঙ্গে
ট্রামের সেই লোকটি
ঘুঘু
স্মৃতিচিত্রণ
ইত্যাদি

ইতশ্চেতঃ

এককলমী

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
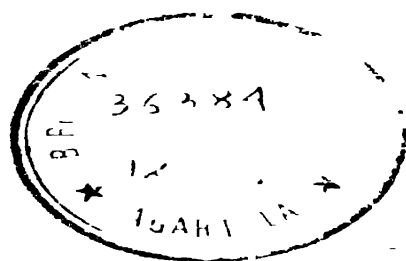
প্রকাশক :
ডি মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী :
অহিভূষণ মালিক

মুদ্রক :
শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড

দাম : ছয় টাকা

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ

করকমলেষু

ভূমিকা

গত ১৯৫৩-৫৫ পর্যন্ত যুগান্তর সাময়িকীতে প্রকাশিত ইতস্ততঃ পর্যায়ের লেখা থেকে বাছাই ক'রে এই সঙ্কলনটি প্রকাশ করা হ'ল। এতে বিষয় ভেদে পৃথক শিরোনামা অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। উপরন্তু প্যারাগ্রাফের পর নম্বর এবং যতগুলো প্যারাগ্রাফ এক তারিখে শেষ হয়েছে, সেই তারিখটি সেখানে দেওয়া আছে। ইংরেজী তারিখ ব্যবহৃত হয়েছে সর্বত্র।

কয়েক বছর আগে থেকে বাংলা 'পান্‌'গুরুগৌরবম্লানকারী উদার হৃদয় বন্ধু শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং গাঁঠের পয়সা খরচ ক'রে ইতস্ততঃ-র একটি সংকলন প্রকাশে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। ছ' বছর আগের লেখা তার একখানি চিঠি।

১৩৪, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭, ২২-৭-৫৬

সনমস্কার নিবেদন

আপনার লেখার আমি একজন ভক্ত জানেন নিশ্চয়। আপনার 'এককলমা'র তুলনা হয় না। গত কয়েক হপ্তা ধ'রে কী অদ্ভুতই যে লিখছেন! হিউমারের জগতে আপনি এক নতুন রস সৃষ্টি করেছেন, নতুন এক ব্যঞ্জনা। কমলাকান্তের আসরের মত এককলমীরও বাছাইকরাগুলি বই আকারে বেরিয়ে বাংলা রস সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করা উচিত।

শিবরাম চক্রবর্তী

এতদিন পরে তার প্রস্তাব রক্ষা করা সম্ভব হ'ল, এ ঘটনা আমার পক্ষে নিশ্চিত আনন্দের।

ইংরেজীতে যাকে Joke book বলে এটি তা নয়। ইতস্ততঃ-পাঠক মাত্রেই জানেন এতে কখনও সংবাদ, কখনও সাময়িক অন্য কোনো বিষয়, এবং মাঝে মাঝে পাঠকদের চিঠি নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

এই বইতে সঙ্কলিত ইতস্ততঃ অধ্যায়গুলোর মূল উদ্দেশ্য কৌতুক সৃষ্টি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচিত বিষয়বস্তু আপনা থেকেই কৌতুকের সীমা ছাড়িয়ে

গেছে। অনেক আলোচনা ব্যঙ্গপ্রধান হয়ে উঠেছে, অনেক আলোচনা বিশেষ দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশেষকে অতিক্রম ক'রে গেছে।

ইতস্ততঃর আপাত-মূল্য যাই হোক, এতে এমন সব বিষয় আলোচিত হয়েছে ভবিষ্যতের দূরত্ব থেকে দেখলে যার ভিতর তখনকার গতদিনের সমাজের কোনো কোনো দিকের এক একটা অন্তরঙ্গ ছবি নিশ্চয় দেখা যাবে।

রূপা অ্যাণ্ড কোং-র শ্রী ডি. মেহ্‌রার উদ্যোগেই এ বইয়ের প্রকাশ সম্ভব হ'ল। এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ ব্যাপারে রূপার তরুণ কর্মী শ্রীপ্রভাস ঘোষ যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন সে জন্য তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে বক্তব্য—ইতস্ততঃর লেখক 'এককলমী' ও পরিমল গোস্বামী একই ব্যক্তি এমন ধারণা অনেকের আছে। এ জন্য তাদের দোষ দিই না, কেনন৷ আমার নিজেরও তাই ধারণা।

— লেখক

কলকাতা

চোরের সাপ্তাহিক ভাগ্য

'একই রাত্রে দুটি চোর বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরা পড়েছে—শ্যামনগরের খবর। তারিখটি ১৮ জুন ১৯৫৩। ঐ 'সপ্তাহ কেমন যাবে' পাতা খুলে দেখছি ঐ দুজন চোরের জন্মরাশি মেষ, মিথুন, কন্যা অথবা মীন। এর প্রত্যেকটাতেই লেখা আছে—ব্যবসা সুবিধের নয়। ১

বিবাহ ও পুলিশ

নওয়াদার এক খবরে প্রকাশ ৪০ বছরের এক যুবক ৩ বছরের এক তরুণীকে বিয়ে করতে এসে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। কনে গেছে সিভিল সার্জনের হেপাজতে, বর গেছে পুলিসের হাতে। দায়িত্ব ভাগাভাগিটা প্রায় সিভিল ও মিলিটারি বিভাগেরই তুল্য। তবু পুলিসকেই বেশি বুদ্ধিমান মনে হয়, কারণ বরকে দিয়ে কাজ করানো যাবে, কিন্তু এই চড়া বাজারে কনের দুধ যোগানো সিভিল সার্জনের পক্ষে সহজ হবে না। ২

কিন্তু এ রকম বিয়েতে বাধা দেওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। হরণের অভিযোগ নেই, ফুসলানোর অভিযোগ নেই, সম্পূর্ণ নীতিসঙ্গত কাজ। ব্যাপারটা সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে পুরে দেখলে গর্হিত মনে হয়, কিন্তু বিবাহ তো একদিনের জন্য নয়। দূর কালের মধ্যে বিস্তার করে দেখলে দেখা যাবে বরের বয়স যখন ১০০ পূর্ণ হবে, কনের বয়স তখন হবে ৬৩। দু'জনেরই দাঁত নেই। চুল শাদা, সর্বাঙ্গে বাত, দৃষ্টি ক্ষীণ অথবা ছানি-আচ্ছন্ন, চিত্ত ঊর্ধ্বলোকে উধাও। কিন্তু অব্যবহিত বর্তমানকে নিয়েই পুলিসের কারবার, কে কার কথা শোনে। ৩

প্রসঙ্গতঃ দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রবাক্য সার্থক ক'রে আজকাল বিবাহে ব্যতিক্রমের সংখ্যা যেন বেড়েই চলেছে। কলকাতায় এক বিয়ের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় বাধা দিয়েছে, কানপুরে ট্রেনের মধ্যে সদ্য বিবাহিত এক বর খুন হয়েছে, ফতেগড়ে এক কনে দেখিয়ে চারজন বরকে প্রতারিত করা হয়েছে। এটা কি তবে বর্বর যুগ চলছে এদেশে? ৪

একই সঙ্গে

এ সপ্তাহেও পাকিস্থানের টাকার মূল্য হ্রাসের আর একটি গুজব ও তার প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয় এতাবৎ মূল্য হ্রাসের গুজব ও তার

প্রতিবাদ একই সঙ্গে এসেছে। কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এখন প্রতিবাদটিই আগে ছাপা হয়ে না যায় সে বিষয়ে পাকিস্থানের সতর্ক থাকা দরকার। ৫

স্বর্গ ও নরক

এভারেস্টের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ চুলি শৃঙ্গের একক অভিযাত্রী যে সাফল্য লাভ করতে চেয়েছিলেন তা বোধ হয় চুলোয় গেল। সবাই সন্দেহ করছে নাকোর মহাশয়ের দাবীকে। টি নোরকে ও পি নাকোরে এইখানেই তফাৎ। ৬

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। তেনসিং নোর্‌কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়া থেকে সী লেভেলের সমতলে নেমে এসেও থেমে নেই। এর পর আবার খবর বেরিয়েছে বোম্বে সিনেমা তাঁকে ডাকছে। এবারে বোধ হয় কত নিচে নামা যায় তার পরীক্ষা হবে। সত্য হ'লে নরকের পথেও নোর্‌কেই জিতবেন, আশা করা যায়। ৭

গম ও গম্ ধাতু ✓

খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন "চালের দর কমানোর জন্য এবং খাওয়ার অভ্যাস বদলাবার জন্য আরও গম খাও।"—বাঙালীর সত্যিই গম খাওয়া উচিত। দুর্গম পথের অভিযাত্রী হতে চাও, গম খাও, সংসার পথ সুগম করতে চাও, গম খাও, গেম-এ সাফল্য লাভের জন্য গম খাও, গাম্ শক্ত করতে চাও, গম খাও। বাদশা-বেগম সবাই গম খান, তোমরাও খাও। গম না খেলে তোমরা করবে উপবাস, অন্যেরা করবে উপহাস। নইলে কবি কালিদাস কি আর বৃথাই বলেছিলেন "গমিষ্যাম্ উপহাস্যতাম্?" ৮

মূলধন

সিনেমার যন্ত্রপাতি চুরি ক'রে পালাতে গিয়ে এক ব্যক্তি ধরা পড়েছে। সে যে সব সামগ্রী চুরি করেছিল তার দাম প্রায় পৌনে তিন হাজার টাকা।

সিনেমা ছবির জন্য এই সামান্য মূলধনটুকু যোগাড় করতেও এদেশে কত ফ্যাসাদ। ভাল ছবি হবে কি ক'রে? ৯

ধরা ভাল কি ছাড়া ভাল

সম্প্রতি বিনা টিকিটে রেলভ্রমণকারীদের ৩২ জন দণ্ডিত হয়েছে, এদের মধ্যে একজন চালের চোরাকারবারীও ছিল। দণ্ডিতদের মধ্যে ২৯ জনের প্রত্যেকের ২১ দিন ক'রে বিনাশ্রমে জেল ও বাকী তিনজনের ২৫ টাকা হারে জরিমানা।

এই শাস্তিবিধানের ফলে কার লাভ বেশি হ'ল ভাবতে গেলে ধাঁধা লাগে। জমা খরচের ভাষায় রূপান্তরিত করলে কি হয় দেখা যাক—

জমা—

(১) ৩ জনের জরিমানা—২৫ টাকা হিসাবে—৭৫৲

(২) ১ জনের চোরাই চাল আটক—অনুমান—১৫৲

খরচ—

(১) ২৯ জনের ১ দিন জেলে বিনামূল্যে খাওয়ানো—
দৈনিক জনপ্রতি ন্যূনপক্ষে ॥০ আনা হিসাবে—৩ ৭।

(২) বিচার খরচ—অনুমান — ১৫৲

তাদের বিচারালয়ে চালান হেঁচড়া খরচ—
অনুমান—৫।০

(৩) ট্রেনভাড়া অনাদায়—অনুমান ১৲ হিসাবে—৩৲

৩৫৭৲

খরচ থেকে জমা বাদ দিলে মোট লোকসান দাঁড়াচ্ছে ২৬৭ টাকা। ওদের না ধরে ছেড়ে দিলে লোকসান হত ৩২ টাকা। এখন ভেবে দেখুন, ধরা ভাল কি ছাড়া ভাল? .০

চেরাপুঞ্জির পরাজয়

চেরাপুঞ্জির চিরপুঞ্জিত মেঘ এবারে কোন্ বিরহী যক্ষের দূত হয়ে বোম্বাইয়ের অলকায় গেল কে জানে। কিন্তু বাজে কল্পনায় না যেয়ে সোজা সাংখ্যীয় ভাষায় বলতে পারি কি যে চেরাপুঞ্জি এবারে তার চিরপুঞ্জিবাদ ছেড়ে দিল? কেননা ১লা জুন থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি হয়েছে ১৮.৮ ইঞ্চি, আর বোম্বাইতে হয়েছে +১৭ ৭ ইঞ্চি। প্রথম স্থানে স্বাভাবিক থেকে প্রায় [illegible] ইঞ্চি কম, দ্বিতীয় স্থানে স্বাভাবিক থেকে ১৪ ইঞ্চি বেশি। হায় চেরাপুঞ্জি, এতদিন অতিবৃষ্টিতে তুমি নিজে ডুবতে এবার কম বৃষ্টিতে তোমার নাম ডুবল। ..

ধূমপান বাতিল

১লা জুলাই তারিখে ট্রামওয়ে হেড অফিসে আমার এতদিনের ধূমপানের

লাইসেন্সখানা জমা দিয়ে মাসিক টিকিট কিনে এনেছি। ঐ লাইসেন্স করে রিনিউ করা যাবে জানা যায়নি। ১২, ৫-৭৫৩

* ত্যাগেই মোক্ষ

রাজগোপালাচারী বলেছেন বাস্‌এর আসন থেকে গদি খুলে দেওয়া হোক. তোমরা সব কাঠের আসনে বসা অভ্যাস কর। এর সমর্থনে তিনি অনেক যুক্তিও দেখিয়েছেন। আমাদের একে একে তো সবই ওঁরা খুলে নিয়েছেন—জামা, কাপড়, জুতো—সবই গেছে, এখন চার পয়সায় গদিতে বসার বিলাসিতাও যাবে। ১৩

* মরফিয়া

ঝাবভাঙ্গায় মায়া মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রভা সিংহ নামক দুজন নার্স পরম্পর মরফিয়া ইনজেকশন নিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মরফিয়া বা অন্য বিষের সাহায্যে আত্মহত্যা নতুন নয়। কিন্তু কেন এমন যে মৃত্যুর ওষুধ সহজে মেলে, বাঁচার ওষুধ মেলে না? কেন মরফিয়াই তৈরি হ'ল, অমর-ফিয়া তৈরি হল না? ১৪

গোরুর নতুন ভূমিকা

বালেশ্বরের খবর, সেখানে সরকারী অফিসে গোরু প্রবেশ ক'রে পুনর্বাসন ও সাহায্য বিভাগের কয়েকটি মূল্যবান ফাইল খেয়ে ফেলেছে। গোরু কত টাকা খেয়ে এই কাজে রাজি হয়েছিল স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা হয়। অর্থাৎ, জানতে ইচ্ছা হয়, ওখানে শস্তা না এখানে শস্তা? ১৫

* কুয়োর মধ্যে দেবতা

মুর্শিদাবাদের খাইপুর এলাকায় এক কুয়োর জল শত শত লোক পান করছে। প্রচার—সেই কুয়োতে দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এটি খবর নয়, কেননা দেবতারা প্রকাশ্য স্থানে কবেই বা ছিলেন? তাঁরা কুয়োতেই তো থাকেন। আসল খবর হচ্ছে তিনি ধরা পড়েছেন। ১৬

বছরখানেক আগে বীরভূম জেলার কোনো এক পুরনো ভাঙা সেতুর ইট-সুরকী সরাবার দরকার হয়েছিল, কিন্তু খরচের ভয়ে সোজা উপায়ে কার্যসিদ্ধি অসম্ভব হয়। তখন এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি প্রচার করলেন এই ভাঙা সেতুর ইটের গুঁড়ো খেলে সকল ব্যাধি দূর হয়। এই

প্রচারের সাতদিন পর দেখা গেল উক্ত সেতুর চিহ্ন নেই, সবাই খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছে ১৭

কলকাতার পুরনো বাড়ি সম্পর্কে কর্পোরেশন যদি এই কৌশল অবলম্বন করেন তা হ'লে অনেক টাকা বেঁচে যাবে। একখানা তিনতলা বাড়ি মায় ভিতসুদ্ধ খেতে শহরের লোকের দুদিনের বেশি লাগবে না। আমরা কিন্তু প্রস্তুত আছি।

১৮, ১০। ৫৩

হিংসা বনাম অহিংসা

গান্ধীজীকে প্রণামান্তে নিবেদন, হিংসা বা ভায়োলেন্স পারস্পরিক না হ'লে জমে না। বলতে কি, কোনো কিছুই পারস্পরিক না হ'লে জমে না। হরতালও তাই। সেই জন্যে ট্রাম ভাড়া বাড়াতে একপক্ষ যখন হরতাল করল, তখন জমল না। জমল, যখন প্রথম ট্রাম কম্পানি এবং পরে ট্রাম কম্পানির কর্মীরা হরতাল শুরু করল। (হরতাল আর ধর্মঘটে তফাৎ আছে কি? ১২ ঘণ্টার বেশি হলেই বোধ হয় হরতালকে ধর্মঘট বলে?) বাকী রইল সরকার। সরকার হরতাল করে না কেন? সরকারের কি ক্ষোভ নেই কিছু? তাই বিক্ষোভ প্রদর্শন দরকার হয় না? আসর সম্পূর্ণ জমাতে হ'লে সরকারকেও হরতালে নামতে হবে একদিন। যা মজা হবে! অনার্কির স্থলে অনার্কি! — ইয়ার্কি নয়। ২০

পত্রিকার রায়জির ইঙ্গিতও কি তাই? তিনি বলেছেন, যা ছিল ওয়েলফেয়ার স্টেট, তাই হল গিয়ে ট্রাম ফেয়ার স্টেট। পরের ধাপটি বললেন না কেন? সেটি হচ্ছে ফেয়ার ওয়েল, স্টেট! ২০

ঘটনাপুঞ্জ সেইদিকেই চলছিল—এবারের মতো বাঁচা গেছে। এ কদিনে অনেক ঘটনাই ঘটে গেল। বাইরের জনৈক ভদ্রলোক একদিন পথে প্রশ্ন ক'রে বসলেন, মশাই এখানে ট্রাম চলে না, বাস চলে না, শহরে জীবনও দেখছি আপনাদের অচল, এর মানে কি? বলতে বলতেই দূরে দুদান্ত বোমার আওয়াজ এবং গুলি। তিনি নিজে থেকেই তখন বললেন—শুধু বুঝি বোমা আর গুলি চলে? পাশের এক ভদ্রলোক বললেন, না, অ্যাসিড এবং লাঠি (মৃঃ)-ও চলে। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেই চলতে লাগলেন। ২১

আনন্দ ও শিক্ষা

জনৈক পত্র-প্রেরকের মতে ভবিষ্যৎ হরতাল বা ধর্মঘটে স্কুলের ছেলেদের নিয়ে যেন টানাটানি না হয়। তিনি বলেন, বৎসরে পাঁচ ছ মাস ছুটি থাকে, উপরন্তু এই সব কাজে আরও বহু সময় নষ্ট হয়, পড়াশোনা হবে কি ক'রে? কিন্তু সময় কি সত্যই নষ্ট হয়? কারণ আমোদ প্রমোদের ভিতর দিয়ে শিক্ষা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে এক ঘণ্টার আমোদে যত শিক্ষা হয়, দু ঘণ্টার আমোদে তার দ্বিগুণ হয়, চার ঘণ্টার আমোদে তার চতুর্গুণ হয় এবং সংবৎসরের আমোদে যে শিক্ষা হয়, তার আদি অন্তই পাওয়া যায় না। ২২

বামপন্থী ও বামপন্থী

তারা ব'সে ছিল বর্ধমান কর্ড লাইনের বেগমপুর স্টেশনে—রেল লাইনের উপর। তারা বিক্ষোভকারী। তারা রেল চলায় বাধা সৃষ্টি করে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিসের শিবস্থা। চুরি ক'রে তাদের একজন গাছে উঠে পড়ে। পুলিস লাঠি (মৃ) চার্জ করে। তারা বানর। তারাই রামের লঙ্কা জয়ে সাহায্য করেছিল। এতদিনও তারা ছিল বামপন্থী, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনের পর থেকে তারা আর বামপন্থী নয়, বামপন্থী। শহরের আন্দোলনে তারা আক্সিলিয়ারি দল হিসাবে বর্ধমান এলাকার ভার নিয়েছিল। অবশ্য কলকাতা শহরেও আধুনিককালের অনেক বাম (বাজ্য) পন্থীকে বামপন্থীতে পরিণত হতে দেখা গেছে। ২৩

সবকথা লেনিনের নয়

কোনো সিনেমা ছবির বিজ্ঞপ্তিতে এক জায়গায় বলা হয়েছে "লেনিন একদা বলেছিলেন সুস্থ শরীরই হচ্ছে সুস্থ মনের পরিচায়ক।" আসল ব্যাপার তা নয়। লেনিন বলার অনেক পূর্বে কথাটি ল্যাটিন ভাষায় তার পূর্ববর্তী কেউ বলে থাকবেন, যথা—"mens sana in corpore sano."—তারপর থেকে লেনিন, নলিন, নীলু, নীলা, নেলো, নেলি এমনকি নুলোরাও ঐ কথাই বলছে একটু রকমফের ক'রে। ২৪

কেবলং জন্মহেতবঃ

মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশপ্রার্থী ছাত্রদের জ্ঞানের নমুনা ছাপা হয়েছে। প্রশ্নের যে সব উত্তর ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে একটি অন্ততঃ অজ্ঞতাপ্রসূত নয় ব'লে মনে হয়। প্রশ্ন ছিল What is your father? তার উত্তরে একটি ছেলে বলেছিল

He gave me birth. ("তোমার বাবার পরিচয় কি বা কি করেন?" "তিনি আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন।") অর্থাৎ পিতার আর কোনো পরিচয় নেই। দেশের অবস্থা বিবেচনায় এই উত্তরটি অজ্ঞতাপ্রসূত বলা বোধ হয় ঠিক নয়। পরীক্ষক যদি সন্ধান নিতেন, তা হ'লে হয়তো তিনি বুঝতেন, ছেলে ঠিকই বলেছে। পিতার বেকারত্ব বা অকর্মণ্যতায় পুত্র তিক্ত অভিমানবশতঃ একথা যদি বলে, তবে তাকে অজ্ঞতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কবি কালিদাস-বর্ণিত কমিউনিস্ট রাজা দিলীপের রাজ্যেও তো পিতাদের এই পরিচয়ই ছিল। কালিদাস সেই কথাই বলেছিলেন, "স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" দিলীপের রাজ্যের পিতার অন্য কোনো পরিচয় ছিল না জন্মদাতা ভিন্ন। পুত্রের ভার বইত রাজা।

২৫. ৮. ৭৫

* উৎপাদন ব্যাখ্যা ২

এই নিষ্কর্মার দেশে উৎপাদন বাড়াও শুনে শুনে লোকের মাথা খারাপ হয়ে আছে। কি উৎপাদন বাড়াবে? তাই তো কথাটির অর্থ নিয়ে যত গণ্ডগোল। কিন্তু ট্রাম কম্পানি কথাটার নিজের মতো ব্যাখ্যা ক'রে পথ দেখাল আর সবাইকে। তাদের ব্যাখ্যায়, উৎপাদন বাড়াও হ'ল ভাড়া বাড়াও। বামদলও চুপ ক'রে রইল না, তাদের ব্যাখ্যায় হ'ল প্রতিরোধ বাড়াও। অতঃপর পুলিস এলো তার ব্যাখ্যা নিয়ে—সে ব্যাখ্যা কবল লাঠি বাড়াও। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত উৎপাদন শেষ হ'ল উৎসাদনে, আর বাড়াও শেষ হল বাড়াবাড়িতে। ২৬

কিন্তু ১৪৪ ধারা অতি ভয়ানক জিনিস। এর মধ্যে কত রকম সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা এতদিন কেউ বুঝতে পারেনি। কারণ একা ১৪৪ ধারা যে সহস্রধারা সংকট সৃষ্টি করতে পারে, সাংবাদিকের মাথায় লাঠি না পড়লে তা আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যেত। ভাগ্যিস্ লাঠি পড়েছিল। ২৭

এতেও যদি পুলিসের ভুল ভাঙে। নিতান্তই মোহবশতঃ পুলিস মনে করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে একমাত্র পুলিস। কিন্তু তার জানা উচিত কথাটা আংশিক সত্যমাত্র। দেশের বৃহত্তর শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে খবরের কাগজ। সমস্ত দেশের লোকের মন খবরের কাগজের সুরে বাঁধা, পুলিসের সুরে নয়, কেননা পুলিসের সুর নেই। তাই তো তাদের আর এক নাম অসুর। ২৮

*কেন পান্থ এ চঞ্চলতা

কিন্তু যে কারণেই হোক এদেশের খবরের কাগজের ভাগ্য ভাল যাচ্ছে না বর্তমানে। উত্তরপ্রদেশ ফ্রন্টেও এক সাংবাদিক সম্প্রতি লাঞ্ছিত হয়েছেন। পুলিসের হাতে নয়, স্বয়ং গোবিন্দবল্লভ পান্থের হাতে। বিহার হেরাল্ডে প্রকাশ—স্টেটসম্যানের বিশেষ প্রতিনিধি উত্তর প্রদেশের জনৈক সরকারী অফিশ্যালের কাছ থেকে জানতে পারেন—তথাকার প্রাইমারি স্কুলসমূহের ৭০০০ শিক্ষককে ছাঁটাই করা হবে। খবরটি কোন্ অফিশ্যাল প্রকাশ করেছেন তা নিয়ে বড়ই উত্তেজনা। পান্থ চটে গিয়ে বলেছেন তার নাম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ না করলে স্টেটসম্যানের প্রতিনিধিকে আর মানা হবে না। স্টেটসম্যান সম্পাদক নির্দেশ দিয়েছেন—শাস্তি গ্রহণ কর, নাম প্রকাশ ক'রো না।

কিন্তু পণ্ডিত পান্থের এতখানি উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করা কি ঠিক হয়েছে? রবীন্দ্রনাথ কি বহু পূর্বেই এই সতর্কবাণীটি উচ্চারণ করেননি—"কেন পান্থ এ চঞ্চলতা?" ২৯

অপরাধীদের নিষ্ক্রিয়তা

ট্রামবর্জন আন্দোলন কাল-দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাস। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কলিকাতা শহরে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি বিভাগ অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় ছিল। কেউ বলেন পুলিসেরা ভিন্ন-প্রকার দমনকার্যে রত ছিল, তাই চোর-ডাকাতেরা বিবেচনাবশতঃ তাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয় মতে, তারা পুলিসকে সাংবাদিকের পকেটমারের ভূমিকায় নামতে দেখে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এ ভিন্ন আরও একটি মত আছে, কিন্তু তা প্রকাশ করলে রসহানি ঘটবে আশঙ্কায় নীরব রইলাম। ৩০

*আত্মহত্যা ও খাদ্যশস্য

মাদ্রাজের হিসাব, সেখানে গত ৯ মাসে ৩৬০০ নরনারী আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার কারণ বিবিধ : ব্যর্থপ্রেম, পরীক্ষায় ফেল, জীবন যুদ্ধে পরাজয় ইত্যাদি। যে কারণেই হোক, রেট যদি ঠিক থাকে তাহলে সেখানে প্রতি ১২ মাসে ৪৮০০ লোক আত্মহত্যা করবে, অর্থাৎ বছরে সেজন্য মাদ্রাজে প্রায় ১৫,০০০ মোন খাদ্যশস্য বাঁচবে। ৩১, ২-৮-৫৩

বিপরীত

পুলিসের হাতে সাংবাদিকের লাঞ্ছনার ফোটোগ্রাফ ছাপা হয়েছিল অনেক কাগজে। ফোটোগ্রাফ ছাপা হওয়াতে গণ্ডগোলেব খবরে অতিরঞ্জন হওয়ার আশঙ্কা কম ছিল, কাবণ ইংরেজীতে একটি কথা আছে—The camera does not lie, ক্যামেবা মিথ্যা বলে না। কিন্তু এই উপলক্ষে পুলিস ও 'অপরাধী'র মধ্যে এতদিন যে সম্পর্ক ছিল তাব এমন একটি পবিবর্তন ঘটেছে যা অনেকেই হয়তো লক্ষ করেননি। এইবাব লক্ষ করুন। ৩২

১৪৪ ধারা তুলে নেওয়াব পব ওয়েলিংটন স্কয়ারে একটি সভা হয়। সেই সভায় এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যাঁকে দেখে সভায় যোগদানকারীদের মনে হয় ইনি নিশ্চয় শাদা পোষাকের পুলিস, কারণ ফোটোগ্রাফের এক পুলিসেব সঙ্গে এঁর চেহারার মিল ছিল। আর যায় কোথা, পত্রপাঠ উক্ত ব্যক্তিব উপব লাঞ্ছনা শুরু ক'রে দিলেন কয়েকজন নিকটস্থ ব্যক্তি। ৩৩

এখন লক্ষণীয় এই যে, এতকাল পুলিসই ফোটোগ্রাফ মিলিয়ে মিলিয়ে 'অপরাধী' ধরে আসছিল, এবার থেকে সাধারণ লোক ফোটোগ্রাফ মিলিয়ে পুলিস ধরতে আরম্ভ করল। আমাদের দেশে অন্তত এটি সম্পূর্ণ একটি বৈপ্লবিক ব্যাপাব। ৩৪

মুখে আলকাতরা

দ্রাবিড় স্বেচ্ছাসেবকগণের হিন্দি বিরোধী আন্দোলন আলকাতরা পর্যন্ত পৌঁছেছে। তারা রেল স্টেশনের কংগ্রেসী হিন্দি সাইনবোর্ডেব মুখে আলকাতরা লেপন করেছে, আর কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকগণ কেরোসিন তেল নিয়ে বেরিয়েছে সেই কলঙ্ক মুছতে। তেল যেন সব খরচ হয়ে না যায়, কেননা যেসব স্থানে কংগ্রেস নিজের মুখে নিজেই আলকাতরা মেখেছে, সেখানেও অনেক তেল দরকার হবে। ৩৪

বাজি চাই

কলকাতার শহরে বাজি তৈরি, মজুত ও বিক্রয় লাইসেন্স কয়েকদিনের জন্য মুলতুবি ছিল, সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। ভালই হয়েছে। বাজি না হ'লে আমাদের জীবন অচল। বাজির ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত, যথা দমবাজি, ধাপ্পাবাজি, লাঠিবাজি, দাঙ্গাবাজি ইত্যাদি। আমরা সবাই বাজিকর। ৩৫, ৯-৮-৫৩

থ'লে থেকে বিড়াল

সাম্প্রতিক প্রতিরোধ আন্দোলন উপলক্ষে প্রায় সকল থ'লে থেকেই বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। কার মনে কি ছিল সবই জানা গেল এই সুযোগে। চারটি বিভিন্ন শক্তির প্রত্যেকেই (জনসাধারণ, কংগ্রেস, ট্রাম, পুলিস) তার শ্রেষ্ঠ দান নিয়ে এসেছিল। কলকাতার মতো একটি বড় শহরের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে এই চতুঃশক্তি সম্মেলন একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই চতুঃশক্তির সবাই চতুর শক্তি, শুধু একটি শক্তি নির্বোধ। সেই নির্বোধ শক্তি ক্রিয়া না করলে শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াত না। ৩৬

পঞ্চম শক্তির কথা বাদ দিয়েছি। সেটি হচ্ছে খবরের কাগজ। কোনো একটি কাগজ তার সম্পাদকীয়তে যে ভাষা ব্যবহার করেছিল তা নিয়ে অনেক বিরুদ্ধ মন্তব্য কানে এসেছে। কিন্তু বিষয়টি আলোচনাযোগ্য। কথা উঠেছে বাংলাভাষা গাল-গালিতে সম্প্রতি শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং এর জন্য খবরের কাগজই দায়ী। কিন্তু আমার মতে (যে মতের জন্য কোনো সম্পাদক দায়ী নন) খবরের কাগজ ততটা দায়ী নয়, যতটা বাংলা ভাষা দায়ী। কারণ বাংলা ভাষায় তিরস্কারের সুবিধা নেই বললেই চলে, যে সামান্য কয়েকটি তিরস্কারব্যঞ্জক শব্দ আছে তাতে কুলোয় না সব সময়। শুধু তাই নয়, তার সবগুলো ব্যবহারও হয় না সব সময়। ৩৭

বাংলায় গাল দেবার একটি উৎকৃষ্ট শব্দ শালা। কিন্তু বাংলা-সাহিত্যে এখনও শব্দটি সম্পূর্ণ জাতে ওঠেনি। তাই খবরের কাগজ এটি ব্যবহার করতে পারে না, ভয় পায়। শালী তো একেবারেই অচল। অথচ দেখুন ইংরেজী decency বা decorum কথাটির বাংলা করতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তার আরম্ভেই শালী। নইলে শালীনতা পাব কোথায় ? ৩৮

শালা কথাটি সাহস ক'রে চালানো উচিত ব'লে মনে হয়। এর স্বপক্ষে নজীর আছে। বাংলা দেশের এক বিখ্যাত কবিরাজ সম্পর্কে শুনেছি, তিনি রোগীদের শালা সম্বোধন করতেন এবং শোনা যায় সেই কারণেই তাঁর পসার খুব বেড়ে গিয়েছিল। আরও একজন গুরু শ্রেণীর বৈদান্তিক শাক্ত শিষ্যকে এবং যে কোনো দর্শনপ্রার্থীকে শালা সম্বোধন করেন এবং সে কারণ তাঁর খ্যাতি ক্রমবর্ধমান। ৩৯

ইংরেজী অভিজ্ঞরা সব সময়েই শালীনতার বিচার করেন ইংরেজী ভাষার সঙ্গে

মিলিয়ে। কিন্তু এটা ঠিক হয় না, কারণ ইংরেজী গদ্য সাহিত্য গত পাঁচ শ' বছর ধ'রে পুষ্টিলাভ করেছে, বাংলা গদ্যের বয়স দেড় শ' বছরের বেশি নয়। তা ভিন্ন ইংরেজের জীবনে যে বহু বৈচিত্র্য, যে ব্যাপক কর্মোদ্যম এবং চাঞ্চল্য, তাদের যে ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়া, তাদের যে বস্তুপ্রধান জীবনদর্শন, তাই তাদের সাহিত্যকে, ভাষাকে, এমন শতস্তবিত গুণপ্রকাশক ক'রে তুলেছে। যুদ্ধের ভাষাতেও ওরা কুশলী, কেননা এতকাল যুদ্ধ ক'রেই ওরা টিকে আছে। আমরাও যুদ্ধ করেছি, কিন্তু সে সাপের সঙ্গে, বাঘের সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে আমাদের শেষ বড় যুদ্ধ পলাশীতে, যা সমাপ্ত একটি দাঙ্গা মাত্র। ৪০

ইংরেজরা প্রধানতঃ বস্তুতান্ত্রিক, তাই ওদের ভাষা খুব সোজা, এবং তা চলে তীরের গতিতে। ওরা যখন কারো মৃত্যু সংবাদ ছাপে তখন কথাটি আরম্ভ করে The death occurred—ইত্যাদি বলে। যেমন ঘটনা তেমনি ভাষা। আমাদের কাছে এ ভাষা অচল। আমরা কখনও লিখতে পারি না তিনি মারা গিয়েছেন। লিখতে হয় তিনি পরলোকে অথবা সাধনোচিত ধামে গিয়েছেন। যখন কোনো নগরের উপর বোমার আক্রমণ হয় তখন ওরা লেখে The city has been bom- bed, আমরা লিখি নগরের উপর বোমার তাণ্ডব শুরু হয়েছে। ৪১

আক্রমণ বোঝাতে আমাদের একমাত্র ভরসা ও সম্বল এই 'তাণ্ডব' কথাটি। এর বাইরে একবার মাত্র একটি ব্যতিক্রম দেখেছিলাম হাবসীদের উপর ইটালিয়ানদের অত্যাচারের সময়। তখন একখানা সাপ্তাহিক কাগজ লিখেছিল, নাচো কালী, নাচো। ইংরেজী ভাষাতেও যে সোজা কথা সাহিত্য সব সময়েই চল ছিল তা নয়, বিশেষ ক'রে কাব্যের ভাষায়। কিন্তু ওরা সে অবস্থা পার হয়ে এসেছে। আমাদের কেবল আরম্ভ মাত্র। ৪২

কাজেই আমাদের উপায় নেই। কারণ আমাদের দেশে দুজন মাত্র দেবতা ধ্বংসমূলক নাচ নেচেছেন, শিব এবং কালী। কিন্তু শিবের নাচের নাম তাণ্ডব, কালীর নাচের পৃথক কোনো নাম নেই। তাই আমরা ধ্বংসমূলক কোনো আক্রমণ হলেই তাকে তাণ্ডব বলি। ৪৩

অন্য দেবতা যে অন্য নামে ধ্বংসাত্মক নাচ নাচেননি, সে জন্য কি আমরা দায়ী?

দায়ী দেবতারা। তাঁরা আমাদের বেকায়দায় ফেলেছেন, তাই ছোট-বড় সকল ধ্বংসই তাণ্ডব নামে চলছে। ঝড়ের তাণ্ডব এবং পুলিসের তাণ্ডব এক সঙ্গে চলছে। শহরে হাজার টন বোমার আক্রমণ আর কোলকাতার কয়েকজন পুলিসের আক্রমণ —সম্পূর্ণ নিরাসক্ত এবং নিস্পৃহভাবে দেখা সম্ভব হলে—নিশ্চয় অনেক তফাৎ মনে হবে, কিন্তু ভাষার ত্রুটিবশতঃ দুটিকেই আমরা তাণ্ডব বলতে বাধ্য। কিন্তু হায়, বহু ব্যবহারে এই তাণ্ডবও তার জোর হারাতে বসেছে! ৪৪

তাই জোর দিতে একদিকে যেমন কাঠের সাহায্য নিতে হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি নতুন শব্দ বাজারে ছেড়ে পরীক্ষা করতে হচ্ছে। কাঠের সাহায্য মানে, জোরালো ঘটনার শিরোনামা ছাপাতে কাঠের বড় অক্ষর ভিন্ন উপায় নেই। অর্থাৎ আমাদের দুর্বলতা শুধু ভাষায় নয়, অক্ষরেরও। ৪৫

অতএব গাল দেবার নতুন ভাষা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতেই হবে এখন। দেখতে হবে, সয় কি সয় না। সয়ে যাবে ঠিক। এখন তিরস্কারযোগ্য এত ঘটনা ঘটছে এবং এমন দ্রুত ঘটছে যে, যে পুঁজিটুকু আমাদের আছে তা ভাঁড়ার খালি করেই বাজারে ছাড়তে হবে। ৪৬

অতএব অন্যের আক্রমণই হোক বা নিজেদের আক্রমণই হোক, ভাষার প্রসার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সংযত ভাষায় লিখলেই পাঠক বলেন sla টাকা খেয়েছে। সব নির্ভর করছে পাঠকেরই উপর। পাঠকের দাবীতেই তিরস্কারের ভাষা নিয়ে নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করতে হয়। যদি দাবী না ছাড়েন তা হ'লে গাল দেবার জন্য নতুন শব্দ ব্যবহারেও আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু আগেই বলেছি নতুন শব্দও খুব বেশি নেই বাংলাভাষায়। দাবী উত্তরোত্তর বাড়লে সে ক'টি কথাও পুরানো হয়ে যাবে। আর তখন, যা আপনারা আমরা সবাই ভয় করছি, সেই ভয়াবহ বস্তুটিই হবে আমাদের একমাত্র আশ্রয়। সে হচ্ছে হিন্দি। গাল দিতে হ'লে ও ভাষা একেবারে মোক্ষম। ইংরেজী ভাষাও হার মানবে। ৪৭

পাঠক তা যদি না চান, যদি টাকা খাওয়ার কথা না তোলেন, তা হ'লে খবরের কাগজের ভাষায় সংযম দাবী করুন সোজাসুজি। আমরা যা চাইব খবরের কাগজ তা দিতে বাধ্য, কারণ, খবরের কাগজে যা প্রতিধ্বনিত হয় তা পাঠকেরই মনের ধ্বনি।

৪৮, ১৬-৮-৫৩

চোখ খুলতে অস্বীকার

কয়েকদিন আগের খবর—চন্দননগরে এক বিবাহ সভায় নতুন ধরনের এক বিভ্রাট ঘটেছে। বিয়ের সময় আমাদের যে সব করণীয় প্রথা আছে, বিয়ের কনে না কি তা পালন করেনি, অর্থাৎ শুভদৃষ্টির সময় চোখ খুলতে অস্বীকার করেছে, এবং গোত্রান্তর সময়ে বরের হাতে হাত রাখেনি। বিয়ে অবশ্য হয়েছে, কিন্তু বর মানসিক আঘাতে বাসরঘরে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। ৪৯

কিন্তু এতে আঘাত পাবার কি ছিল? বিচার ক'রে দেখলে বোঝা যাবে কনের কোনো অপরাধ হয়নি, বরঞ্চ সে যে আমাদের বিবাহ প্রথার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে একটি যুক্তিবাদীর রীতিতে পালন করার চেষ্টা করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বরং বর মূর্ছিত হয়ে অন্যায় করেছে। মূর্ছা যাবার আগে উক্ত কাজটি উচিত হচ্ছে কিনা তা তার একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল। অকারণ মূর্ছা গিয়ে সে পুরুষ জাতির মুখে কলঙ্ক লেপন করেছে। ৫০

খবর থেকে বোঝা যায় কনে বিয়ে অস্বীকার করেনি। সে শুধু একটি প্রথাকে অস্বীকার করেছে। তার এই ব্যবহারে স্পষ্টই বোঝা যায় তার উদ্দেশ্য খারাপ নয়, অন্যায়ও সে কিছু করেনি। বরং বলা যায় সে একটি সময়োচিত ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছে, সে হিন্দু বিবাহকে সম্মান করেছে, উপরন্তু সে সামান্য একটুখানি যুক্তিবাদের পথে গিয়ে বিবাহ-প্রথার কিছু সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছে। ৫১

আমাদের দেশে হিন্দুমতের বিয়েতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়ের কোনো মতামত নেওয়া হয় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে ছেলেরও মতামতের কোনো দাম নেই। অভিভাবকেরা বিয়ে ঠিক করেন। অবশ্য তাঁরা যে তা সদুদ্দেশ্যেই করেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৫২

এই বিয়েকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—ছেলে বা মেয়ের মতামত অবাস্তব, অভিভাবক যে বিয়ে ঠিক ক'রে দেন চোখ বুজে তাই মেনে নিতে হয়। এ-প্রথা অবশ্য বহুকাল উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। অতএব আমাদের আলোচ্য কনেটি নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করেছে, যে-বিয়ে চোখ বুজে মেনে নিতে হবে, সে বিয়েতে চোখ খোলা অবাস্তব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে শুধু এই কারণেই চোখ খোলেনি

—শুভদৃষ্টিই হোক বা যাই হোক। এবং আমাব মতে কনেকে অনুসবণ ক'বে ববেবও চোখ বুজে থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু ববেবা বিযেব সময সাধাবণতঃ এমন বর্ববোচিত বোকাব মতো ব্যবহাব কবে যে সমস্ত জীবন কনেব কাছে তাব আব কোনো প্রতিষ্ঠা থাকে না। এবং সম্ভবতঃ তাদেব এই বর্বব ব্যবহাবেই পণ্ডিতেবা উক্ত শব্দেব অর্ধেক বাদ দিযে বিবাহ-সভায পাত্রেব নাম দিযেছেন বব। সর্বনাশে পণ্ডিতেবা অর্ধেক ত্যাগ কবে থাকেন, জনশ্রুতি। ৫৩

কিন্তু ইতিমধ্যেই সম্ভবতঃ বিবাহ ব্যাপাবে প্রাচীনপন্থী এবং নব্যপন্থী উভযেই আমাব মতলব সম্বন্ধে সন্দেহ কবতে শুরু কবেছেন। প্রাচীনপন্থী ভাবছেন আমি উক্ত কনেব যুক্তিবাদেব পন্থা-গ্রহণকে প্রশংসা ক'বে বর্তমান বিবাহবীতিব পবিবর্তন কামনা কবছি। নব্যপন্থী ভাবছেন প্রাচীনবীতিব গুণগানদ্বাবা আমি প্রতিক্রিযাপন্থী মনোভাব ব্যক্ত কবছি। ৫৪

এব কোনোটাই সত্য নয। কাবণ সমাজে যে সব প্রথা, বীতি বা ব্যবস্থা আছে তাব সবই কালেব অনিবার্য বীতিতে পবিবর্তিত হযে যায। ভালমন্দেব প্রশ্ন তাতে ওঠে না। পুবাতন যখন চ'লে যায তখন তাব সঙ্গে অনেক ভালোকে নিযে যায। নতুন যখন আসে, তখন তাব সঙ্গে অনেক খাবাপ আসে। কিন্তু তবু পুবাতন যায় এবং নতুন আসে, কেউ তা ঠেকাতে পাবে না—কোনো দেশে, কোনো কালে কেউ ঠেকাতে পাবেনি। ঠাকুর্দা হবাব চেষ্টা কব, পৌত্র অনুসবণ কববেই। ঠাকুবদা যখন যায, অনেক কিছু ভাল নিযেই যায, পৌত্রও তাব স্বভাবধর্মে কিছু দৌবাত্ম্য নিযে আসে। খববেব কাগজেব প্যাবাগ্রাফেব উপব এদেব আসা যাওযা নির্ভব কবে না। ৫৫

জীবনেব সকল ক্ষেত্রে চলছে এই বীতি। এমন কি সেদিন প্রবল বৃষ্টিপাতে লখনৌতে সাতশত পুবাতন বাড়ি ধ্বংসে কুড়িজন লোক মাবা গেল, বহু লোক আহত ও নিবাশ্রয হ'ল, তাব মধ্যেও ঐ একই লীলা। পুবাতন গেল, কিন্তু কতগুলো মানুষকে মেবে গেল। বালী অঞ্চলে ব্যর্থপ্রেমে অথবা বাঞ্ছিতকে বিবাহ কবতে না পেবে দলে দলে যুবক যুবতীবা আত্মহত্যা কবছে—মোট সংখ্যা পঞ্চাশেব উপবে উঠেছে অল্প দিনেব মধ্যেই। এবা নিশ্চয অভিভাবক-নির্দিষ্ট বিবাহে চোখ বুজতে বাজী হযনি। হচ্ছে না অনেকেই, এব ইঙ্গিত হচ্ছে, নতুন আসছে। ৫৬, ২৩-৮-৫৩

চোরের অনুপাত

সম্প্রতি এ শহরে নানা স্থানে চুরির হিড়িক খুব বেড়ে গেছে, যে কোনো খবরের কাগজ খুললেই তা বোঝা যাবে, তাই চোরদের বিষয়েই আবার কিছু আলোচনা করা যাক। বিষয়টি এমনই মনোহর যে এ সম্পর্কে যখন তখন বিনা ভূমিকায় আলোচনা করা চলে। ৫৭

একবার বলেছিলাম এ শহরে প্রতি তিনজন লোকের মধ্যে একজন লোক চোর। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। এত চোর নিয়ন্ত্রণ করা সত্যিই অসম্ভব। নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের পুলিস হওয়া দরকার। অর্থাৎ কলকাতায় যদি ত্রিশ লক্ষ লোক থাকে তবে তার মধ্যে দশ লক্ষ চোর, তাদের দমন করতে দশ লক্ষ পুলিস চাই। ৫৮

বাকী থাকে দশ লক্ষ ভদ্রলোক, তারা পুলিসও নয়, চোরও নয়। তারা শুধুই ভদ্রলোক। পুলিস একটি শক্তি, চোরও একটি শক্তি, ভদ্রলোকের কোনো শক্তি নেই। তারা বাস করে দশ লক্ষ চোরের সান্নিধ্যে, যেমন তারা বাস করে দশ লক্ষ পুলিসের সাসপেক্ট হয়ে। ৫৯

সেজন্য দশ লক্ষ ভদ্রলোক পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। হয় তারা পুলিসের আশ্রিত হবে, না হয় চোরের আশ্রিত হবে, শুধু ভদ্রলোক সেজে টিকে থাকা অসম্ভব। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কলকাতাবাসীরা দু ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, অর্ধেক পুলিস আর অর্ধেক চোর। কবি লিখেছেন "অর্ধেক পুলিস তারা, অর্ধেক তস্কর।" ৬০

বর্তমানে পুলিসের চেয়ে চোরের সংখ্যা অস্বাভাবিক রকমের বেশি। তাই ভদ্রলোকেরা প্রবলতর চৌরশক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়েই চোরে পরিণত হচ্ছে। মশায়, যদি ছিঁচকের হাতে, পকেটমারের হাতে এবং সিঁদেলের হাতে প্রতিনিয়ত সব বেরিয়ে যায়, তা হ'লে কতদিন আর চোর না হয়ে থাকবেন বলুন? হরণ পূরণের একটা ন্যায়সঙ্গত অনুপাত থাকা উচিত, তা নয় শুধু আপনার একারই হরণ হবে, তা কেন? আপনি অনেস্ট উপায়ে খেটেখুটে কিছু পেলেন, কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলেন না, দেখলেন পথেই আপনার গ্রন্থি-ছেদন হয়ে গেছে। সোজা-বাংলায় গাঁটকাটা হয়ে গেছে। ৬১

পরিশ্রম করা উপার্জন হস্তান্তরিত হয়ে গেল! তখন পাল্টা যদি আপনি নিকটস্থ ব্যক্তির গাঁট না কাটেন তা হ'লে আপনাকে বাঁচাবে কে? কাটতেই হবে। সত্যকথা বলতে কি আপনি উক্ত কার্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। নইলে চোরের সংখ্যা এত বাড়ছে কি ক'রে? অবস্থা এমন হয়েছে যে, এখন আর এ-বিষয়ে বাঁধাধরা কোনো নিয়ম নেই। অনেক চোরেরও গাঁটকাটা যাচ্ছে এখন ভদ্র-লোকেব হাতে, চোরের হাতে তো বটেই। ৬২

শুনেছি আগে চোরদের মধ্যে একটা সততা ছিল, চোর চোরের পকেট মারত না। এটা প্রায় ওদের একদা ইণ্টারন্যাশন্যাল কনভেনশনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—আন্তর্জাতিক একটি প্রথা। অনেকদিন আগে বিলেতের একটি খবর পড়েছিলাম। এক বৃদ্ধ প্রোফেসরের সঙ্গে এক যুবক ছাত্র চলছিল। যুবকটি এক সময় লক্ষ করল বৃদ্ধের পকেটে ঘড়িটি বড়ই অসাবধান অবস্থায় আছে, সহজেই চুরি হয়ে যেতে পারে। তাই যুবকটি তাকে শিক্ষা দেবাব জন্য ঘড়িটি বৃদ্ধের অলক্ষ্যে তুলে নিজের পকেটে রেখে দিল। বৃদ্ধ যখন আবিষ্কার করবেন ঘড়ি নেই, তখন তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে ভবিষ্যতে যেন তিনি ওভাবে ঘড়ি না রাখেন। ৬৩

যুবকটি নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হচ্ছিল এমন সময় একটি অপরিচিত লোক এসে যুবকের হাতে একটি ঘড়ি দিযে বলল, মাপ করবেন, আপনি যে আমাদেরই সগোত্র তা আগে বুঝতে পারিনি, তাই আপনার নিজের ঘড়িটি আপনাকে ফেরৎ দিচ্ছি। ঘড়িটি এক মিনিট আগে আপনার পকেট থেকে তুলে নিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আপনি বৃদ্ধের পকেট মারছেন তখনই ভুল বুঝতে পেরেছি। ৬৪

চোরদেব মধ্যে এই জাতীয় সততা আমাদের দেশেও ছিল, এখন আর নেই। এখন একটি লোক অপরের পকেট মেরে বাড়ি ফিরে দেখে তার নিজের পকেটও মারা গেছে। চোর যার ঘরে সিঁদ কাটছে, সে হয়তো অন্যের বাড়িতে চুরি করতে বেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ অন্যের মুণ্ড কেটে বাড়ি ফিরে দেখে নিজের মুণ্ডটি নেই। মানে, এখন সমস্যা হয়েছে অন্য রকম। আগে শুধু চুরির কৌশল ভাবতে হ'ত, এখন নিজের পকেট বাঁচিয়ে অন্যের পকেটে হাত ঢোকাতে হচ্ছে। আগে চুরির জন্য দুই হাত মুক্ত থাকত, এখন মাত্র একহাত মুক্ত, অন্য হাতে নিজের পকেট সামলাতে হয়। ৬৫, ১৩-৯-৫৩

বানান ভুলে গুরু প্রহার

ভাটপাড়া অঞ্চলের একটি খবর (যুগান্তর, কলিঃ ১৪-৯-৫৩)—কোনো এক পাঠশালার গুরু বানান ভুলের জন্য এক শিষ্যকে গুরুতরভাবে প্রহার করেছেন। একই শব্দের বানান বার বার চেষ্টা করেও যখন শিষ্য ব্যর্থ হ'ল, তখন গুরু ক্ষেপে গিয়ে এই কাণ্ড করেছেন ৬৬

বহুদিন ধরেই আমি এটাই আশঙ্কা ক'রে আসছিলাম। আমি জানতাম বাংলা বানান এমন এক অরাজক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যার ফলে কোনো-না-কোনো বানান-নিষ্ঠ বাঙালীকে ক্ষেপাবেই হবে—দল ধ'রে হোক বা একা হোক। আশঙ্কা করছিলাম রাজশেখর বসু, সুনীতি চাটুজ্জে, কালিদাস রায় এবং এই বানাননিষ্ঠ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আরও দুচারজন ১৯৫৩ সালের মধ্যেই ক্ষেপে যাবেন। দম বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় খবর এলো ভাটপাড়া অঞ্চলের এই পণ্ডিত প্রথম ক্ষেপার গৌরব লাভ করলেন। ৬৭

আমার অনুমানে ভৌগোলিক ত্রুটি ছিল, কারণ ভাটপাড়া অঞ্চলই আসল পণ্ডিত এলাকা, পৌনঃপুনিক ভুল বানানের ফলীভূত প্রতিক্রিয়া প্রথমে ওখানেই তা হবে। এটি আদি পাণ্ডিত সমাজের সম্মান। এজন্য আমরা ঈর্ষা বোধ করব কিন্তু গর্ববোধও বন্ধ করব না। ৬৮

১৯৩৬ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বানান সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, তখন সংস্কার সমিতি থেকে এই লেখকের নামেও চিঠি এসেছিল, প্রস্তাবিত সংস্কার বিষয়ে মতামতের দাবী ছিল তাতে। মন্তব্য পাঠিয়েছিলাম। মত মিলেছিল অধিকাংশ বানান সম্পর্কেই এবং নতুন বানান প্রবর্তনায় খুশি হয়েছিলাম। কারণ তখন ভাবতে পারিনি এই সংস্কার সমিতি অদূর ভবিষ্যতে সংকার সমিতির হাতে পড়বে। দেশ তখনও গণতন্ত্রের স্বাদ পায়নি, তাই সে ভোট যে গণতান্ত্রিক ভোট হয়নি, তা তখন মনে আসেনি। ৬৯

আইন অমান্য আন্দোলন অবশ্য তার আগেই হয়ে গেছে, কিন্তু সে ছিল ব্রিটিশ আইন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়রূপ বৃহত্তম স্বদেশী শিক্ষাকেন্দ্রের আইনকে তাই অমান্যযোগ্য আইন ভাবতে পারিনি। এখন সবই বুঝতে পারছি, কারণ এখন ভুল ভেঙেছে। ৭০

প্রথম শিক্ষা থেকে যদি বানানের বোধ ও রীতি শিখিয়ে দেওয়া না হয়, তা হ'লে সে বোধ পরে আর প্রায় জাগে না। বাংলা ভাষার জন্য সংস্কৃত শেখা দরকার, অন্তত বাংলা ব্যাকরণের সন্ধি, ষত্ব ণত্ব ও সমাস যদি মনোযোগ দিয়ে শেখা যায় তা হ'লে সংস্কৃত না শিখলেও চলবে। শব্দের নিজস্ব এক-একটি চেহারা আছে। সেই চেহারার সঙ্গে কিভাবে পরিচয় ঘটতে পারে তা ছোটবেলা থেকেই শিখিয়ে দেওয়া দরকার। মুখের ভাষা কাগজে লিখে প্রকাশ করতে গেলেই লেখার বিশেষ রীতিটি মানা চাই। পরীক্ষার সময় কর্তৃপক্ষ থেকেই এ বিষয়ে চাপ দেওয়া প্রয়োজন বেশি। ৭১

ঠিক যেমন ভেজাল খাদ্য বা ওষুধের বেলায় সরকারী চাপ প্রয়োজন। বর্তমান আইনে শাস্তি যথেষ্ট নয়। ভুল বানানের শাস্তিও যথেষ্ট নয়। দুদিকেই শাস্তি বৃদ্ধি দরকার। তবে শাস্তির অনুপাত কি হবে, অথবা ছাত্র, শিক্ষক এবং পরীক্ষক, এদের মধ্যে কার বেশি শাস্তি পাওয়া উচিত তা সহজেই ঠিক ক'রে নেওয়া যেতে পারে। স্কুল ফাইনাল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বানান ভুল উপেক্ষা করা হয়, অন্ততঃ প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া হয় না। তার মানে লিখিত পরীক্ষাকে প্রায় মৌখিক পরীক্ষার সমান ধরা হয়। এইখানেই ভুল বানানের প্রশ্রয় পায় সবাই। তা ভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে শুধু তথ্য নয়, বানান ভুল থাকে যথেষ্ট। ৭২

সুনীতিবাবু বানানের এই ভবিষ্যৎ কল্পনা করেই রোমান হরফ চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর প্রকাশ্য কৈফিয়ৎ ছিল বাংলা ভাষা পৃথিবীর লোক যাতে সহজে পড়তে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টি করা। আসলে বানানের অরাজকতা তাতে দূর হ'ত। বাঙালী সবদিক থেকে কোণঠাসা হয়ে এখন নিজেকেই ধ্বংস করছে, উপায় নেই। ৭৩

নতুন বানান ভাল না লাগে পুরনোই চলুক না। কিন্তু কোনোটাই শেখে না কেউ। নতুন বানানে দ্বিত্ব বর্জন করা হয়েছে কিন্তু এই বর্জন যে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আছে, তা অনেকেরই জানা নেই। তাই ধিক্কার ধিকারে নেমে এসেছে, ধিক্কৃত হয়েছে ধিকৃত। মহৎ ও তৎ এই দুটি শব্দের শেষ অক্ষরটি ছেঁটে বাদ দিয়ে "মহ" ও "ত"তে পরিণত করা হয়েছে। মহত্ত্ব বা তত্ত্ব লিখতে চায় না কেউ, লেখে মহত্ব, তত্ব! ঠেকানো অসাধ্য। ৭৪

বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেও কেউ কেউ এই রকম লিখেছেন দেখেছি, প্রমাণ আছে

এর কারণ হয় তো এই যে, আশুতোষ বিলডিঙের নিচের অংশ যাঁদের ভাড়া দেওয়া হয়েছে বানান সংস্কারের ভার তাঁরাও অনেকখানি বহন করছেন। তা ছাড়া আরও একদল আছেন, তাঁরা সাইন পেণ্টার। 'দূর্গা' (দীর্ঘ ঊ) বানান তাঁরাই চালিয়ে দিয়েছেন, স্কুলের ছেলেরা এখন 'দূর্গা' লেখে, বড়রাও অনুকরণ করছেন এখন এদেরই। পাস করা মেয়েরা নিজের নামের সঙ্গে 'শ্রীমতি' লেখেন অনেকেই। আগে স্কুলে চিঠি লেখা শেখানো হত। দুর্গানাম লিখতে হত, নিজের নামের আগে শ্রীমতী লিখতে হত, এখন আর লিখতে হয় না। ভুল বানানে কোথায়ও আটকায় না, পাস করা যায়, লেখক হওয়া যায়। সাহিত্যিকের হাতেও যখন হৃৎপিণ্ড হৃদপিণ্ড হয়, তখনই বোঝা যায় ভাষার পিণ্ডদানের সময় উপস্থিত। ৭৫

এমন অবস্থাতেও একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখলে কেমন হয়—এই মনোভাব জেগেছিল নৈহাটি অঞ্চলের ঐ পণ্ডিত মহাশয়ের। তিনি যে একটি ছেলেকে এজন্য মেরেছেন, সেই ঘটনাকে আমরা প্রতীক-মাত্র হিসাবেই নিতে পারি। কিন্তু এতে ফল হবে না। সাহস যদি থাকে তবে বেত হাতে পথে বেরিয়ে আসুন। ৭৬

*আত্মজীবনী

অমৃতবাজার পত্রিকার এক পত্রলেখক লিখেছেন—পণ্ডিত নেহরু যে অটোবাইওগ্রাফি লিখেছেন তাতে মাত্র ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে, অথচ তাঁর আসল কর্মময় জীবন তার পর থেকে। অতএব তিনি আরও একখানা অটোবাইওগ্রাফি লিখুন। কিন্তু কি দরকার। বর্তমানে তাঁর যে ফোটোবাইওগ্রাফি ছাপা হচ্ছে তাতেই কি তাঁর পরিচয় বেশি পাওয়া যাচ্ছে না? ৭৭

মা ফলেষু

হ্যারিসন রোডে দুই দল ফলবিক্রেতার মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়ে গেছে। সংঘর্ষে যথারীতি পটকার ব্যবহার হয়েছিল। দুজনকেই হাসপাতালে যেতে হয়েছে। মেওয়া বিক্রেতা যখন, তখন মেয়ো হাসপাতালেই স্থান হয়েছে তাদের, (মেয়ো মেওয়ারই অপভ্রংশ), কিন্তু তারা মারামারি বাধাল কেন? তারা তো জানে ফল যে বেচে সে ফল পায় না, যে কেনে সে পায়। তাদের তো শুধুই কর্মে অধিকার ফলে নয়। তবে? ৭৮, ২০-৯-৫৩

* বিজয়া

আজ মনে পড়ার দিন, ভুলে যাওয়ার দিন, প্রীতি সম্ভাষণের দিন, শত্রুতা বিস্মরণের দিন। এমনি দিনে আমাদের মনে যে সেন্টিমেণ্ট জাগে তা কতখানি সত্য পরীক্ষার জন্য মাত্র ক' দিন আগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে একটি বোমা ফেটেছে। ৭৯

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই ঘটনাটি আজ বিজয়ার দিনে আমরা কিভাবে স্মরণ করব এবং কিভাবে ভুলব? প্রশ্নটি আলোচনার যোগ্য। কারণ বোমা ফাটানো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ একথা যদি স্বীকার করি, তা হ'লে এর পরবর্তী প্রশ্ন—আহতদের মনে আজও এর বেদনা থাকা উচিত কিনা? তার মীমাংসা করা সহজ হবে। বেদনা সর্বাঙ্গে হয়তো কিছুকাল থাকবে, কিন্তু মনেও থাকবে কি না সেই কথাটি ভেবে দেখা দরকার। ৮০

অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে আজ সমাজের সকল স্তরের লোকের মনই বারুদে ভ'রে উঠেছে, বিস্ফোরণ যে-কোনো সময় যে-কোনো জায়গায় হ'তে পারে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। এখন চোর ডাকাত থেকে শুরু ক'রে স্কুল-কলেজের ছাত্র পর্যন্ত সবাই হৃদয়-বারুদ শুকনো রাখছে, নীতি হচ্ছে—Keep your powder dry। ৮১

বোমা বাঙালীর মর্মে বাসা বেঁধেছে। বারীন ঘোষের যুগ থেকে বোমার মহিমা আমরা জানি। এই বোমা আমাদের রেনেসাঁস ত্বরান্বিত করেছিল, এই বোমা আমাদের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করেছিল। তারপর বোমা কিছু দিন বাইরে থেকে ঢুকল অন্তরে—গান্ধীজির ভয়ে। কিন্তু গান্ধী-আন্দোলন আর ক' দিনের? গান্ধী-পন্থীই বা কজন? ৮২

বাংলায় গান্ধী-পন্থী বিরল, কিন্তু গান্-পন্থীর ছড়াছড়ি। স্টেনগানপন্থীর কথা বলছি। বোমা ব্যবহার করে তারা রিয়ার-গার্ড অ্যাকশনে। শহর নিয়ন্ত্রণ প্রায় তাদেরই হাতে। তারা যদি বলে আজ থেকে ধর্মঘট, তা হ'লে ধর্মঘট হবেই। তারা যদি বলে আজ হরতাল, তা হ'লে হরতাল কেউ রোধ করতে পারে না। না হ'লে হর-হর bomb-bomb আরম্ভ হবে। গান্ধী-পন্থী না হলেও মাত্র একটি বিষয়ে তারা গান্ধী নীতির অনুসারী। অর্থাৎ তারা বোমা ছাড়েনি কিন্তু বোমাকে

কুটির-শিল্পরূপে গ্রহণ করেছে। কুটির-শিল্প প্রচলনের চাঁই ছিলেন গান্ধীজি। বম্-পন্থীরা এই নীতিটি বজায় রেখেছে। ৮৩

এই কুটির-শিল্পজাত বোমা এখন বম্‌পন্থীদের পকেটে পকেটে বিরাজ করে। কোথাও সভা হচ্ছে, যাবার আগে সভায় যোগদানকারীর মনে হ'ল—কি জানি যদি মতান্তর ঘটে, কিছু বোমা পকেটে থাকা ভাল। স্কুলের ছেলেদের দোষ নেই, তারা বড়দের অনুকরণ করতে ভালবাসে। হয়তো তারাও সভায় যাবার আগে বলে—মা, গোটাকত বোমা বা'র করে দাও, সভায় যাচ্ছি। ৮৪

হাতিপুরে বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির উপলক্ষে বোমা ব্যবহৃত হয়েছে, পাড়ায় তরুণদের মধ্যে মনকষাকষির উপলক্ষে বোমার ব্যবহার তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। যুবকদের মধ্যে এর ব্যবহার আরও ব্যাপক। যে কোনো মতান্তরে পকেটে হাত ঢোকে—মনান্তরে তো বটেই। পরীক্ষার হলে ছোরা ঢুকেছে, বোমাও ঢুকবে এখন। বিবাহ সভায় বর অদ্যাবধি বোমা ব্যবহার করেনি, সম্ভবতঃ সেখানে বহু বামা পরিবেষ্টিত অবস্থায় বোমা বা'র করা চক্ষুলজ্জায় বাধে। কিন্তু বিয়ের আগে কন্যাপক্ষের পণের অঙ্ক বা গহনার ওজন দৈবাৎ যদি কম পড়ে তা হলে ভাবী শ্বশুর মহাশয়কে লক্ষ ক'রে বোমা ছুঁড়লে ক্ষতি কি? ৮৫

কিছু কাল আগে জনৈক পিতা গভীর নিশীথে প্রত্যাগত অস্থিরপদ পুত্রকে গৃহপ্রবেশে বাধা দেওয়াতে বড়ই অসুবিধায় পড়েছিলেন। পুত্র ফিরে গিয়ে তার বন্ধুদের কাছে তার পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল। তারা সদলবলে বোমা নিয়ে এসে চিৎকার ক'রে বলতে লাগল, বাবা-টাবা বুঝি না, দরজা না খুললে বোমা ফাটবে। বলা বাহুল্য অপরাধী পিতার পায়ের কাছে আর বোমা ফাটাবার দরকার হয়নি রাত দুটোর সময়। ৮৬

বোমা বাঙালীর সংস্কৃতির অঙ্গ, ভক্তির বড় উপাদান। দীপান্বিতায় অন্য প্রদেশে আলো দিয়ে দেবতাকে অভ্যর্থনা করে, আমরা করি বোমা দিয়ে। রাত দুটোয় যদি বাপের নামে বোমা ফাটার সম্ভাবনা ঘটে, তা হ'লে সমস্ত রাত মায়ের নামেই বা ফাটবে না কেন। বোমা ভক্তি, বোমা শক্তি—ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। তাই বাঙালী বোমাচারী। তাই বাংলাদেশে বারীন ঘোষের যুগ বোমার যুগ হলেও, ব্যাপক বোমার যুগ হচ্ছে বর্তমান যুগ। প্রথম যুগের বোমা তৈরি হয়েছে পরাধীন

দেশে, ভয়ে ভয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে। এখন স্বাধীন দেশে আর লুকোবার দরকার নেই, ভয়ও নেই কাউকে, আচার চাটনির মতো এখন ঘরে ঘরে বোমা তৈরি চলছে। বোমা বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্পের তালিকায় এখন উচ্চস্থানে। ৮৭

এ পর্যন্ত মেনে নিলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের বোমাকে ইউনিভার্সিটি বোমা বলতেই বা ক্ষতি কি ? এক পারে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট, অন্য পারে ইউনিভার্সিটি —মাঝখানে দীঘি। ওপারে পরীক্ষার হলে ছোরা, এপারে সভাস্থলে বোমা। বোমা দীঘি পার হয়ে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতে দেরি হবে না। ৮৮

অর্থাৎ কোনো বিভাগেই বোমার ব্যবহার অচল থাকবে না। সুযোগ অনেক আসবে। অতএব ইনস্টিট্যুটে যাঁরা আহত হয়েছেন, গঠনতান্ত্রিক রীতিতেই তাঁরা ভবিষ্যতে বিরোধী দলে যেতে পারবেন, তখন তাঁদের পালা আসবে—তা সে এপারেই আসুক বা ওপারেই আসুক। সেই কথাটি স্মরণ ক'রে আজ বিজয়ার দিনে সবাই মিলে আনন্দ করুন। ৮৯, ১৮-৯-৫৩

ভূদান যজ্ঞ নতুন নয়

ঋষি বিনোবা ভাবে ভূদানযজ্ঞে যে খ্যাতি লাভ করেছেন, তা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। শুধু আমরা নই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশও এই ভূদানযজ্ঞ রীতির অভিনবত্বে বিস্মিত। কিন্তু ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে ঋষি বিনোবা ভাবের এই যজ্ঞ ভারতবর্ষে প্রথম নয়। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে ভূদানযজ্ঞ প্রথম প্রবর্তন করেন রাজর্ষি মাউণ্টব্যাটেন। তিনি মাত্র কয়েক মাসের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ভারতবর্ষকে একটি রেকর্ড স্থাপন করেন। পুরাণে আছে ভারতবর্ষ এই যজ্ঞে সে সময় মহম্মদ আলি জিন্নাকে মোট ২,২৮,৬২৫ বর্গ মাইল ভূমি দান করেছিল। সুতরাং ভূমির পরিমাণের দিক দিয়েও ঋষি বিনোবা ভাবে রাজর্ষি মাউণ্টব্যাটেনের সমকক্ষ হতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ৯০

শেক্সপীয়র না মারলো ?

ইংল্যাণ্ডের মহাকবি শেক্সপীয়ার নামে আমরা যাঁকে জানি, তাঁর নাটকগুলি সবই ক্রিস্টোফার মারলোর লেখা—শেক্সপীয়ার সম্পর্কে বিতর্কের এটি আধুনিকতম সংস্করণ। ক্যালভিন হপম্যান নামক এক মার্কিন নাট্যবিশারদের মতে মারলো যে ডেপ্‌ট্‌ফোর্ডের এক সরাইতে মত্ত অবস্থায় খুন হয়েছিলেন, সে কথা মিথ্যা,

সত্য হচ্ছে তিনি কেন্টের এক গীর্জায় লুকিয়ে থাকেন এবং এই নাটকগুলি লেখেন। তারপর মারলোর মৃত্যু হ'লে এক নকলনবীশ তাঁর রচনাগুলি শেক্সপীয়ারকে অর্পণ করেন। এই কথা প্রমাণের জন্য হফম্যান কয়েকটি কবর খুঁড়বেন মতলব করেছেন, কবরে সমসাময়িক দলিল ইত্যাদি পাওয়া যাবে। খবরটি প্রচার করেছেন 'নাফেন' প্রতিষ্ঠান। ৯১

শেক্সপীয়ার সম্পর্কে যে যাই বলুন, সত্য হওয়ায় বাধা নেই। কিন্তু হফম্যান মারলো সম্পর্কে যে ধারণা করেছেন, তা সত্য হ'লে মারলোর নামে যে নাটকগুলি প্রচলিত সেগুলি কার লেখা? শেক্সপীয়ারের দু একখানা নাটকে মারলোর প্রভাব আছে, কিন্তু যিনি মারলো তিনিই শেক্সপীয়র এ কল্পনা করা যায় না। সত্যাসত্য এখন নির্ভর করছে কবর খোঁড়ার উপর। হয়তো দেখা যাবে শেক্সপীয়ারের লেখা মারলোর নামে এবং মারলোর লেখা শেক্সপীয়ারের নামে চ'লে আসছে, কিম্বা যে ব্যক্তি ঊনত্রিশ বছর বয়সে মারলোকে মারল সেই শেক্সপীয়ার। ৯২

দাম্পত্য কলহ ১

হাওড়ার এক গ্রামের এক স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধে এবং তার ফলে স্ত্রী বঁটি নিয়ে স্বামীকে আক্রমণ ক'রে ভূতলশায়ী করেন। বর্তমানে এই স্বামী আছেন হাসপাতালে এবং স্ত্রী আছেন পুলিসের হেপাজতে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহ হলেও এটি দাম্পত্য কলহ নয়, যদিও সংবাদদাতা তাই বলেছেন। ৯৩

প্রবাদ আছে—অজাযুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে এবং দাম্পত্য কলহে আড়ম্বর বহু, ক্রিয়া লঘু। সুতরাং শাস্ত্রমতে এটি দাম্পত্য কলহ নয়। এখন কথা এই যে, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে দাম্পত্য কলহ বলা যায় কিনা। যে যুগে স্ত্রীর হাতে স্বামী খুন হয়ে যাওয়াও প্রায় স্বাভাবিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে, সে যুগে স্বামীর হাসপাতালে যাওয়া লঘু বৈকি। ৮৭

এ যুগ ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ। এই যুগে স্ত্রী স্বামীকে মারবে এবং মেরে আহত করবে, এটা এতই স্বাভাবিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক যে একে লঘু ঘটনা বা লঘু-ক্রিয়া বলায় কারোই আপত্তি থাকতে পারে না। ৯৫

স্বামী স্ত্রীর হাতে যে একটিমাত্র অস্ত্র তুলে দিয়েছে, তার নাম বঁটি। আমরা

অবশ্য অজ্ঞানতাবশতঃ মনে করি বঁটির একমাত্র কাজ তরিতরকারি কোটা, মাছ কোটা। জানি, কারণ এটাই আমাদের জানানো হয়েছে। এতে অবশ্য অন্যায় কিছু হয়নি, কেননা বিশেষ যুগে এক একটি জিনিষের বিশেষ অর্থ চালু থাকে, সেই অর্থ নতুন নতুন ব্যাখ্যাতার হাতে বদল হয়, কারণ ভাষ্যকারও যুগধর্মী। ৯৬

বর্তমানে মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক্সের প্রভাব বড়ই বেশি। কোনো জিনিষ তার ধ্বংসের বীজ নিজের মধ্যেই বহন করে—মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক্সের এটি মূল সূত্র। এই মত অনুযায়ী—কোনো জিনিসের অন্তর্নিহিত যে ধ্বংসের বীজ থাকে তা কালক্রমে বর্ধিত হয় এবং ধারককে ধ্বংস করে। ৯৭

স্বামীজাতিও তার অজ্ঞাতসারে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এক বঁটি ঢুকিয়ে এই বীজই পুষ্ট ক'রে এসেছে এতদিন। এই বীজ, অর্থাৎ এই বঁটি। বঁটি এখন স্বামীজাতিকে ধ্বংস করবে। এর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে লাভ কি? এখন ঘটনাপ্রবাহ এভাবেই চলতে দেওয়া ভাল। স্বামীজাতি স্ত্রীজাতিকে এতদিন অধীন ক'রে রেখেছে। স্বামী, প্রভু, কর্তা, শব্দগুলি স্বত্ব-স্বামিত্বই প্রমাণ করে। স্ত্রী, পুরুষের সম্পত্তি প্রমাণ করে। তাই নতুন যুগের স্বামী কিছুদিন স্ত্রীর হাতে মার খাক না? ৯৮

অবশ্য এই মার খাওয়া কারো শুভ কামনার উপর নির্ভর করে না, অনিবার্য-ভাবে মার সে খাবেই। বহু স্ত্রী এখন বঁটি ছেড়ে রাইফেল ধরেছেন, উৎকৃষ্ট লক্ষ্যভেদ শিখেছেন, এবং তার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। এ যুগে স্বামীনির্যাতন একটা সংবাদই নয়। ৯৯

সংবাদ হচ্ছে বারুইপুরের এক গ্রামে জনৈক যুবক তার বালিকাবধূকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে এবং কার্যশেষে পালিয়ে গেছে। পুলিস তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পেলে দুঃসাহসিকতার জন্য যুবকটিকে পুরস্কার দিলে মন্দ হয় না। নিখিল ভারত স্বামীরক্ষা সমিতি ঘটনাটির প্রতি লক্ষ রাখবেন আশা করি। ১০০, ২৭-৯-৫৩

পূজায় নরবলি

বোমা-সংস্কৃতি-মূলক কার্যফল গত ১৮-১০-৫৩তেও বেশ কিছু দেখা গিয়েছে। গৌরীবেড়তে এবং আরও অন্যান্য স্থানে অনেকেই বোমায় আহত হয়েছে। বীডন

স্কয়ারের কাছে একটি তেরো বছরের বালক মারা পড়েছে এবং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের বোমার আঘাতের ফলে আহত ছাত্রটির জীবনান্ত ঘটেছে। ১০১

পূজা উপলক্ষে এই সব নরহত্যা থেকে মনে হয় আমাদের প্রাচীন অবহেলিত নরবলি প্রথাটিই আবার ধীরে ধীরে একটু চেহারা বদলে ফিরে আসছে। এই মানুষ মারার প্রবৃত্তিতে একটি নতুন বৈশিষ্ট্যও এবারে দেখা গেল। ডায়মণ্ড হারবার রোডে অস্ত্রধারী পুলিসেরা এবারে ইট, ভাঙা-চেয়ার, প্রভৃতি অস্ত্রের সাহায্যে পরস্পর মারামারি করেছে। খুবই শুভ লক্ষণ। ১০২

আগামী কালীপূজা পর্যন্ত দেখা যাক এবারে হতাহতের সংখ্যা কি দাঁড়ায়। কালীপূজায় সুবিধা অনেক বেশি। লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিরেট ভিড়ের শহরে যথেচ্ছ আগুন নিয়ে খেলার লাইসেন্স পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। ১০৩

শিব ও অলঙ্কার ১

কানপুরের এক খবরে জানা যায়—এক মন্দির থেকে সওয়া লক্ষ টাকা মূল্যের মনিমুক্তাখচিত সোনার শিব-বিগ্রহ চুরি হয়ে গেছে। প্রতিদিন পূজার পর এই শিব-বিগ্রহকে লোহার সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখা হত। ১০৪

সওয়া লক্ষ টাকা!—প্রায় নোবেল পুরস্কারের সমান। চার্চিলের নোবেল পুরস্কার পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি চোর এই পুরস্কারের সমমূল্যের সম্পত্তি পেল, বড়ই বিসদৃশ মনে হয়। কিন্তু সত্যই কি বিসদৃশ? কারণ, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে ঐ লোকটি যে কৌশলে চুরি করেছে তা পাকা শিল্পীর কৌশল। সুতরাং মনে করা যাক না এই পুরস্কার সে শিল্পী হিসাবেই পেয়েছে? শিবই স্বয়ং তাকে পুরস্কৃত করেছেন? ১০৫

এই সঙ্গে এই শিববিগ্রহের পূজারী উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। কারণ শিব হলেন শ্মশানচারী সন্ন্যাসী, তিনি নির্লোভ, তিনি সদামুক্ত। তাই তিনি বাঙালী মেয়েদেরও এত পূজনীয়। শিবের মতো স্বামী চাই, কেননা যিনি সাতেও থাকেন না পাঁচেও থাকেন না, স্ত্রীর হাতে সকল ভার ছেড়ে দেন, তিনিই যে স্বামী রূপে আদর্শ এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন নিরাসক্তির আদর্শ যিনি ধরেছেন মেয়েদের কাছে, এমন পুরুষোচিত ঔদাসিন্যের আদর্শ যিনি ধরেছেন পুরুষদের কাছে,

সেই শিবকে সোনা আর মণিমুক্তায় মুড়ে সিন্দুকে বন্ধ করার মতো ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য। তাই তিনি পূজারীকে ক্ষমা করেননি, তিনি চোরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে মণিমুক্তার বন্ধন-থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। শিব উদাসীন কিন্তু নির্বোধ নন। ১০৬

বাঘের পরলোক গমন

আসামে এক বাঘেব পরলোকগমনের একটি চিত্তাকর্ষক খবর পড়লাম। মনে হয় বাঘটি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছে। দুঃখের বিষয় ভারতের এই বৃহত্তম বাঘটির মৃত্যু-সংবাদ যথাযোগ্যভাবে প্রচারিত হয়নি। যেটুকু খবর বেরিয়েছে তার মর্মকথা এই: অতি প্রত্যূষে এক গ্রামের এক শিক্ষকের বাড়ির মধ্যে বাঘটি প্রবেশ করে, তখন কেবলমাত্র ঐ শিক্ষকের বৃদ্ধা মাতা ভোরেব নমাজের জন্য হাত-মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, বাঘটি তাঁকে পিছন দিক থেকে চেপে ধরে। তারপব চিৎকারে কোনো এক বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক এসে বাঘকে গুলি করেন। বাঘটি পৌনে সাত-হাত (১০ ফুট ১॥ ইঞ্চি) দীর্ঘ। (ফিতে নিয়ে দৈর্ঘ্যের আন্দাজটা ক'রে দেখুন—এটিকে মহা বাঘ বলা যায় কি না।) ১০৭

ভোরবেলা যখন কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি তখন বাঘ মানুষ ধবাব ছুতো ক'বে এলো বাড়ির মধ্যে, এবং এসে এই বৃদ্ধাকে ধ'রে ব'সে থাকল, বন্দুক না আসা পযন্ত অপেক্ষা করল, নড়ল না। ইতিমধ্যে অন্য বাড়ি খবর গেল, বন্দুকধারী প্রস্তুত হয়ে এলেন এবং যথাকর্তব্য করলেন। আত্মধ্বংসকামী এমন দশফুট দেড় ইঞ্চি সেয়ানা বাঘ সংসারে বড় একটা দেখা যায় না। ১০৮

ব্যাখ্যা

গুজব: কোরিয়ার যুদ্ধবন্দীদের কাছে গৃহপ্রত্যাগমন নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারতীয় সেনাদল ব্যর্থ হচ্ছেন এই সংবাদ শুনে কলকাতার অনেক ব্যাখ্যা পুস্তক ব্যবসায়ী তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাঁরা এবারে বেশ কিছু লাভ করবেন বলে আশা করছেন। ১০৯, ২৫-১০-৫৩

* মহিষ ও মহিষমর্দিনী

এলাহাবাদ-বারাণসীর মধ্যবর্তী কোনো একস্থানে একখানা গাড়ি এক মোষের ধাক্কায় লাইনচ্যুত হয়েছে এবং তার ফলে ড্রাইভার, গার্ড, ও একজন কুলি

আহত হয়েছে। মোষের সঙ্গে ধাক্কায় অবাক হবার কিছু নেই, কারণ মোষ হচ্ছে যমের বাহন। এই বাহনের সাহায্যে যম সর্বত্র গুঁতো মেরে বেড়াচ্ছেন আজকাল। ওভার-টাইম খাটুনি, ক্লান্ত যম, ক্লান্ত মোষ, তাই যমকে শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে এখান থেকে। ১১০

মতান্তরে মহিষমর্দিনী এঞ্জিনরূপেন সংস্থিতা হয়ে রেল লাইনের উপর মর্দনের কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুপক্ষই পরাজিত হওয়ায় ব্যাপারটা মাঝপথেই থেমে গেছে। শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনের মুখে ভারী মন নিয়ে পুরো শক্তি প্রয়োগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, অপর পক্ষে মহিষাসুর কিঞ্চিৎ ঘায়েল হয়েছে। আপাতত এটাই আমাদের লাভ, বছরখানেকের মতো আমরা নিশ্চিন্ত। ১১১

ঘড়ি

বম্বাইতে এক চোরাকারবারী দলের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তাদের কাছ থেকে শহর-পুলিস দেড় লক্ষ টাকার চোরাচালানি ঘড়ি উদ্ধার করেছে। পুলিসের এই সাফল্যে ভারতবর্ষের দেড় লক্ষ টাকা দামের সময় বেঁচে গেল। ১১২

বাঘ ও বাঘারাম

আসামে বাঘারাম নামক একটি লোককে বাঘে খেয়েছে। নামের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! শুধু বাঘের আরাম দেবার জন্যই কি বেচারা বাঘারাম এতকাল বেঁচে ছিল? ১১৩

বিজয়া-মনোভাব ও কমিশন এজেন্সি

বিজয়া-ভাবাবেশে কত অসম্ভব সম্ভব হয়। পাওনাদারে দেনদারে পুলিসে চোরে, বাড়িওয়ালায় ভাড়াটিয়ায়, কোলাকুলি হয়। বিজয়া-মাইণ্ডেড চোরের হৃদয়ও এসময় ফুলে ওঠে, তিনিও কিঞ্চিৎ ত্যাগ করেন। এমনি একটি খবর বেরিয়েছে যুগান্তরে। ১১৪

খবরটি এই: মানকুণ্ডের জনৈক ভদ্রলোক নেতাজী সুভাষ রোডে হৃত-পকেট হন। তারপর হাওড়া পুলের উপর দিয়ে যখন তিনি ভারী মনে ও পায়ে চলছিলেন, তখন চোর তাঁকে ডেকে তাঁর ট্রেন ও ট্রামের মাসিক টিকিট ফেরৎ দিয়ে জনসমুদ্রে মিশে পড়েন। বিজয়ার আবেশ অবশ্যই, কিন্তু এই আবেশ যে একটি শুভ ইঙ্গিত বহন করছে তা একদিনেই শেষ হবে কেন? ১১৫

চোরদের দায়িত্ব এবং বিপদ বর্তমানে যে পরিমাণ বেড়েছে, তাতে এই দৃষ্টান্তটি অনুসরণ ক'রে ভবিষ্যৎ চোরদের একটি স্থায়ী নিরাপত্তা এবং অ-চোরদের একটা স্থায়ী নিশ্চিন্ততার পরিস্থিতি গ'ড়ে তোলা যেতে পারে। এ বিষয়ে একটি রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স হওয়া দরকার, কেননা আমার মতে এই দুর্দিনে চোরদের যেমন কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হওয়া দরকার, অ-চোরদেরও তেমনি মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ততা দরকার। ১১৬

এ বিষয়ে আমার একটি পরিকল্পনা আছে। সেটি এই: পকেট থেকে টাকার থ'লে তুলে নিয়ে পকেটমার হৃত-পকেটকে খোলাখুলি বলবেন—আপনার পকেটে যা ছিল তা আমি সরিয়েছি, কিন্তু আপনার ভয় নেই, আমি আপনার সব টাকাই ফেরৎ দেব, আপনি আমার এই সততার জন্য আমাকে মোট টাকার শতকরা সাড়ে বারো, অর্থাৎ টাকায় দু-আনা, কমিশন দেবেন। ১১৭

হৃত-পকেট ভদ্রলোক আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়বেন এবং তৎক্ষণাৎ টাকায় দু-আনা কমিশন দিয়েও ভাববেন সামান্য পয়সায় সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচা গেল। মনে করুন আপনার পকেটে হাজার টাকা ছিল, কিন্তু হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে দেখেন পকেট এবং বুক একেবারে শূন্য। তখন যদি প্রস্তাব আসে একশ পঁচিশ টাকা দিলে আপনি বাকি আটশ পঁচাত্তর টাকা ফিরে পাবেন, তা হ'লে তা কি আপনি দেবেন না? অবশ্যই দেবেন। প্রত্যেকেই দেবে। যার এক টাকা গেছে, সেও খুশি হয়ে দু-আনা দেবে। ১১৮

এই নতুন রীতির প্রচলন হলে চোরদের আর চোর নাম থাকবে না, নাম হবে কমিশন এজেন্ট। ব্যবসায়ে সততা অবশ্য থাকা চাই, এর মূলমন্ত্রই হবে সততা। সততা বিষয়ে সন্দেহ জাগলেই ব্যবসা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। যত টাকাই চুরি করুন, চোরেরা তা অকপটে স্বীকার করবেন, টাকায় দু-আনার বেশি কদাচ নেবেন না। ১১৯

এতে চোর অ-চোরের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে। একদা এক ভদ্রলোকের পকেটকাটার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস পুলিস ব'লে চেঁচিয়ে উঠতেই বিশিষ্ট পকেটমার ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন, পকেটে পয়সা তো ছিল দেখছি মোট চার আনা, তার জন্য আবার পুলিস ডাকছে—কি রকম ছোটলোক দেখ না! ১২০

এই জাতীয় অপমান আর ভবিষ্যতে সহ্য করতে হবে না, নীরবে দুটি পয়সা কমিশন দিয়ে চোদ্দ পয়সা ফিরে পেতে হবে। চোরদের এতে মার খাবার ভয় নেই, জেলে যাবার ভয় নেই, চোর নামের কলঙ্ক নেই এবং হাতের কৌশল উন্নত হ'লে যে-কোনো পকেটমার চার পাঁচ ঘণ্টা খাটলে দৈনিক পাঁচ থেকে দশ টাকা হেসেখেলে উপার্জন করতে পারবেন। একটা কলম তুললেও দু'তিন টাকা কমিশন পাবেন। কলেজের অধ্যাপকদের সমান আয়, সমাজে সম্মানের সঙ্গে বাস করা যাবে। তখন বি-এ, এম-এ, পিএইচ-ডি, অনেকে এতে স্বেচ্ছায় যোগ দেবেন। কারণ সৎপথে পরিশ্রম ক'রে উপার্জন সকলেরই কাম্য। ১২১,১-১১-৫৩

বোমার প্রশ্নোত্তর

গত ১৮ই অক্টোবর ১৯৬৩ বোমা ও বাঙালী প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন করেছিলাম —মনান্তরের ক্ষেত্রে বিবাহোদ্যত যুবক যদি ভাবি শ্বশুরকে লক্ষ ক'রে বোমা নিক্ষেপ করে তাহলে ক্ষতি কি? ১২২

এগারো দিন পরে এর উত্তর পাওয়া গেছে। গত ২৯শে অক্টোবর, অমৃতবাজার পত্রিকায় —বেহালা এলাকার এক যুবক তার দাবীর গুরুত্ব বোঝাবার জন্য কন্যা দানে অনিচ্ছুক পিতাকে লক্ষ ক'রে উক্ত কার্য সমাধা করেছে। ১২৩

বোমা-সংস্কৃতির প্রয়োগ-ক্ষেত্র যে দিনের পর দিন আরও বিস্তৃত হবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক। প্রয়োগ-ক্ষেত্র বলছি, কারণ সংস্কৃতি বা কালচারের ব্যাবহারিক একটা দিক আছে তা হয় তো অনেক ভুলে গেছেন। শুধু তাই নয়—ব্যবহারের ভিতর দিয়েই সংস্কৃতির পরিচয়। সংস্কৃতি শুধু রক্তে মিশে থাকলেই যথেষ্ট নয়, সংস্কৃতির সাহায্যে রক্তপাতও দরকার। ইংরেজিতে একে বলা চলে অ্যাপ্লায়েড কালচার বা কালচার ইন ইউনিফর্ম। ১২৪

স্বদেশী যুগে ইংরেজদের সম্মুখে বোমা ফাটানো এবং স্বাধীনতার যুগে দেবতাদের সম্মুখে বোমা ফাটানো—মূলতঃ একই, কারণ ইংরেজরাও আমাদের চোখে ছিল দেবতা। উদ্দেশ্যও একই মনে হচ্ছে। সে দিন বোমা ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজ তাড়ানোর উদ্দেশ্যে, আর আজ যে জন্যই বোমা ব্যবহৃত হোক, দেবতারা কিন্তু পালাচ্ছেন। ১২৫

যে দেবতা মানুষের মনের নীরব চিন্তা শুনতে পান, তাঁর কাছে যদি কিছু আবেদন থাকে এবং তা যদি ধ্বনির সাহায্যেই ব্যক্ত করতে হয়, তবে সে ধ্বনি কি বোমার ধ্বনির তুল্য কর্ণপটহ এবং হৃদয়ভেদী হওয়া নিতান্তই দরকার? ১২৬

হয় তো দরকার। কারণ দেবতারা সূক্ষ্ম মাইক্রোফোন-কর্ণা হওয়া সত্ত্বেও ভক্ত সব সময় নীরব প্রার্থনায় সন্তুষ্ট থাকতে চায় না, বাইরে শ্রদ্ধাপ্রেমের কিছু চিহ্ন প্রকাশ করতে চায়। বাঙালী কবি বলেন—

"মনে গোপনে থাকে প্রেম
যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।"

ইংরেজরা বলে Say it with flowers—অর্থাৎ ফুলের সাহায্যে বল। কিছু ফুল দাও, ওর মধ্য দিয়েই তো মার মনের কথা বেশি প্রকাশ হবে। তাই সব দেশেই শ্রদ্ধাস্পদ বা প্রেমাস্পদকে ফুলের অর্ঘ্য দেবার ব্যবস্থা আছে। বোমা কি এরই অভিব্যক্তি? অর্থাৎ Say it with bombs? বোমার সাহায্যে বল? ১২৭

পাকিস্থানীরা আরও এক ধাপ এগিয়েছে। তাদের নীতি মনে হচ্ছে Say *it* **with a gun**—বন্দুকের সাহায্যে বল। চট্টগ্রামের ঘটনা। ১২৮

মিস স্মার্ট যদি বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হয় তা হ'লে মুবারক আহমেদ তাকে গুলি করবে না কেন? মিস স্মার্ট যদি মুবারক আহমেদের হৃদয় ভাঙতে পারে, তা হলে মুবারক আহমেদ মিস স্মার্টের হৃৎপিণ্ড ভেদ করবে না কেন? মুবারক ঠিকই বুঝেছিল—বন্দুক ইউরোপীয় আবিষ্কার, অতএব ইউরোপীয় স্ত্রীলোক তার ভাষা বুঝবে। বুঝেছে ঠিক, তবে এপারে নয়, ওপারে গিয়ে। ১২৯

ভদ্রলোককে এড়িয়ে চলুন

গত ১-১১-৫৩ ডাক্তার কুঞ্জেশ্বর মিশ্র "প্রতারককে এড়িয়ে চলুন" পর্যায়ে যে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁর কাহিনী প'ড়ে মনে হচ্ছে আর "প্রতারককে এড়িয়ে চলুন" কেন? এবার থেকে নতুন শিরোনামা চলুক—"ভদ্রলোককে এড়িয়ে চলুন।" ১৩০

প্রতারককে যদি চেনা যেত তা হ'লে সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে পারত।

তারা সবাই ভদ্রলোককের বেশে দেখা দেয়, আর সেই জন্যই লোকে আগে কিছু বুঝতে পারে না। চেনার মূলমন্ত্র হচ্ছে—অপরিচিতের স্বতঃপ্রবৃত্ত উপকার নেবেন না। যে হাতে-হাতে আপনার কিছু লাভ করিয়ে দিতে চায়, চাকরি দিতে চায়, টাকা ডবল করে দিতে চায়, শস্তায় সোনা বিক্রি করতে চায়, ইত্যাদি রূপ তার কোনো প্রস্তাবেই কান দেবেন না। কথাটা বলা অবশ্য খুব সোজা, কিন্তু কান দিতে ইচ্ছা করে যে! ১৩১

সাম্প্রতিক একটি খবরে জানা যায়, হাওড়া জেলার এক নিঃসন্তান মহিলা সন্তানলাভের আশায় এক সাধুর হাতে প্রতারিত হয়েছেন। মাটির পাত্রে মহিলার যাবতীয় অলঙ্কার রাখা হয়, সাধু সেগুলো মন্ত্রপূত করেন এবং পাত্রের মুখ বন্ধ ক'রে মহিলাকে বলেন তিনদিন পর খুলতে হবে—খুললে ওষুধ পাওয়া যাবে। বহা বাহুল্য প্রতিশ্রুত ওষুধ, মন্ত্রপূত অলঙ্কার এবং অলৌকিক সাধু, সবই যথাকালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ১৩২

গায়ে প'ড়ে উপকার করতে ইচ্ছুক ভদ্রলোকদের মতো সাধুরাও সমাজে এখন ভয়ের হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। সাধুরা এককালে ছিলেন সংসার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, নির্লোভ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংসার ত্যাগী। তাঁদের খুঁজে বা'র করা শক্ত ছিল, তাঁরা নিজ নিজ সাধনায় মগ্ন থাকতেন, অরণ্যে পাহাড় পর্বতে বাস করতেন। তারপর একদা প্রতারকদের দৃষ্টি পড়ল তাঁদের উপর। ১৩৩

এই প্রতারকেরাই তাঁদের টেনে নিয়ে এলো লোকালয়ে, তারা সাধুদের পরিচয় করিয়ে দিল জনসাধারণের সঙ্গে, যে-সম্মান বিষয়ে সাধুরা উদাসীন, সেই সম্মান সাধুদের দিলে পুণ্য হবে এই শিক্ষা প্রচার করতে লাগল তারা জনসাধারণের মধ্যে। তারপর একদা তারা যখন বুঝতে পারল সংসারের বাজারে সাধুদের দর বেশ চ'ড়ে গেছে, তখন সেই প্রতারকেরা সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করল। তারাই তখন সাধু সেজে লোক ঠকাতে লাগল। ১৩৪

এই হ'ল ভণ্ড সাধুর আবির্ভাব ইতিহাস। এ ইতিহাস পুরাতন, সবারই জানা। কিন্তু তবু লোকে জেনেশুনেও আজও ভণ্ড সাধুর হাতে প্রতারিত হয় কেন? হয়, কারণ নির্বোধদের মধ্যেও দুটি দল আছে—একদল প্রাচীনপন্থী,

একদল আধুনিকপন্থী। একদল রক্ষণশীল, একল প্রগতিবাদী। রক্ষণশীলরা পুরাতন পন্থায় ঠকতে ভালবাসে। তারা এমনই প্রগতি-বিদ্বেষী যে আধুনিক প্রতারক তাদের ঠকাতে পারে না, যেমন কোনো ভণ্ড সাধু প্রগতিপন্থীকে ঠকাতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শের প্রতারককে পছন্দ করে। ১৩৫

প্রাচীনপন্থীরা অবশ্য আধুনিক কিছুই পছন্দ করে না। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বলে কালে কালে কতই দেখব, আমাদের কালে বাপু এসব ছিল না। এমন সময় যদি কোনো সাধু এসে বলে টাকা ডবল করতে জানি, তা হলে তৎক্ষণাৎ তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, বলে, এসো বাবা, প্রণাম হই। ১৩৬

প্রাচীনপন্থীবা টাকা ডবল, সোনা ডবল, এবং যাবতীয় ডবল ধর্মে বিশ্বাসী। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে জীবনেব সঞ্চয় সাধুর হাতে তুলে দিয়ে অতি সহজে বিষয়ভার মুক্ত হয়। এই পরিচিত পথে প্রতাবিত হ'তে কত আরাম। ঠকাচ্ছে জেনেও একটা তৃপ্তি। ১৩৭

তবে প্রতরকরাই যে সব সময় বাহবা পায়, এটা কি ঠিক? আমাব মতে যারা প্রতারিত হয় তারাই বেশি প্রতিভাবান। তারা উপযুক্ত প্রতারককে ঠিক খুঁজে বা'র করে। তবু এই প্রতিভাকে অগ্রাহ্য ক'বে সবাই প্রতারকের প্রতিভার উদ্দেশেই যে সাধু সাধু ধ্বনি তোলে এটা বড়ই অন্যায়, প্রতারিতদেব তবফ থেকে এব প্রতিবাদ হওয়া উচিত। ১৩৮,৮-১১-৫৩

ব্যাঙের সাপ খাওয়া : ব্যক্তিগত ব্যাপার

হাজারীবাগের এক ব্যাঙ সাপ খেয়েছে। খবরে বলা হয়েছে প্রকৃতির বিধান উল্টে গেল। পত্রান্তরেও এই রকম মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল, কারণ ব্যাঙের সাপ খাওয়া নতুন ঘটনা নয়। যেদিন থেকে সাপ ব্যাঙ খাচ্ছে, সেইদিন থেকেই ব্যাঙও সাপ খেয়ে আসছে, যদিও সাপের ব্যাঙ খাওয়ার অনুকরণে ব্যাঙের পক্ষে সব সাপ খাওয়া সম্ভব নয়। আসল কথা—ব্যাঙ আমিষভুক, অতএব তার খাদ্য-তালিকায় তাদের খাওয়ার উপযুক্ত সাপও আছে। ব্যাঙদেব এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়ে সংবাদ সৃষ্টি অনাবশ্যক। ১৩৯

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার মনে করি—কে কি খায়, কে কি পরে, তা সমস্তই বক্তিগত

রুচির ব্যাপার। এ নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে নেই। এ রকম আলোচনা সভ্য সমাজরীতির বহির্ভূত। দেখতে হবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষ বা ইতর প্রাণী বা ব্যাঙ যাই করুক, সমাজের মধ্যে এসে সে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দ্বারা আর সবার ক্ষতি করছে কি না। ১৪০

একটি পাঁঠার ব্যক্তিগত অনেক রুচি বা প্রবৃত্তি আমাদের কাছে ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু দেখতে হবে সর্বজনীন ক্ষেত্রে সে আমাদের মাংস (আড়াই টাকা সের) দিতে অস্বীকার করছে কি না, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে সে ছুরির সামনে গলা বাড়াতে অস্বীকার করছে কিনা। ১৪১

ব্যাঙ এ বিষয়ে খুব বিবেচক, তার প্রকাশ্যে সাপ খাওয়া বড় একটা দেখা যায় না; তবু যদি কেউ দৈবাৎ দেখে ফেলে তা'হলে সেটিকে তার হাঁড়ির খবর হিসাবে প্রচার করায় কোনো বাহাদুরি নেই। এটি বিচারের ভুল ভিন্ন আর কিছুই নই। ১৪২

মানুষ সম্পর্কেও এইভাবেই আমাদের বিচারের ভুল হয়। ভুলে যাই যে, মানুষের বিচার-বিবেচনা, দয়ামায়া, প্রভৃতি যত গুণই থাক, পশুত্ব তার ভিত্তি। অতএব কোনো মানুষের বিচারের সময় আগে থাকতেই ধ'রে নেওয়া উচিত যে, ব্যক্তিগত-ভাবে সে ভণ্ড, জুয়াচোর, শঠ সবই। এনিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমরা দেখব সাময়িকভাবে তার কাছ থেকে উদ্বৃত্ত কি পাচ্ছি। আমরা শুধু তারই দাম দেব। এই আদর্শ বজায় রাখতে পারলে মানুষ সম্পর্কে আর আশাভঙ্গের বেদনা সহ্য করতে হবে না। মানুষকে আমরা আগেই দেবতা ধ'রে নিলে ঠকব, আগেই পশু ধ'রে নিলে লাভবান হব। ১৪৩

মানুষ সম্পর্কে এতটা কনসেশন যদি দিতে পারি তা'হলে ব্যাঙ সম্পর্কে আরও বেশি পারব। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাঙের দান অপরিসীম। লুইজি গালভানি বিদ্যুতের সাহায্যে মরা ব্যাঙ নাচিয়ে, পেশী ও বিদ্যুতের সম্পর্ক বিষয়ে যে সব পরীক্ষা করেছিলেন তাতে বিজ্ঞান-জগৎ এককালে গ্যালভানাইজড হয়েছিল। জীববিদ্যার বহুবিধ পরীক্ষায় ল্যাবরেটরিতে লক্ষ লক্ষ ব্যাঙের আত্মবলি আজও অব্যাহত আছে। তা ভিন্ন অনেক মানুষ ব্যাঙের মাংস ভক্ষণ করে। এমন মানবহিকতারী ব্যাঙ যদি ব্যক্তিগত অভ্যাসবশতঃ সাপ খেয়ে থাকে তবে তার এই বিশুদ্ধ ব্যাঙধর্ম পালন করা নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি ন্যায়সঙ্গত হয় না। ১৪৪

ষণ্ড-প্রলয়

গুয়াটেমালা নগরে বুলফাইট বা ষাঁড়ের লড়াই-এর জন্য তৈরি নতুন স্টেডিয়ামে এক জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা উপস্থিত থাকবেন এই ডবল আকর্ষণে দর্শক ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, ফলে এ ক্ষেত্রে যা কর্তব্য তা শুরু হয়। পুলিস সংযতভাবে গুলি চালিয়েও আঠারোজনকে ঘায়েল করে। বহুরকম উপলক্ষে খণ্ড-প্রলয়ের কথা ইতিহাসে ও খবরের কাগজে লেখা হয়—ষণ্ড-প্রলয় এই প্রথম।

১৭৫

ছোঁয়াচে

ইংলণ্ডে গাই ফকস্ (Guy Fawkes)-এর মূর্তি পোড়ানো হয় ৫ই নভেম্বর। ঐ তারিখে একটি বড় ষড়যন্ত্র (গান্-পাউডার প্লট নামে পরিচিত) ধরা পড়ে, এটি তারই স্মৃতি উৎসব। ১৬০৫ সনে রাজা প্রথম জেমস-সহ পার্লামেণ্ট গৃহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে গাই ফকস্ প্রভৃতি কয়েকজন লোক ছত্রিশ পিপে বারুদের মাইন তৈরি করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে এই ষড়যন্ত্র ৫ই নভেম্বর ধরা প’ড়ে যায় এবং গাই ফকস্‌কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সেই থেকে সেখানে আতস-বাজির উৎসব সম্বলিত “গাই ফকস্ দিবস” পালিত হয়ে আসছে। ১৭৬

কিন্তু এই উৎসবে এবারের বাজি পোড়ানোয় একটা বে-আইনী বেপরোয়াভাব লক্ষ্য করা গেছে। ছাত্ররা পুলিসের গায়ে পর্যন্ত বাজি নিক্ষেপ করেছে এবং বহু ধরপাকড়ও হয়েছে। উৎসবের এই শ্রেণীর রূপান্তর আমরা জানি একমাত্র বাংলাদেশেই ঘটেছে। ইংল্যাণ্ডেও ঘটল কেন? বহু বাঙালী বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে আছেন, তাঁরা অবশ্যই এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারবেন। ১৭৭

গুম্ফশ্মশ্রুকেশশিখার আর এক দিক

ম্যানিলার একটি খবরে জানা যায়—সেনেটর চিপ্রিয়ানো প্রিমিচিয়াস বর্তমান লিবারেল পার্টির শাসনকালে যে দুর্নীতির প্রশ্রয় চলছে, তার প্রতিবাদকল্পে মুখে গোঁফ গজাচ্ছেন; আগামী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে যদি তাঁর পক্ষের ভূতপূর্ব ডিফেন্স সেক্রেটারি জয়লাভ করেন তবেই তিনি গোঁফ কামাবেন, নইলে নয়। ১৭৮

তিনটি ছবি মনে জাগছে। একটি মহাভারতের যুগের। দ্রৌপদী দুঃশাসনের দুষ্কার্যের প্রতিবাদে এলোকেশী ছিলেন। দ্বিতীয়টি অর্ধৈতিহাসিক। চাণক্য নন্দের দুষ্কার্যের প্রতিশোধ বাসনায় এলোশিখা ছিলেন। তৃতীয়টি বর্তমান কলকাতা

শহরে। স্থানীয় এক মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠানের আমাদের পরিচিত এক কর্মী নিয়মিত বেতন না পাওয়ার প্রতিবাদে দাড়ি রেখেছিলেন। আমরা দাড়ির দৈর্ঘ্য দেখেই বুঝতে পারতাম কতদিনের বেতন বাকি পড়েছে। অনেককাল তাঁর সঙ্গে দেখা নেই, হঠাৎ একদিন দেখি চেহারা তাঁর প্রায় পঞ্জাবীদের মতো হয়েছে। তিনি নিজেই বললেন, তিন মাস। তারপর আরও কিছুদিন পর দেখা, এবারে মুখ পরিষ্কার। সবাই মিলে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম তাঁকে এবং যতদূর স্মরণ হয় কিছু টাকা ধারও চেয়েছিলাম। ১৪৯

শ্যামাপূজা ও শ্যামাপোকা

কলকাতায় শ্যামাপোকার আবির্ভাবে কর্পোরেশনের চোদ্দ হাজার গ্যাসের আলো অকেজো হয়েছে। একাধারে আলোয় মৃত্যু এবং আলোর মৃত্যু। পোকার নাম শ্যামাপোকা কারণ এরা শ্যামাপূজার সময় দেখা দেয়। এ পোকা এখন আর শুধু বাইরের পোকা নয়, এ সময় অন্তরে বাহিরে পোকার আবির্ভাব ঘটে। তফাৎ এই যে, অন্তরের পোকা ঝোঁকে বোমার দিকে, আর বাইরের পোকা ঝোঁকে আলোর দিকে। ইতিপূর্বে শ্যামাপোকা মাত্রেই বাইরে বেরিয়ে আসত, তাই শ্যামাপূজা ছিল শুধু আলোর উৎসব। ১৫০

কিন্তু কোনো পোকা-বিজ্ঞানী বলতে পারেন কলকাতা শহরে কোটি কোটি শ্যামাপোকা একটা নির্দিষ্ট দিনে দেখা দেয় কেমন ক'রে? এবারে শ্যামাপোকার আবির্ভাব ও তিরোধান দিবস ছিল গত ৩০শে অক্টোবর। হিসাব রাখা হয়নি, তাই অতীতের তারিখগুলি জানা নেই। যদি কেউ হিসাব রেখে থাকেন তা'হলে বোঝা যাবে প্রতি বৎসর ৩০শে অক্টোবরেই দেখা দেয় কি না।

১৫১, ১৫ ১১ ৫৩

কলি কি এলো?

বসুমতীর জনৈক পত্রলেখক এক পঞ্জিকা থেকে "৯ই ডিসেম্বর (১৯৫৩) বুধবার শ্রীশ্রীকল্কিদেবাবির্ভাব" উদ্ধৃত ক'রে প্রশ্ন করেছেন "কল্কি এবং সত্যযুগের সন্ধিক্ষণে কল্কিদেবের আবির্ভাব হবে—সত্যই কি সেই সন্ধিক্ষণ উপস্থিত?" ১৫২

এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে দ্বাপর যুগের পরে যে কলিযুগ আরম্ভ হ'ল তার স্থিতিকাল ৪,৩২,০০০ বছর। কল্কির আবির্ভাব হওয়া উচিত কলির

অবসানে। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসন সময় থেকে (কলিযুগের আরম্ভ) হিসাব ধরলে (পণ্ডিতদের মতে) বর্তমানে তার মাত্র ৫০০০ বছরের কিছু বেশি পার হয়েছে। কিন্তু তবু যদি এই বছরেই কলিযুগের শেষ হয়ে যায় তা হ'লে অনুমান করতে হবে কলিযুগের স্থিতিকাল গণনায় ভুল আছে। ১৫৩

বরাহপুরাণ মতে অন্তিম কলিতে পৃথিবী গঙ্গাহীন হবে এবং বিষ্ণুও সেই সময় পৃথিবী ত্যাগ করবেন। গঙ্গার ধারে গিয়ে গঙ্গাকে প্রত্যক্ষ করলে সন্দেহ থাকে না যে, গঙ্গা পৃথিবী ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তবে আগামী ৯ই ডিসেম্বর তারিখেই এ রকম একটা বিপর্যয় ঘটবে ব'লে মনে হয় না। ১৫৪

সত্যযুগ নেই। (সত্যযুগ নামক খবরের কাগজও নেই) ত্রেতা, দ্বাপর, বহুকাল গত। এখন কলিযুগও যদি আগামী ডিসেম্বরে গত হয় তা হ'লে ভবিষ্যৎ কি? যুগান্তর কাগজও কি তার অজ্ঞাতসারে এই যুগান্তরেরই ইঙ্গিত বহন করছে নিজের নামের মধ্যে? ১৫৫

তবু আশা করা যায় আগামী যুগ কলিযুগের মতো খারাপ হবে না। এমন একটা হতচ্ছাড়া যুগ যত শীঘ্র গত হয় ততই মঙ্গল। প্রার্থনা করি আগামী যুগ প্রাচুর্যের যুগ হোক, সকল বিরোধ অবসানের যুগ হোক, পৃথিবীর কল্যাণেব যুগ হোক। ১৫৬

কপিরাইট

শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের গল্পটি কোনো একখানা হিন্দি ছবিতে নেওয়া হয়েছে শরৎচন্দ্রের নামটি বাদ দিয়ে। সাধারণত এ রকম অনুকরণ বা আত্মসাৎ বা ছায়া গ্রহণ, কপিরাইট আইনের আওতায় আসে। কপিরাইট আইনে বলে, মূলের কোনো অংশ নিলেও আইন ভঙ্গ করা হয়। কিন্তু আমি কপিরাইট আইন (ইণ্টারন্যাশন্যাল কনভেনশন) এই ঘটনার পর আরও একবার পড়ে দেখলাম। তাতে বোঝা গেল উক্ত কাহিনী, হিন্দি ছবিতে যে ভাবে নেওয়া হয়েছে, তাতে কপিরাইট-আইনভঙ্গ-জনিত অপরাধ হয়নি। ১৫৭

একখানা ইংরেজী কাগজের সমালোচনায় বলা হয়েছে পল্লীসমাজের সকল চরিত্রই ঠিক আছে, শুধু শরৎচন্দ্রের বইতে যে ক্রটি ছিল, মাত্র সেটুকু সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের বইতে রমা ও রমেশ গান গায়নি, হিন্দি বইতে

গান গেয়েছে। মনে হয় কপিরাইট আইনে এইখানে ফাঁক আছে। মূল কাহিনীর নায়ক-নায়িকা যদি গান না জানে, অথবা জেনেও না গায়, অথবা না নাচে, তা হলে সেই কাহিনীর এই সব ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিলেও কপিরাইট আইন ভঙ্গ হয়—এমন কথা উক্ত আইনের কোথায়ও উল্লেখ নেই। ১৫৮

ধরা যাক্ আপনি ঘরে-বাইরে কাহিনীটি হিন্দিতে রূপান্তরিত ক'রে ছবি তুলবেন। আপনাকে বিশ্বভারতীর অনুমতি নিতে হবে না, বইখানা রবীন্দ্রনাথের তাও স্বীকার করার দরকার নেই—আপনার নিজের রচনা বলেই চালাতে পারবেন যদি নিখিলেশ ও সন্দীপের নাচ এবং বিমলার মুখে এক বা একাধিক গান বসিয়ে দেন। সাম্প্রতিক হিন্দি ছবিতে একটি বড় নজির স্থাপিত হ'ল। ১৫৯

শ্রী সমস্যা

বাংলাদেশে শ্রী সমস্যা অতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। ইংরেজ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীল থেকে শ্রী বাদ দিতে হয়েছিল, কেননা শ্রী ও পদ্ম এক সঙ্গে থাকলেই নাকি তা নিতান্তই হিন্দুধর্মের ব্যাপার হয়ে পড়ে। তারপর রবীন্দ্রনাথ নামের সঙ্গে শ্রী ব্যবহার বিষয়ে, অন্তত নিজের নামে নিজেই শ্রী লেখা নিয়ে, সন্দেহে পড়েন এবং শ্রী ত্যাগ করেন। আমরাও অনেকে সমসন্দেহে শ্রী ত্যাগ করেছি নিজে লেখার সময়। শ্রীর স্থলে ভুল ক'রে কেউ স্ত্রী পড়বেন না, আশা করি। ১৬০

বিশ্ববিদ্যালয়ের সীল থেকে শ্রী বেরিয়ে এলো, নাম থেকেও বিযুক্ত হল, শ্রী হ'ল বাস্তহারা। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল শ্রী-র সুদিন এসেছে, শ্রী বেপরোয়া-ভাবে ব্যবসায়িক নামের শেষ দিকে স্থান পেয়ে গেছে। এতে আপত্তির কিছু নেই, যদিও বাড়াবাড়িটা দৃষ্টিকটু। শ্রী ঐশ্বর্যের সঙ্গে, ধনের সঙ্গে, কমনীয় এবং রমণীয় ভাবের সঙ্গে, একসূত্রে গাঁথা। লক্ষ্মীর সঙ্গে এই শ্রী-র এমনি সম্বন্ধ যে, লক্ষ্মীর অপর নাম শ্রী। ১৬১

অতএব কুস্তিগির, পেশীবহুল পৌরুষ, এবং সার্কাসবিদের সঙ্গে এই অর্থে শ্রী যুক্ত করা পৌরুষের পক্ষে, পেশীর পক্ষে, এবং সার্কাসের পক্ষে, খুব সুষম বোধ হয় না। কলকাতার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে কলিকাতাশ্রী বলায় আপত্তি নেই, কিন্তু পৌরুষদৃপ্ত বীর কেন রমণীয়তার জন্য এত লালায়িত হবে? কুস্তিগির কেন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটশ্রী, হ্যারিসন রোডশ্রী, চিৎপুরশ্রী, শ্যামবাজারশ্রী, দমদমশ্রী, শালখিয়াশ্রী বা টালিগঞ্জশ্রী

হয়ে গৌরব বোধ করবে? এ কি বাঙালীর পৌরুষকেই অপমান নয়, লীলায়িত রমণীয় নারীধর্মীরূপে নিজেদের পরিচয় দিয়ে? লক্ষ্মীর সঙ্গে পেশী ও কুস্তির প্যাঁচ যুক্ত করে? ১৬২

কিন্তু এই শ্রী সমস্যা আরও ঘোরালো হয়েছে রাষ্ট্রের হাতে। শ্রী-কে ইংরেজী মিস্টারের সমার্থক করা হয়েছে এখন। অর্থাৎ এমন মনে করা যেতে পারে যে, বঙ্গশ্রী অর্থ বঙ্গ-মিস্টার, মঞ্জুশ্রী অর্থ মঞ্জু-মিস্টার। এ অতি জঘন্য পরিস্থিতি, ভাবতেও মন অশান্ত হয়ে ওঠে। ১৬৩

নব পঞ্চায়েতি

সম্প্রতি হাওড়া আদালত প্রাঙ্গণে মামলারত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে প্রথমতঃ কথাকাটাকাটি এবং পরে লাঠি, ছোরা, সোডারবোতল, চালনা শুরু হয়। কয়েকজন লোক উত্তেজিতভাবে এস-ডি-ও-র আদালতের মধ্যে ঢুকে সব তছনছ করতে থাকে। এস-ডি-ও তখন ছিলেন বিশ্রাম কামরায়—পেশকার প্রাণভয়ে ছুটে গিয়ে এস-ডি-ও-র আশ্রিত হন, বাইরে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়—এবং আদালত থেকে উকিলেরাও সব পালাতে থাকেন। বিবদমান দলেরা এভাবে নিজেরাই নিজেদের বিচার শুরু করলে ভালই হবে। আদালতের খরচ নেই, একেবারে পঞ্চায়েতি রীতি। এই রীতি এমনই ক্ষুরধার এবং তড়িৎগতি যে এর সামনে দীর্ঘমেয়াদি বিচার চালনায় অভ্যস্ত ব্যক্তিরা দাঁড়াবেন কোন্ সাহসে? ইংরেজ আমলে আইন-অমান্যকারী এবং ব্রিটিশ-বিচার-অসহিষ্ণু তথাকথিত অপরাধীদের বেলায় যা ঘটতে পারেনি, স্বাধীন ভারতে তা সম্ভব হ'ল। অর্থাৎ উকিলেরা পর্যন্ত ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

১৬৪, ২৯-১১-৫৩

রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধুত্ব

পাক-মার্কিন রণবন্ধুত্ব বা ঘাঁটিবন্ধুত্ব নিয়ে আমরা কেন বিচলিত হচ্ছি? পাকিস্থান স্বাধীন রাষ্ট্র, সুতরাং যে-কোনো বন্ধুত্ব স্থাপনে তার অধিকার আছে। এতে আমাদের রাজ্যে যে প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে সেইটুকুর শুধু আভাস দিয়েছেন শ্রীনেহেরু। পাকিস্থানের কোনো সিদ্ধান্তে হাত দেবার কথাই ওঠেনি, কারণ অধিকার নেই। ১৬৫

পাকিস্থানের কোনো নীতিতে বিচলিত হলেই সে মনে করবে তবে তো আমরা

ঠিকই করছি। এমনি এখন মনোভাব। পাকিস্থানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালিয়ে আমরাও যদি আমেরিকাকে ডাকি, তা হলেই সব চুকে যায়। পরিস্থিতি এরই অনুকূলে চলেছে। তবে আমেরিকাকে তার জন্য দাম দিতে হবে, দাম চাইবে তারা। আমরা কি দাম দেব, সে হবে সমস্যা।

দিই যদি তো কি দাম দেবে,
যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে,
ফিরে এসে দেখি ধূলায়
ঘটিটি তার গেছে গ'ড়ে।

সম্ভবতঃ এই জন্যই শ্রীনেহেরু রাজী হচ্ছেন না। ১৮৮

সাধু ও শান্তি

গত ৬ই ডিসেম্বর হাওড়ায় একদল সাধু শোভাযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন শতাধিক। তাদের হাতে ছিল সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল, গৈরিক পতাকা। ধূপধুনা এবং শঙ্খধ্বনিসহ তাঁরা বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ করেন। তাঁহাদের ধ্বনি ছিল : পৃথিবীর শান্তি রক্ষা কর। ১৮৭

শুভ লক্ষণ। অসাধুদের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। বহুকাল ধ'রে চেষ্টা চলছে, হয়নি কিছুই। কারণ সত্য সাধু-চেষ্টাই হয়নি এতকাল। এই প্রথম একদল সংসারত্যাগী সাধু 'আমাদের দাবী পূরণ কর' না ব'লে পৃথিবীর শান্তি হোক কামনা করলেন। ১৮৮

হঠাৎ যেন ক্ষণকালের জন্য প্রাচীন ভারতের রূপটা ঝলকিত হয়ে উঠল। এই প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে আমরা বহু দূরে স'রে এসেছি। সামাজিক বিবর্তনের পথে আমরা এখন এমন একটা যুগে এসে পড়েছি যে, এখন আর চেষ্টা ক'রে সে যুগে ফিরে যেতে পারি না। যেমন আমরা বয়স্করা শৈশবের স্বপ্ন দেখি, শিশু হ'তে পারি না। কিন্তু তবু অতীতকে স্মরণ ক'রে ভবিষ্যৎকে কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করতে পারি এখনও। ১৮৯

তপোবনের ধ্বনি ছিল শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। পৃথিবীর সকল মানুষকে সম্বোধন ক'রে এই আবেদন। এ একেবারেই সেকেলে হয়ে পড়েছে। এখন আবেদন শুধু নিজের জন্য, প্রার্থনাও এখন তাই, শুধু নিজের চাকরির জন্য, নিজের পদোন্নতির

জন্য, নিজে লটারির টাকা জেতার জন্য। হাওড়ার সাধুরা তাই বহুযুগ পরে পুরনো সুরটাই ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন দেখে ভাল লাগল। বর্তমানের আত্মসর্বস্ব মনোভাবটা নতুন ক'রে রিভাইজ ক'রে নেবার ইঙ্গিত আছে ওর মধ্যে। ১৭০

শিল্পীর ভাগ্য

গত পয়লা ডিসেম্বর কোপেনহাগেনের পথে আর এক শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। সাধুর শোভাযাত্রা নয়, তিন হাজার অনাহারক্লিষ্ট চিত্রশিল্পীর শোভাযাত্রা। তাঁবা রঙেব পেলেট ও বড বড় তুলি হাতে বেরিয়ে পার্লামেণ্টে গিয়ে হাজির হন। তবু ভাল যে, তাঁদের শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের আবেদন শুনেছেন এবং অবিলম্বে একটা কিছু করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। মনে হয় এঁরা সবাই চিত্রশিল্পীর গোত্রে ইম্প্রেশনিস্ট এবং এবং সবাই বড় আর্টিস্ট, তার প্রমাণ তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীর মনে সফল ইম্প্রেশন এঁকেছেন। ১৭১

ইউরোপের এই আধুনিক শিল্পীদেব পূর্বপুরুষবা ছিলেন ঐহিক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। দুনিয়াকে গ্রাহ্য করতেন না তাবা, খাওয়া পবার প্রশ্নটা তাঁদের কাছে ছিল অবাস্তব, শুধু মনেব আনন্দে, নিজ নিজ রুচিতে ছবি আঁকতেন প্রচলিত শিল্পরীতিকে অগ্রাহ্য ক'রে। শিল্পরীতির সঙ্গে জীবনের বাঁধা পথের রীতিও তাঁরা ভেঙেছিলেন, অথচ তাঁদের ছবির কোনো আদর ছিল না। ১৭২

ছবির দর এবং আদর বেড়েছে তাদেব মৃত্যুর পর। তাঁরা নিজেরা না খেয়ে জাতিকে বড ক'বে গেছেন। সেই সব শিল্পীব উত্তরপুরুষেরা এখন না খেয়ে থাকবেন কেন? জাতীয় রাষ্ট্র তাঁদের অবহেলা করতে পারেন না। শিল্পী, সাহিত্যিক, গুণী, জ্ঞানী না খেয়ে থাকলে রাষ্ট্র তবে কাদের নিয়ে? ১৭৩

স্ত্রীগিরি একটি চাকবি মাত্র

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক এক সময় ছিল প্রভু ও দাসীর। তারপর শোনা গেল, তারা প্রভু-দাসী নয়, সমান অংশীদার। আরও পরে জানা গেছে, সম্পর্ক খানিকটা দাম্পত্য, বাদবাকী পরস্পর-নিরপেক্ষ। সর্বাধুনিক সংবাদ—স্ত্রীর পদ একটি চাকরির পদ মাত্র। গত রবিবারের একটি বিজ্ঞাপন থেকে এই সত্যটি পাওয়া গেছে। বিবাহের বিজ্ঞাপন কর্মখালি'র কলমে! এক সরকারী চাকুরে বিয়ে করতে চান—অর্থাৎ একটি মেয়েকে স্ত্রীর পদে নিযুক্ত করতে চান। ১৭৪

বিয়ের আগে স্ত্রীর পদ খালি থাকে এটি সত্য কথা, কে জানত সেটি একটি চাকরির পদ? কিংবা জেনেও কথাটা বেতন দেবার ভয়ে এতদিন চাপা দেওয়া হয়েছে? এই বিবাহেচ্ছু ভদ্রলোক এতদিনের গোপন কথাটা ফাঁস ক'রে দিয়ে পুরুষদের কি অনিষ্ট করলেন তা সবাই এখন বুঝতে পারবেন। ১১৫

বিজ্ঞাপনে সব কথা খুলে বলা হয়নি। চাকরি স্থায়ী কি অস্থায়ী, কত টাকায় শুরু, কত টাকায় শেষ, পেনশন আছে কিনা, এ সব কিছুই উল্লেখ নেই। সরকারী চাকুরের স্ত্রীর চাকরিটিও সরকারী চাকরিরূপে গণ্য হবে কি না, তাও বলা হয়নি। তাই, যে সব স্ত্রী ঘরে ঘরে বিনা-বেতনে এতকাল শিক্ষানবিশি করছেন তারা এখন কি পরিমাণ বেতন দাবী করবেন, অথবা কি পরিমাণ না পেলে ধর্মঘট করবেন, সে বিষয়ে একটা গণ্ডগোল রয়ে গেল। আর যাই হোক তাঁরা যেন মজুর শ্রেণীভুক্ত হয়ে ট্রেড ইউনিয়নে যোগ না দেন। ১১৬, ১৩ ১২-৫৩

শিশিরকুমার ভাদুড়ির বক্তৃতা

কমলাকান্ত শর্মা নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সাম্প্রতিক বক্তৃতা (যুগান্তরে গত ১১ ও ১২ ডিসেম্বর প্রকাশিত) সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন। জাতীয় নাট্যশালা বলতে শিশিরকুমার কি বলতে চান সে কথাটারও ব্যাখ্যা যথাযথ হয়েছে। শুধু একটা কথা আরও একবার ভেবে দেখবার মতো। শর্মা বলেছেন বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন আইডিয়ার পথ বন্ধ ব'লেই শক্তিমান লেখকেরা উপন্যাস রচনার পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, বাংলা নাট্যমঞ্চ বত্রিশ বছর আগে যে অবস্থায় এসেছিল তা থেকে পিছিয়ে পড়েছে কেন? মঞ্চের এই দুরবস্থা কেন? ১১৭

"নতুন আইডিয়ার পথ বন্ধ" কথাটার আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমার মনে হয়, মঞ্চের দিক দিয়ে নতুন আইডিয়ার নাটক গ্রহণে ত্রুটি হয়নি। সামাজিক নাটক এবং স্যাটায়ার দুই-ই নেওয়া হয়েছে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে। জীবনী-নাট্যও নতুন—কিন্তু তাও একাধিক হয়েছে। মনে হয় দর্শকই নতুন আইডিয়া গ্রহণে প্রস্তুত হয়নি। শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রস্তুত, কিন্তু মঞ্চকে যদি নাটক বিক্রির টাকায় চালাতে হয় তা হ'লে সাধারণ দর্শকের কাছেও টিকিট বিক্রি করা দরকার। কিন্তু নতুন আইডিয়া জনসাধারণ গ্রহণ করে না এ কথা সর্বজনবিদিত। দুঃখীর ইমান্, পরিচয়, প্রভৃতি নাটক বাংলা মঞ্চে অবশ্যই নতুন, কিন্তু চলেনি। স্যাটায়ারে নতুন আইডিয়া প্রমথনাথ বিশীর 'সানিভিলা'তে ছিল, নাটক হিসাবে সেখানা উচ্চাঙ্গের ছিল, কিন্তু

সাধারণ দর্শক তা নেয়নি। 'বিন্দুর ছেলে', 'চরিত্রহীন'-এও নতুনত্বের স্বাদ ছিল—অচল হয়নি। এটুকু নতুনত্বের জন্য সবাই প্রস্তুত ছিল ব'লেই হয় তো। ১৭৮

আবার 'চন্দ্রশেখর' প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও অচল, কিন্তু 'প্রফুল্ল' নাটক হিসাবে নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এখনও বেশ জোরের সঙ্গে চলে। অর্থাৎ আইডিয়া খুব নতুন হ'লে চলে না, মাঝারি হ'লে মাঝারি চলে, বিষয়বস্তু পৌরাণিক হ'লে নিশ্চিন্তে চলে, এবং মোটের উপর নিকৃষ্ট হলে বেশি চলে, আজও। ১৭৯

অর্থাৎ দর্শক তৈরি হয়নি আজও। দর্শক তৈরি করতে হ'লে (রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন দর্শক তৈরি করা দরকার) মঞ্চের দিক দিয়ে যে চেষ্টা দরকার তাতে ক্ষতি অনিবার্য হতে পারে, সেই অনিশ্চিত পরীক্ষার মধ্যে ব্যবসায়ী মঞ্চ স্বভাবতই যাবে না। মাঝে-মাঝে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারে মাত্র। এইখানেই জাতীয় থিয়েটারের প্রশ্ন। থিয়েটারকে ইংল্যাণ্ডের আদর্শে জাতীয় সংস্কৃতি প্রচারের অঙ্গরূপে রাখতে গেলে জাতীয় থিয়েটার চাই-ই। ব্যবসায়ী থিয়েটারও থাকবে, জাতীয় থিয়েটারও থাকবে। ১৮০

থিয়েটার আদর্শচ্যুত হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে তার আরও জৌলুস বেড়েছে, দর্শকের ভিড়ও অপ্রত্যাশিত আছে বিশেষ বিশেষ নাটকে। কিন্তু মোটের উপর—অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে দেশে শিক্ষার আদর্শই অনেকখানি নিচে নেমে গেছে। সব বিষয়েই যেন লোকের নিষ্ঠা কমে গেছে। অর্থাৎ শুধু থিয়েটার নয়, দেশেরই একটা সর্বাঙ্গীন পতন ঘটেছে। তাই থিয়েটারকে সম্পূর্ণ একঘরে ক'রে রেখে দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি অন্তত সম্ভব হবে না আর। সরকারী টাকাতেই, অথচ যতদূর সম্ভব সরকারী প্রভাব বর্জিত, জাতীয় থিয়েটার গঠন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তা যখন হবে তখন নতুন আইডিয়াও নির্ভয়ে এসে পড়বে মঞ্চের পাদপীঠে। ১৮১

আরও একটি কথা : স্টেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে সফল নাটক লেখা সম্ভব হয় না। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণত বিদেশে বা এদেশে যাঁরা স্টেজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তাঁরাই বেশি সফল হয়েছেন, অথবা বাইরের থেকে পাওয়া নাটক স্টেজের লোকেই সম্পূর্ণ পরিবর্তন ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু

বর্তমানের ব্যবসায়ী স্টেজ বাইরের লেখকের শিক্ষালয় স্বভাবতই হ'তে পারে না, সেজন্য ক্ষমতাবান লেখকদের স্টেজ টেকনীক শিক্ষালয় থাকা একান্ত দরকার। একমাত্র জাতীয় নাট্যশালা হলেই তা হওয়া সম্ভব। ১৮২, ২০-১২-৫৩

ভেজালের জাল

দেশে ভেজাল নিবারণের কথা উঠেছে। ভেজাল যত দূর হয় ততই ভাল—এই কথাটি অন্তত নির্ভেজাল খাঁটি কথা। কিন্তু অসুখ যদি জাতির প্রাণশক্তি হরণ করতে থাকে তা হ'লে খাঁটি ওষুধেও যে কতখানি প্রতিকার হবে জোর ক'রে বলা যায় না। আসল কথা হচ্ছে খাবারে ভেজাল আগে বন্ধ করা দরকার। দুধ, ঘি, মাখন, ময়দা ও তেল যদি খাঁটি থাকে, চালে যদি জঞ্জাল না থাকে, বাজারে পচা মাছ বিক্রি না হয়, খাবারের দোকানে যদি নোংরা খাবার বিক্রি না হয়, তা হ'লে ওষুধের সমস্যা আসবে পরে। ভেজাল তেলে ড্রপসি বানিয়ে নিয়ে খাঁটি ওষুধ খাওয়ালে সমস্যা মেটে না। চালের সঙ্গে পাথরের গুঁড়ো খেয়ে পাকস্থলি পরিষ্কারের জন্য না হয় খাঁটি ক্যাস্টর অয়েল পাওয়া গেল, কিন্তু পরদিনই যে আবার পাথর খেতে হবে। ১৮৩

সমস্তই যে ভেজাল, সম্প্রতি তার প্রমাণ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন তাড়িখোর। যারা তাড়ি খেয়েছিল তাদের দুজন মারা গিয়েছে, বাকী ষোলজনের প্রাণ যায় যায়। এতদিন গিয়েছে বোধ হয়। ভেজালের রাজত্বে নিশ্চিন্ত মনে নেশা করবারও উপায় নেই দেখা যাচ্ছে। ১৮৪

এ বিষয়ে জনসাধারণ সম্পূর্ণ অসহায়। এমনি অবস্থায় পুলিসেরা অভিনয় ক'রে ভেজাল ওষুধের পরিণাম সবাইকে বুঝিয়ে দেবার উদ্যোগ করেছেন। পরিণাম তো জানি সবাই। যা হবার তা হবেই। শুধু মিক্সচারের নামে নিষ্ক্রিয় জল বা পাউডারের নামে ময়দা খেয়েও অসুখ সারবে ব'লে মনে এতদিন যে অন্ধ বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসে অনেক ক্ষেত্রে সেরে ওঠবারও আশা ছিল, ভেজাল ওষুধের স্বরূপ জানলে মন থেকে সেই বিশ্বাসটুকুও দূর হয়ে যাবে এবং সজ্ঞানে ওষুধের নামে জল খেয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছি এই হতাশা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে। ১৮৫

* শ্মশানে আত্মহত্যা

বর্তমানে ট্রেনের তলায় প'ড়ে আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে মনে হয়। সাধারণত যে-সব বিষ খেয়ে আগে আত্মহত্যা করা সহজ ছিল, এখন সে সব বিষ ভেজাল হতেও

পারে এই সন্দেহে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কমে আসছে। ওষুধের দোকানের বিষ সম্পর্কেই এই সন্দেহ ; একমাত্র রসায়ন শিক্ষায় যে সব বিষাক্ত রাসায়নিক দরকার হয়, তা ওষুধ নয় বলেই হয় তো এখনো তা খাঁটি আছে। কিন্তু তা সংগ্রহ করা দুরূহ। সংগ্রহ করতে পারলে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তা খাওয়াও যায়। এই কারণেই সেদিন পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবক তার সংগৃহীত পটাসিয়াম সাইয়ানাইড সম্পর্কে এমন নিশ্চিন্ত ছিল যে, সে সোজা নিমতলা শ্মশানঘাটে গিয়ে বিষ খেয়েছে। সে জানত তাকে আর হাসপাতালে নেবার দরকার হবে না, আত্মীয়-স্বজনের অকারণ ছুটো-ছুটিরও প্রয়োজন হবে না, সোজা চিতায় তুললেই হবে। ১৮৬, ২৮-১২-৫৩

১৯৫৪

ইংরেজী বছর শেষ হ'ল, নতুন বছর আরম্ভ হ'ল। যেন ৩৮৫ পৃষ্ঠার একখানা নতুন গ্রন্থ আমাদের হাতে এলো। খুব অভ্যর্থনা করা হ'ল একে। এ গ্রন্থে কি আছে কিছুই জানি না। আজ রবিবার পর্যন্ত এর মাত্র তিন পৃষ্ঠা উল্টে দেখেছি। মনে হচ্ছে খুব উত্তেজক একখানা নাটক হবে। অনেক হীরো থাকবে এতে এবং অনেক হিরোইক্‌স্। রাজনীতিকদের গলা এ বছরে আরও বেশি চড়বে, অস্ত্রের ঝনঝনানিতে কান ঝালাপালা হবে। গান অনেক থাকবে কিন্তু সবই বেসুরো। ১৯৫৩ সনে স্টেজে প্রবেশের পথ ছিল কোরিয়া, ১৯৫৪ সনে প্রবেশ পথ হবে করাচী। একই উইং থেকে বছরের পর বছর অভিনেতারা প্রবেশ করেন না। ১৮৭

ছাত্ররা ১৯৫৩ সনকে যেভাবে মেরেছে তাতে ১৯৫৩ যথেষ্ট লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। লক্ষ্ণৌতে ১৯৫৩-র বিরুদ্ধে তারা রীতিমতো লড়াই করেছে। অন্যত্র পরীক্ষার ফল দেরিতে আসাতে তারা স্টেশন প্ল্যাটফর্মে লুটপাট করেছে, কলকাতার ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুটে ছাত্র হত্যা করেছে, টেস্টে অনুত্তীর্ণ ছাত্ররা স্কুলে বোমা নিক্ষেপ করেছে, রিশড়াতে স্কুলের সম্পত্তি ও দলিলপত্র নষ্ট করেছে। এ সমস্তই ১৯৫৩'র বিরুদ্ধে ক্ষোভবশতঃ। ১৯৫৪ সন এ থেকে অবশ্যই শিক্ষালাভ করবে। তাই এ বছরের ছাত্ররা অনেক শান্ত থাকবে, ছাত্রে-ছাত্রে অথবা ছাত্রে-শিক্ষকে বিরোধিতা কমে যাবে। ১৮৮

বাঘমারা

মুর্শিদাবাদের এক খবর থেকে জানা যায়, এক চিতাবাঘ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ইতস্ততঃ মানুষ আক্রমণ করতে থাকে, তখন এক যুবক বন্দুক হাতে বেরিয়ে এসে

বাঘকে চ্যালেঞ্জ করে। বাঘ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং আক্রান্ত মানুষদের ছেড়ে ঐ যুবকের উপর আক্রমণ চালায়, যুবক এক হাতে বাঘকে রোখে এবং অন্য হাতে গুলি চালিয়ে তাকে মেরে ফেলে। ১৮৯

এই দৃশ্যটি কল্পনা করা অশিকারীর পক্ষে কঠিন মনে হ'তে পারে, কিন্তু ঘটনা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। একটি নাটকীয় দৃশ্য কল্পনা করুন। স্টেজে যুদ্ধদৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। যোদ্ধার এক হাতে ঢাল থাকে অন্য হাতে তরোয়াল। (দৈবাৎ যদি এ দৃশ্যও কেউ দেখে না থাকেন তা হলে কিছুদিন আগে ঢাল তরোয়াল হাতে জয়পুরের সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ফোটোগ্রাফ স্মরণ করুন)। বাঘের সঙ্গে যুদ্ধে যুবকটি তার বাঁ হাতখানা ঢালরূপে ব্যবহার করেছিল। সেই হাতে বাঘের টুঁটি চেপে ধ'রে অন্য হাতে বন্দুক চালিয়েছিল। বন্দুকের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করলে কাজটি কঠিন মনে হ'তে পারে। ওটি অবশ্য সংবাদদাতারই ভুল। ওটি বন্দুক নয়, পিস্তল। সংবাদদাতা ভয়ে পিস্তলে বন্দুক ভ্রম ক'রে বসেছেন। বীরের কৃতিত্ব এতে ক্ষুণ্ণ হবে না, এক হাতে গলা অন্য হাতে গুলি, এমনি যুবক দরকার হবে। ১৯৫৪ সনে। ১৯০

✱ কূটনৈতিক সিরাম ~

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির কথা যখন প্রথম ওঠে, তখন শোনা গেল কথাটা একেবারে মিথ্যা। দ্বিতীয় কিস্তিতে শুনলাম, কথা উঠেছিল বটে, কিন্তু আসলে কিছুই না। তৃতীয় কিস্তিতে ডোজ আর একটু বেশি। অর্থাৎ মার্কিনদের কাছ থেকে সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র কেনা হচ্ছে। তারপর এটাও যখন সহ্য হয়ে গেল, তখন তৃতীয় মাত্রা। এবারে শুনলাম, আমরা যদি এমন কিছু করিই, তাতে তোমাদের কি ? তার পরের কিস্তি—আমরা স্বাধীন, আমরা যা ইচ্ছা তাই করব। তারপরের কিস্তি—আমরা চুক্তি করেছি বটে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ভারত আক্রমণ নয়, আত্মরক্ষা মাত্র। তারপরের কিস্তি—তোমরা কি বোকা, আমরা শক্তিশালী হ'লে তো তোমাদেরই লাভ। শত্রুকে আমরাই তো প্রথম ঠেকাব। ১৯১

এই টক্সিন বা বীজাণু-বিষ আমাদের রক্তে ধাপে ধাপে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় ইনজেক্ট করা হয়েছে, কয়েকদিন হ'ল মাত্র শেষ মাত্রা পড়েছে। এখন আর আমাদের কিছুই হবে না, প্রথম থেকেই যে সামান্য প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এখন আর তা নেই। এখন যদি চতুর্গুণ মাত্রায় ঐ বিষ আমাদের রক্তে মেশানো হয় তা হলেও আর

মৃত্যুভয় নেই, আমাদের দেহে অ্যান্টিটক্সিন যথেষ্ট মাত্রায় তৈরি হয়ে গেছে। লাভ হয়েছে এই যে এখনও এশিয়ার অন্যান্য যেসব দেশে এই বিষ প্রবেশ করেনি, সেই সব দেশে আমাদের সিরাম ইন্‌জেকশন দেওয়া দরকার। ১৯২, ৩-১-৫৪

পিলটডাউনের ধাপ্পা

ইংল্যাণ্ডের পিল্টডাউন মানব গত অর্ধ শতাব্দী ধ'রে যে ভূমিকা অভিনয় করেছে, আজ তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়াতে তার মুখোশ খুলে পড়েছে। নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এতদিন ধাপ্পাবাজের পাল্লায় পড়েছিলেন এবং বিভ্রান্ত হয়ে এমন একটা জিনিসকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা মেনে নেওয়া সহজ ছিল না নানা কারণে। যাই হোক, পিল্টডাউন মানব শূন্যে মিলিয়ে গেলেও তাদের সগোত্র দুটি মানব—তুষার মানব ও মালয় মানব সে ক্ষতি পূরণ করবে আশা করা যায়। ১৯৩

পিল্টডাউন মানব কি বস্তু তার ইতিহাস একটুখানি জানা দরকার। পৃথিবী সৃষ্টির পর বিবর্তনের পথে কিভাবে প্রাণীকুলের উদ্ভব হয়েছে, তার অনেকখানিই বিজ্ঞানীরা আভাসে ইঙ্গিতে কল্পনায় এবং অনেকক্ষেত্রে নিশ্চিত প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে জানতে পেরেছেন। কিন্তু এই বিবর্তনের ধারা পথে আজকের মানুষ ঠিক কোন্ বংশ থেকে বেরিয়ে এসেছে তার ঠিক নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে না ধারাবাহিক প্রমাণের অভাবে। নৃতাত্ত্বিকদের এই প্রমাণ ভূতাত্ত্বিক যুগসমূহের শিলীভূত মাথার খুলি, মুখের হাড় বা কঙ্কাল। ১৯৪

এটুকু বোঝা গেছে যে, উন্নত স্তন্যপায়ী জীব থেকে দ্বিপদ লাঙুলহীন প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। এইখান থেকেই গিবন (উল্লুক), গোরিলা, চিম্পাঞ্জী, ওরাং এবং মানুষ এসেছে এবং গোড়ার এই মানুষও নিশ্চয় উল্লুকের মতোই ছিল। অর্থাৎ আমরা ঠিক 'উল্লুকের বাচ্চা' নই, উল্লুকের নিকট জ্ঞাতি, কারণ গিবন, গোরিলা ইত্যাদি পৃথক হবার আগে তাদের এবং মানুষের পূর্বপুরুষ একই ছিল। একই পূর্বপুরুষের রক্ত আমাদের ধমনীতে। ১৯৫

বিজ্ঞানীরা এই বিবর্তনে বিশ্বাসী। তাঁদের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলি আবিষ্কার বিবর্তনের এই পিছন পথের চিহ্ন নির্দেশ করে—কিন্তু লক্ষ লক্ষ মাইল পথে মাত্র চারটি বা পাঁচটি মাইল পোস্ট এবং সেও সোজা পথে নয়। বহু শূন্য পূরণ বাকী আছে। নিয়ানডারথাল (প্রাশিয়া) মানব, পিল্টডাউন (ইংল্যাণ্ড,

সাসেক্স) মানব, পিকিন (চীন) মানব, যাভা মানব, রোডেসিয়ান (আফ্রিকা) মানব, হাইডেলবার্গ (জার্মানি) মানব প্রভৃতির ইতস্ততঃ কয়েকটি খুলি আবিষ্কার হয়েছে মাত্র। এদের মধ্যে পিকিন মানবই আর সবার বড়দা। এর বয়স সবচেয়ে বেশি। ১৯৬

এরা প্রাগৈতিহাসিক মানুষ, কিন্তু কেউ আজকের মানুষের ঠিক পূর্বপুরুষ নয়, বলা যায় এরা আমাদের খুড়ো বংশের। কারণ বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এরা সবাই 'নির্ব্বংশে'—এঁদের উত্তরপুরুষ আর কেউ নেই। যাই হোক, আদিতম পুরুষ যে উল্লুক থেকে মানুষ হবার পথে অর্ধেক মানুষ অর্ধেক উল্লুক ছিল এবং ক্রমে বদলে বদলে মানুষ হয়েছে এই সাক্ষী আংশিকভাবে উপস্থিত করেছিল পিল্টডাউন মানব। তার মাথার খুলি ('ব্রেন-বক্স') মানুষের, কিন্তু চোয়াল উল্লুকের। বিজ্ঞানীরা অনেক বিতর্কের পর প্রায় মেনেই নেন যে তা হতেও পারে, প্রকৃতির খেয়াল। এতদিন পরে বোঝা গেছে এই খুলির আবিষ্কার কর্তা ডসনই সম্ভবতঃ জোচ্চুরি করেছেন। তিনি একটি প্রাচীন খুলি (যার চোয়াল হয়তো ছিল না), তার সঙ্গে আধুনিককালের উল্লুক জাতীয় প্রাণীর চোয়াল এমনভাবে মিলিয়ে দিলেন যে, কেউ তা ধরতে পারল না। যে-কোনো প্রাচীন বা আধুনিক যুগের কঙ্কালের বয়স নির্ণয়ে যাঁরা ওস্তাদ তাঁরাই ঠকে গেলেন। ১৯৭

ডসনের এই ধাপ্পার কোনো দরকার ছিল না, কেননা মাথার খুলিটি সত্যই প্রাচীন —লক্ষ বছরের তো বটেই, তার বেশি হওয়াই সম্ভব। যাই হোক, মানুষের আদি পুরুষদের যে কটা খুলি পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে পিল্টডাউন খুলির স্থান শূন্য হয়ে গেল। বাঁচা গেল! ১৯৮

মালয়-মানবীর হাস্য

আমাদের তুষার মানব ও মালয় মানব বেঁচে থাকে। বছর কুড়ি আগে শিলিগুড়িতে তুষার মানব তার পায়ের চিহ্ন রেখে গিয়েছিল, তখন সেই অতিকায় পদচিহ্ন নিয়ে খবরের কাগজে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এতকাল পরে তুষার মানব সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শোনা গেল। ওদিকে মালয় মানব বংশের এক মহিলার তো স্পর্শই পেয়েছে একটি লোক। ১৯৯

এই মালয় মানবী এক রবার সংগ্রহকারীর গলা জড়িয়ে ধরেছিল। খবরটা ভাল। কিন্তু ঠিকানা রেখে যায়নি সে, তাই তার গলা জড়িয়ে ধরার উদ্দেশ্য কি ছিল

জানবার উপাই নেই। বিস্তু মালয় মানবী, তুমি হাসলে কেন? একটি লোক তোমার স্পর্শে ভয় পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল, এতে হাসবার কি আছে। যে পোশাকেই থাক, নারী তো বটে, তাকে দেখে পুরুষের ভয় পাওয়া তো স্বাভাবিক ঘটনা। এবং তা দেখে নারীর হাসাও হয় তো উচিত। ২০০

তোমার এই হাসি সেই লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার হাসি মনে করিয়ে দেয়। তোমাদের সঙ্গে যখন আমরা একত্র বাস করেছি, তখন আমাদের মেয়েরাও এমনি উদ্দাম হাসি হেসেছে পুরুষের কাপুরুষতায়। আজও হাসে, কিন্তু সে হাসি আর সশব্দ নয়। আজকের যুগের মানবীরা উদ্দাম হাসি হাসতে ভুলে গেছে, তারাই বরঞ্চ ভীরু হয়ে পড়েছে এ যুগে। তাই তুমি বুঝবে না তোমার হাসি এ যুগে কত বড ব্যঙ্গ। ২০১

এবং কত বড় ব্যঙ্গ এই যুগের প্রতিও। বহু লক্ষ বছরের প্রাচীন আরণ্যক সভ্যতায় লালিত রমণী, আজকের অতিকৃত্রিম এই বিংশ শতাব্দীর গলা জড়িয়ে ধরলে এ যুগের প্রতি কত বড ব্যঙ্গ হয়, তা তুমি বুঝবে না। কিম্বা তুমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। আবার আমরা এ সভ্যতা ভেঙে অরণ্যে ফিরে যাব, তুমি সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিলে। ২০২, ১০-১-৫৪

উড়ন্ত ধাপ্পা

ফ্লায়িং সসার বা উডন্ত চাকতি এতদিন আসছিল মঙ্গলগ্রহ থেকে পৃথিবীর খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এইটুকুই আমাদের জানা ছিল। কিন্তু উডন্ত চাকতি যে শুক্রগ্রহ থেকেও এসে মাটিতে নেমেছে এবং চাকতি-আরোহী শৌক্রীয় মানুষের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার এক ভদ্রলোকের আলাপ পরিচয় হয়েছে, তার নক্সা আঁকা হয়েছে, উড়ন্ত চাকতির ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছে, এ খবর জানা যাবে সম্প্রতি-প্রকাশিত একখানি বই থেকে। সেই বই সম্পর্কে সচিত্র আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে গত ১০-১-৫৪ তারিখের স্টেটসম্যানে। ২০৩

স্টেটসম্যানে মুদ্রিত ভীনাস্ বা শুক্রগ্রহের পুরুষটির যা চেহারা দেখা যাচ্ছে তাতে এদেশের কন্যা-জনকেরা যে জামাই খুঁজতে অতঃপর শুক্রগ্রহেই যাবেন তাতে সন্দেহ নেই। পুরুষেরাই যেখানে এমন সুপুরুষ সেখানে মেয়েরা অবশ্যই ভীনাস, একবারে উর্বসী অথবা রূপকথার রাজকন্যা। গ্রহটি কেন সর্বদা মেঘে ঢাকা থাকে তা এইবার

অনুমান করা যাবে। বিজ্ঞানীরা বলেন, যে দেশে সূর্যের মুখ দেখা যায় না সেখানে মানুষ সুশ্রী হয়, শ্বেতাঙ্গ হয়। ভীনাসদের এটাই তো কাম্য। ২০৪

এখন আমাদের কর্তব্য কি? উপগ্রহ চাঁদের পথে যোগাযোগ স্থাপনের তো অনেক দেরি, অতএব একমাত্র পথ শুক্র গ্রহের ফ্লায়িং সসার। কিন্তু এই চাকতি শুধু ক্যালিফোর্নিয়ায় নামে কেন? ওটা ধনীর দেশ বলেই কি? হয় তো অতঃপর পাকিস্থানেও নামবে, সামরিক চুক্তি পাকা হওয়ার পর। আমরা চুক্তি চাই না। আমরা বরং মার্শাল এড নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি। গ্রহশান্তি প্রতিষ্ঠার এইটি একমাত্র উপায়। ২০৫

অনেকে মনে করেন সাম্প্রতিক যুগটাই বুঝি একমাত্র ধাপ্পার যুগ। এ ধারণা ভুল। ধাপ্পা অনেক দিনের পুরনো নীতি। বড় বড় সব ধাপ্পার কাহিনী পড়া যায় যা আজকের দিনের উড়ন্ত চাকতির মতোই চমকপ্রদ। অনুমান পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মঙ্গলগ্রহ থেকে মানুষ এসেছিল এই পৃথিবীতে, তা নিয়ে খবরের কাগজে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। তবে সে খুব সুশ্রী ছিল না, নাক দিয়ে খেত। তারও আগে চাঁদের মানুষ সম্পর্কে একটি ধাপ্পা খুব চমকপ্রদ। ২০৬

১৮৩৫ সনের ঘটনা। এটি Moon Hoax বা চন্দ্রধাপ্পা নামে খ্যাত। সেই সময় ডক্টর ডিক নামক এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে কতগুলো আলোচনা প্রকাশ করেন। তিনি এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, গ্রহান্তরে প্রাণী আছে। তখন এ নিয়ে খুব একটা উৎসাহের সঞ্চার হয় জনসাধারণের মধ্যে। সবারই চোখ আকাশের দিকে, সবারই মনে প্রশ্ন, কি জাতীয় সব প্রাণী আছে এই সব গ্রহ-নক্ষত্রে। লোকের উৎসাহ যখন চরমে উঠেছে সেই সময় 'নিউইয়র্ক সান' নামক খবরেব কাগজে এক বিস্ময়কর খবর প্রকাশিত হল: "চাঁদে চমকপ্রদ আবিষ্কার।" লেখা হল (অবশ্য সবটাই ধাপ্পা) যে ইংল্যাণ্ডে এক বহু দামী যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে, সেই যন্ত্র নিয়ে স্বয়ং সার জন হার্শেল উত্তমাশা অন্তরীপে গেছেন কিছুদিন আগে, সমস্ত খরচ বহন করেছেন বৃটিশ সরকার। ২০৭

সে কি বিরাট যন্ত্র! স্কটলাণ্ডে ঢালাই করা এই দূরবীণ যন্ত্রের লেন্স কি বিরাট! তার ব্যাস ২৪ ফুট! ওজন ২০০ মোন! বাড়িয়ে দেখার ক্ষমতা ৪২০০০ গুণ!

এই যন্ত্র উত্তমাশা-অন্তরীপের পাহাড়ের মাথায় তোলাও এক বিরাট ঘটনা! দুই দল ষাঁড়—এক এক দলে আঠারোটি—আর অগণিত কাফ্রি লেগেছে যন্ত্র টানতে। ৩৫ মাইল টানতে হয়েছে মোট! ২০৮

তারপর যন্ত্র স্থাপন ক'রে সে যে কি অদ্ভুত কাণ্ড সব দেখা গেল! যন্ত্রে চোখ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল চাঁদ মানুষে আর ইতর প্রাণীতে একেবারে ঠাসা। অদ্ভুত সব নর-নারী! পুরুষের গা রোঁয়ায় ভরা, মেয়েদের গায়ে দুখানা ক'রে ডানা! আর সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যই বা কি অপরূপ! ২০৯

এ খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। খবরের কাগজের অফিসে হাজার হাজার লোকের ভিড়। আরও কাগজ চাই, আরও কাগজ। মুদ্রণ যন্ত্র চলছে অবিরাম—লোকে কাগজ কিনছে উন্মাদের মতো। এতেও সুবিধা হল না, শেষে খবরটা পুস্তিকাকারে বা'র করতে হ'ল, ৬০,০০০ খানা বিক্রি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তখন স্টীমারও ছিল না, টেলিগ্রাফও ছিল না, কাজেই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কোথাও আর কোনো প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে পারল না। অবশেষে সার জন হার্শেল স্বয়ং একদিন এর প্রতিবাদ প্রকাশ করলেন কিন্তু ততদিনে ইউরোপ আমেরিকায় জনসাধারণের মনে চাঁদের মানুষ সত্য হয়ে উঠেছে এবং 'নিউইয়র্ক সান'ও বিশগুণ গ্রাহক বাড়িয়ে নিয়েছে। ২১০

হনুমানের ল্যাজ [১]

ইতিমধ্যে হনুমান সম্পর্কে অপমানজনক এক খবর জানা গেল। খবরটি অন্ততঃ হনুমানের ল্যাজ সম্পর্কে খুবই আপত্তিকর। কেন্দ্রীয় সরকার হনুমান ধ্বংসে উৎসাহ জাগাবার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন, পৌরপ্রতিষ্ঠানে বা থানায় হনুমানের ল্যাজ জমা দিলে ল্যাজপ্রতি তিন টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। যে ল্যাজ সোনার লঙ্কা পুড়িয়েছিল সেই ল্যাজের বংশধরের দাম আজ মাত্র তিন টাকা! এই ল্যাজলজ্জায় অন্ততঃ হনুমানদের আত্মহত্যা করা উচিত। ২১১

এর অন্য একটা দিকও আছে। সে হচ্ছে—হনুমানহত্যা-বিরোধীরা হনুমানের শুধু ল্যাজটি কেটে নিয়ে বিক্রি করতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। তা ভিন্ন এই ল্যাজের ব্যবসাতেও ভেজাল চলতে পারে। হনুমানেরা এই জাতীয় প্রতারককে এড়িয়ে চলুন। ২১২, ১৭-১-৫৪

আর এক নতুন ধাপ্পা

জর্জ ডুপ্রের ধাপ্পাকাহিনী বলা বাকী আছে। আধুনিক যুগের চতুরতম লোকেদেরও ইনি যেভাবে ঠকিয়েছেন তাতে এঁর প্রতিভা সম্পর্কে কারও আর সন্দেহের অবকাশ নেই। গত যুদ্ধে ইনি যে সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা এমনই চমকপ্রদ এবং মনোহর যে, তাঁর কাহিনী একজন প্রসিদ্ধ লেখককে মুগ্ধ করে, তিনি তা নিয়ে ডুপ্রের নামে একখানা বই লেখেন এবং বই প্রকাশিত হয়। প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে জানা গেছে যে, জর্জ ডুপ্রে আদৌ যুদ্ধে যাননি, সবটাই তাঁর কল্পনা। ২১৩

কিন্তু কল্পনায় তিনি যে অ্যাডভেঞ্চার করেছেন তা সত্যই অদ্ভুত। অবশ্য এটা যে ধাপ্পা এ খবর প্রকাশ না হ'লে এ বইয়ের যে দাম হ'ত, প্রকাশ হওয়াতে তা কমেছে, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে এর দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে। যে ব্যক্তি নিজের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী বহু সভা-সমিতিতে বলেছেন, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনেছে, তারপর এক লেখক তাতে আকৃষ্ট হয়ে বই লিখেছেন, এবং প্রকাশক আকৃষ্ট হয়ে তা ছেপেছেন, সে ব্যক্তি ওস্তাদ শিল্পী। ২১৪

নাই বা হ'ল সত্য ঘটনা। ধ'রে নেওয়া যাক তিনি উপন্যাসই লিখিয়েছেন মুখে মুখে। অক্ষম কেউ কি এমন পারে? ঔপন্যাসিকেরা বুঝতে পারবেন সভা-সমিতিতে বার বার একই উপন্যাস রচনা ক'রে বলা কত কঠিন। মনে হয় এ ধাপ্পায় জর্জ ডুপ্রে আইনের দিক ভিন্ন অন্যভাবে কাউকে ঠকাননি। প্রকাশকও ঠকেননি, লেখকও না। কারণ সত্য ঘটনা জানার পর এ বই আরও বেশি বিক্রি হবে এবং হয়তো অতঃপর ডুপ্রেকে সবাই শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীর আসনে বসিয়ে দেবে। ২১৫

দেওয়াও উচিত। উপরন্তু এ ব্যাপারটাকে ধাপ্পা বলাও উচিত কি না তাতে সন্দেহ আছে। ধাপ্পা ও অধাপ্পা কি, তা নিয়ে তর্ক তুললে তর্কটা যদি এক মিনিটে শেষ না হয়, তা হ'লে দেখা যাবে এ সম্পর্কে আমাদের গোটাকত প্রচলিত সংস্কার আছে মাত্র, আসল সত্য অনেক গভীরে, আমাদের নাগালের বাইরে পড়ে আছে। ২১৬

রামায়ণ মহাভারত ঐতিহাসিক সত্য না হ'তে পারে, 'ধাপ্পা' হতে পারে, কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু তা চিরদিন মানুষের মনে সত্য হয়ে আছে। তা ধাপ্পা হলেও সত্য, না হলেও সত্য। এ নিয়ে তর্ক নেই। এমন কি ম্যাজিকও ধাপ্পা নয়। 'কিছু না' থেকে 'কিছু'র প্রকাশই ম্যাজিকের প্রাণ। স্টেজে রামচন্দ্র সেজে

অফিসের কেরানী দর্শককে কাঁদায়, সেখানে সে রামচন্দ্ররূপে অবশ্যই সত্য। সত্য না হ'লে লোকে পয়সা খরচ ক'রে কাঁদতে যায় কেন। কিন্তু যদি ঐ কেরানী অফিসে ব'সেও প্রচার করে যে সে দশরথপুত্র রামচন্দ্র, তা হ'লে সেইটে হবে ধাপ্পা। অর্থাৎ ঐ কেরানী অফিসে রামচন্দ্ররূপে সত্য নয়। জর্জ ডুপ্রেও যুদ্ধের সময়কার এক নায়কের ভূমিকা অভিনয় করেছেন এবং এই অভিনয়ে বহু লোককে আনন্দ দিয়েছেন, অতএব এটি ধাপ্পা নয়। ধাপ্পা হচ্ছে তাঁর যুদ্ধে যোগদানের কথা। অর্থাৎ তিনি যে সোনা দিয়েছেন তা খাঁটি সোনা, শুধু তার খনি সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছেন। ২১৭

ধাপ্পাই যদি হয়, তবু এ ধাপ্পা ভাল। ভাল না কেপমারীর ধাপ্পা। কারণ তাদের বিদ্যা যাদের উপর প্রয়োগ করে তারা তা উপভোগ করতে পারে না। শোনা যাচ্ছে কেপমারী কৌশলীরা সম্প্রতি আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে। অতএব সবাই সাবধান। কিন্তু তোমরা কোথায় গিয়েছিলে এতদিন? কৌশল দেখাতে হ'লে কলকাতার মতো এমন জায়গা আর কোথায় আছে, ভাই? আহা বেচারীরা, কত কষ্টই না পেয়েছ! ২১৮

এদের সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই মনটা খারাপ হয়ে ওঠে। কত কষ্ট করেই না এরা বিদ্যা শেখে দু'পয়সা ক'রে খাবে ব'লে। অথচ পদে পদে বিপদ। অর্থাৎ ফ্রী-লান্স হওয়ার যা বিপদ। অথচ মনস্তত্ত্বে পণ্ডিত এরা সবাই অল্পবিস্তর। তত্ত্ব এবং প্রয়োগ-বিদ্যা দুটিতেই পণ্ডিত। এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজির যে-কোনো বিভাগে এরা নিযুক্ত হতে পারে। চৌর্যশিল্পে ও চৌর্যবিজ্ঞানে মনস্তত্ত্ব বিষয়ে এরা ডিগ্রী পাবার উপযোগী। ২১৯

বিবিধ কীটপতঙ্গ বা পশুপাখী অদ্ভুত এক আত্মরক্ষার উপায় প্রকৃতি থেকে পেয়েছে। ওদের যে ধরনের পরিবেশে থাকতে হয় গায়ের রঙও ঠিক তেমনি হয়। জঙ্গলে যারা বাস করে, জঙ্গলের সঙ্গে এমন মিলিয়ে থাকে, বোঝবার উপায় নেই। অনেকে আবার প্রয়োজন মতো গায়ের রঙ বদলাতে পারে। ২২০

চৌর্যশিল্পীদেরও এটি খুব ভাল জানা আছে। ট্রামে বাসে যখন চলে, তখন ওরা ভদ্রলোকের সাজে থাকে, হঠাৎ কারো ধরবার উপায় নেই যে ওরা চোর। এই যে কল্যাণীতে কংগ্রেস অধিবেশন হচ্ছে, ওরা জানে এখানে কাজ চালাতে হ'লে খদ্দর

পরা দরকার। সম্প্রতি চারিদিক থেকে যে খদ্দর চুরির খবর পাওয়া যাচ্ছে তা এই উপলক্ষেই। শ্রীরামপুরে এক বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীর ঘরে চোর প্রবেশ ক'রে বিশেষভাবে খদ্দরের জামা, প্যাণ্ট, কাপড় ইত্যাদি যা কিছু পেয়েছে সব চুরি ক'রে পালিয়েছে। অন্য কোনো জিনিসের দিকে নজর দেবার সময় পায়নি। তবু আশা করি কল্যাণীর খদ্দরসজ্জিত জনতা শুধু এই জন্যই পরস্পরকে চোর মনে করবেন না। ২২১

নেশাখোরদের স্বপ্ন

আদি গঙ্গার ভাটার জলে স্নান ক'রে সম্প্রতি বহু লোক নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। নেশাখোরদের এটাই তো এতদিনের স্বপ্ন। নদীতে জলের বদলে সুরার স্রোত বইবে, অর্থাৎ সুরধুনী হবে সুরাধুনী। এ স্বপ্ন কি শেষে পুলিসে ভাঙবে কোথায় চোরাই মদ চোলাই হচ্ছে আবিষ্কার ক'রে? ২২২, ২৪-১-৫৪

ডাণ্ডী ও ডাণ্ডা

কংগ্রেসনগরের শৃঙ্খলা এবারের দুর্যোগে একটা নাড়া খেয়েছিল, মন খারাপ ক'রে দিয়েছিল দর্শকদের, সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিল তাঁদের। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, এই বৃষ্টিতে কংগ্রেস মেজরিটির মনও ভিজেছিল, ভেজেনি শুধু বিহারী-ব্রাদারদের। সবাই নিদারুণ ঠাণ্ডায় মনেপ্রাণে বেশ জমে উঠেছিলেন, কিন্তু শীতের সঙ্কোচন নীতিকে অগ্রাহ্য ক'রে জমলেন না শুধু তাঁরা। ২২৩

তাঁরা সর্বভারতীয় ঐক্য আদর্শের আসরে দলবদ্ধ হয়ে এসেছিলেন ঐক্য ভাঙতে। সভাপতিকে তাঁরা ভয় দেখিয়েছেন, রাজ্যপুনর্গঠন চেষ্টামাত্রে তাঁরা প্রলয় ঘটাবেন। বাংলাদেশের কেন্দ্রে ব'সে তাঁরা বাংলা ভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলেন। তাঁরা যখন কংগ্রেসের লোক, তখন গান্ধীজির নামে তাঁরা অবশ্যই শপথ করেন, কিন্তু গান্ধীজি একদা লবণ আইন ভাঙতে করেছিলেন ডাণ্ডী অভিযান, এঁরা রাজ্য-পুনর্গঠন আইন ভাঙতে করেছেন ডাণ্ডা অভিযান। ২২৪

শ্রীনেহরু হার মানলেন না ডাণ্ডার কাছে। পাকা বাঁশের লাঠি ছিল সবার হাতে, তথাপি জয় হল তাঁর। তিনি অভিভাষণে বলেছেন, "ভাববেন না আমরা আত্মরক্ষায় দুর্বল।"—কথাটা হাতে হাতেই প্রমাণ হয়ে গেল। ২২৫

২৩শে জানুয়ারি আট ঘণ্টায় ছয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেদিন মোট আহতের সংখ্যা ৮০, হতের সংখ্যা ১ (রিকশাওয়ালা)। মূর্ছিতের সংখ্যা ১৬, নিখোঁজের সংখ্যা ২০০। মোটরগাড়ি নিখোঁজের সংখ্যা ৭, রিভলভার নিখোঁজের সংখ্যা ১। পকেটমারীর সংখ্যা ১২, কেপমারীর সংখ্যা ১ এবং সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি বিধ্বস্তের সংখ্যা অগণিত। ২২৬

মনে হবে যুদ্ধের খবর পড়ছি। যুদ্ধ তো বটেই। অজানা ভবিষ্যতের সঙ্গে যুদ্ধ। ক্যাজুয়ালটি লিস্ট ক্রমেই বাড়বে, অন্তত বাংলা বিহারে একটা যুদ্ধ হবে বলেই মনে হচ্ছে। আমরা কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে একমত, আমরা যুদ্ধ বাধাব না, আত্মরক্ষা করব সকল শক্তি দিয়ে। ২২৭

কংগ্রেসনগরে আবহাওয়া থেকে শুরু ক'রে অনেকেই নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এসেছিল, কিন্তু প্রথম রাউণ্ডে কংগ্রেস সভাপতির জয় হয়েছে, বিনা অস্ত্রে। বিহারী-ব্রাদার্স এ কথাটা মনে রাখবেন আশা করা যায়। তবে তাঁরা ডাক্তার প্রতাপ গুহরায়ের বাংলা ভাষণ বোঝেন নি, এমন একটা জলজ্যান্ত অনৃত-ভাষণ গান্ধীজির-নামে-পূত আসরে ব'সে না করলেই ভাল করতেন। ২২৮

কিন্তু এর প্রতিবাদ শ্রীনেহরু করতে গেলেন কেন? বক্তা স্থিরভাবে যদি তাঁদের উদ্দেশে বাংলা ভাষায় কিছু গালমন্দ বর্ষণ করতেন তা হ'লে মিনিটখানেকের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যেত বাংলা তাঁরা বোঝেন কি না, অথবা 'বাংলাভাষা বুঝি না' এই অসত্য ভাষণে কংগ্রেসের নাম ডোবাচ্ছেন কি না। নেহেরুজিকে আসন ত্যাগ করতে হ'ত না অকারণ। ২২৯

যাই হোক, সম্ভবত এ ভালই হয়েছে, বাঙালীরা অতঃপর সতর্ক হবে। হিন্দি রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃত, দূর ভবিষ্যতে হিন্দি সর্বত্রই চলবে এটা একরকম ধরেই নিতে হবে, নিজেদের গরজেই সবাই হিন্দি শিখবে, কিন্তু তাই ব'লে মাতৃভাষা ভুলিয়ে দেবার জন্য রাজ্যে রাজ্যে পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে ঘুরতে হবে এরকম অতি-উৎসাহ কাঁচা বুদ্ধির নিদর্শন।—বলতে ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর এদের ক্ষমা করুন, এরা জানেনা এরা কি করছে। ২৩০

কিন্তু ঈশ্বর কি করবেন তা ঈশ্বর জানেন, আমরা শুধু এই জানি যে, আমাদের

রবীন্দ্রনাথ বিহারীদের অত্যন্ত আপনার মনে করতেন এবং বিহার যে বাংলারই অংশ, এমনকি মনপ্রাণ, তা বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই কথাগুলি স্মরণীয়ঃ

"তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবনমরণ বিহারী।"

এই কথাটি মনে রেখে বাঙলীরাও বিরোধ থেকে নিবৃত্ত থাকুন, নইলে শোনা যাবে বিহার অ্যামেরিকার কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। ২৩১,৩১-১-৫৪

কলের কুকুর

জনৈক ব্রিটিশ এঞ্জিনিয়ার এক প্রহরী কুকুর উৎপাদন করেছেন; এই কুকুরকে খাওয়াতে হয় না, ভ্রমণসঙ্গী করতে হয় না, তবু সে তার কর্তব্য করে। অর্থাৎ কলের কুকুর। কুকুরও ঠিক নয়, শুধু কুকুরত্ব বা শব্দ। প্রায় আমসত্ত্বের মতো। মানুষের কাছে এই কুকুরত্ব বা কুকুর-সার হচ্ছে তার ডাক। কুকুর নেই, শুধু তার ডাক আছে। এই ডাক শোনা যাবে তাঁর যন্ত্রে, দরজার ঘণ্টা টিপলেই। চোরেরা ভয় পাবে। মানুষের গন্ধ পেলে কুকুর ডাকে তার প্রভুকে সতর্ক করতে, এই যন্ত্রও তা করবে। ২৩২

বহু কুকুর এতে বেকার হবে, আশঙ্কা হয়। কারণ, বিজ্ঞানীরা যদি এইভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট কুকুর তৈরি করেন, তবে রক্তমাংসের (বা রক্ত মাংস লোভী) মেটিরিয়াল কুকুরের কর্মক্ষেত্র স্বভাবতই কমে আসবে। কুকুরের ভূত আসল কুকুরকে বেকার বানাবে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাণীর সারাংশ নিষ্কাষিত হয়েছে, কুকুরই বাকী ছিল এতদিন। ২৩৩

মানুষ ঘোড়া থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ঘোড়া তৈরি ক'রে তার নাম দিয়েছে অশ্বশক্তি। ঘোড়ার কাজ গেছে ক'মে, বহু অশ্বশক্তির এঞ্জিন এখন ঘোড়ার কাজ করছে। মানুষের বেলাতেও এ পরীক্ষা হয়ে গেছে। গায়ক-মানুষের কণ্ঠস্বর নিষ্কাশিত ক'রে হয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ড; অভিনয়-শিল্পীদের শুধু কণ্ঠস্বর নয়, দেহের ছায়া বা'র ক'রে নিয়ে হয়েছে চলচ্চিত্র। এ ভিন্ন যেসব ভূত অন্ধকার রাত্রে লোকের মনোরঞ্জন ক'রে ফেরে তারাই হচ্ছে মানুষের আসল সংক্ষিপ্তসার। ২৩৪

কিন্তু ভূতের কথা যাক, কারণ ভূত এখনও ব্যাপক ভাবে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হাতে পড়েনি। তা ভিন্ন ভূতের আবির্ভাব দৈব ঘটনা মাত্র, ওতে

মানুষের কোনো বাহাদুরিই নেই। মানুষ নিজ বুদ্ধি কৌশলে রেকর্ড তৈরি করেছে, সিনেমা ছবি তৈরি করেছে। শিল্পী মানুষের সার নিষ্কাশিত ক'রে ব্যবসা চালাচ্ছে। এতদিনে কুকুরের সার বা'র করা সম্ভব হল। ২৩৫

কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট মানুষে কি মানুষ সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়েছে? আদৌ না। মানুষ মানুষকে চায়, তার সংক্ষিপ্তসার চায় না, তেমনি মানুষ কুকুরকেই চাইবে, তাব ডাক পেয়েই খুশি হবে না। সার নিষ্কাশন ক'রে ব্যবসা চলে, কিন্তু সমাজ চলে না। যেমন খাদ্যের বদলে খাদ্যসার খেয়ে মানুষ বাঁচে না। ধানের বদলে ধেনো খেয়ে বাঁচে না। ২৩৬

তাই গায়ক ও সিনেমা-শিল্পীকে দেখার জন্য মানুষ মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে, দাঙ্গা বাধায়, পুলিস ডাকতে হয়। সভায়, আসবে, তাই তাঁদেব ডাক পড়ে। যে সব শিল্পী তাঁদের সারাংশ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশন ক'রে লোকের মনোবঞ্জন করতে অভ্যস্ত, তাঁদের স্থূল দেহটিকেও দেখাতে হয়। অর্থাৎ গৌণভাবে mono-রঞ্জনে অভ্যস্তদের multi-রঞ্জনের কাজে নামতে হয়। ভবিষ্যৎ বেকার কুকুরদের এইটুকুই সান্ত্বনা। ২৩৭

প্রেম ও পা

পূর্ববঙ্গের এক বিড়ি কারখানার পঁচিশ বছর বয়স্ক এক যুবক তার বাঞ্ছিত মেয়েটিকে বিয়েতে রাজী করাতে না পেরে সোজা নির্বাচন সফরে রত পাক-প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীর পায়ের উপর গিয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর পা থেকে বিমুক্ত ক'রে তাকে পুলিসে দেওয়া হয়। সামরিকশক্তি-ভিখারীর পায়ে প্রেমের ভিখারী! দৃশ্যটি অভিনব। প্রধানমন্ত্রী এ কথা হৃদয়ঙ্গম ক'রেই বোধ হয় পুলিসকে তার প্রতি দয়া দেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন। ২৩৮

যুবকের দোষ নেই, দোষ হচ্ছে শাসনতন্ত্রের। শাসনতন্ত্র মাত্রেই হৃদয়হীন যন্ত্র। একটি লোক শূন্যোদরে মারা যেতে বসলে সরকার পক্ষ থেকে সাহায্য করা চলে, কিন্তু যে লোকটি শূন্য হৃদয়ে মরতে বসেছে তার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। পাক-প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন সফরে বেরিয়েও যন্ত্রনিয়মেরই মর্যাদা রাখলেন, হৃদয়ের মর্যাদা রাখলেন না এবং সম্ভবত এ জন্য একটি ভোট হারালেন। নির্বাচনের মুখে ব্যর্থ প্রেমিকেরা অতঃপর, পৃথক দল গঠন ক'রে চাপ দিতে পারলে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'তে পারে, আশা করা যায়। ২৩৯

বস্ত্রত্যাগ

ইটালির এক ভদ্রলোক রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় চলাফেরা করেন, সে সময় তাঁর কোনো জ্ঞান থাকে না। এই ভদ্রলোক একটি সিনেমা ঘরে ছবি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েন, তাঁর মনে হয় তিনি নিজের ঘরে আছেন এবং তাঁর ঘুমনোর সময় হয়েছে, অতএব এবারে বিছানায় শোয়া দরকার। তারপর তিনি একে একে তাঁর সমস্ত পরিধেয় খুলে ফেলেন। তারপর আলো জ্বললে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় দর্শকদের মধ্যে এবং ভদ্রলোকটিকে পুলিসের হাতে দেওয়া হয়। সিনেমার জন্য অনেকে অনেক কিছু ত্যাগ করে, কিন্তু এ রকম সর্বস্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল। ২৪০

পিরামিড-পীড়ন

ঈজিপ্ট সরকারের কাছ থেকে হলিউডের এক ফিল্ম প্রতিষ্ঠান কেওপ্‌স্‌-এর বড় পিরামিডটি ভাড়া নিয়েছেন। পিরামিডটি থেকে একটি লোক গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ছে, এই রকম একটা ছবি তুলতে হবে। হাজার হাজার বছরের বিরাট ঐতিহাসিক বিস্ময় আজ হলিউডের হাতে ভাড়া খাটতে যাচ্ছে এ কথা শুনে মনে ধাক্কা লাগে। সভ্যতার ইতিহাসে পিরামিড-পীড়ন এই প্রথম। ২৪১,৭-২-৫৪

চা ও চামড়া

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রশ্ন ছিল, চা পান না বিষ পান। কথাটায় যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল তার উত্তর ভাবতে ভাবতে জীবন কেটে গেল—এমন সময় সেদিন সকাল বেলার চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে আবার কে যেন অন্তরে জুতোর ঘা মেরে প্রশ্ন করল—চা খাচ্ছ না জুতো খাচ্ছ? ২৪২

খবরটা হচ্ছে এই যে, চামড়া কারখানার বস্তা বস্তা চামড়ার ছাঁট ধরা পড়েছে, এই চামড়ার ছাঁট নাকি চায়ে ভেজাল দেবার উদ্দেশ্যে গুদামজাত করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায়নি। কে এই চামড়া কোন্‌ চায়ের সঙ্গে কিভাবে মেশায় জানতে পারলে সুবিধে হ'ত। কিন্তু তা বোধ হয় আর জানা হবে না, তাই যে চা-ই খাই, সন্দেহটা থেকে যাবে, এবং হয়তো খোলা চা কেনাই বন্ধ করতে হবে এজন্য। ২৪৩

যা জুতো হয়ে পায়ে শোভা পেত তাই রস হয়ে রসনার তৃপ্তি দিচ্ছে, অথচ বুঝতে পারছি না কিছু, এ যে আমাদের কতদিনের শিক্ষার ফল তাই ভাবি। এতদিন

জানতাম জাতি হিসাবে আমরা একতাহীন এবং দুর্বল ছিলাম ব'লে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশীরা আমাদের পিঠে যথেচ্ছ জুতো মেরে গেছে, এবারে সেই জুতোর চামড়ার রস খাচ্ছি স্বাধীন ভারতে, দেশী লোকের হাতে। ২৪৪

জুতো খাওয়ার ব্যাপারটা রীতিমতো রসিকতার স্তরে নেমে এসেছে, এতে আর সন্দেহ কি। ট্যানারির সঙ্গে ট্যানিক অ্যাসিডের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, চায়েও আছে ট্যানিক অ্যাসিড, যা চায়ের বিশেষ রংটি ফুটিয়ে তোলে। অতএব একবার তৈরি চায়ের ফেলে দেওয়া পাতার সঙ্গে ট্যানকরা চামড়ার ফেলে দেওয়া কুচো মেলালেই নতুন চা হয়ে গেল। ২৪৫

এই কাজ যারা করে তারা বৈজ্ঞানিক। সংসারের অবহেলিত সম্পদকে কাজে লাগানোর পথ বিজ্ঞানীরাই দেখায়, যদিও অনিষ্টকর ভেজাল-বিজ্ঞানীর পণ্ডিত সমাজে কোনো প্রতিষ্ঠা নেই। চালে পাথর, সরষেয় শেয়ালকাঁটা, ঘিয়ে চর্বি বা চায়ে চামড়া এবং পাঁঠার মাংসে কুকুরের মাংস মেশানো নিম্ন স্তরের বিজ্ঞান। এই মিশ্রণ রসায়ন শাস্ত্রের ভাষায় মেকানিক্যাল মিক্সশার। উচ্চস্তরের বিজ্ঞান হচ্ছে যৌগিক পদার্থ তৈরি করা। যে-কোনো তেলকে খাঁটি সরষের তেলে রূপান্তবিত করা বা উদ্ভিজ্জ তেলে ঘিয়ের ভ্রান্তি ঘটানো, বা অ্যারোরুটকে পেনিসিলিনে পরিবর্তন করা এই হচ্ছে উচ্চস্তরের বিজ্ঞান। ২৪৬

রং, গন্ধ, স্বাদসহ তেল, বা রং গন্ধ স্বাদসহ কৃত্রিম ঘি, বা সিনথেটিক জিরে তৈরিতে যে গবেষণা দরকার তার উপযুক্ত সব বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এদেশের বহু গোপন কক্ষে সক্রিয়ভাবে বিরাজ করছে। শুধু, চায়ে চামড়া মেশানো ভারতীয় বুদ্ধি না চীনা বুদ্ধি, এখনও জানা যায়নি। চীন দেশেই প্রথম চায়ের ব্যবহার হয়েছিল, চামড়া ট্যান করার রীতিও সম্ভবতঃ ওদেরই উদ্ভাবন, সেজন্য একটু সন্দেহ রয়ে গেল। ২৪৭

অবশ্য কিছু এসে যায় না, এ অতি স্থুল কাজ, এবং এটি উচ্চস্তরের বিজ্ঞানও নয়, কারণ এটি ভেজাল। মেহনত করলে এ থেকে চামড়ার অংশ বেছে নেওয়া অসম্ভব নয়। যেমন চাল থেকে পাথর বাছা যায়। কিন্তু যা খাঁটি তেল বা খাঁটি ঘি নামে চলে তা থেকে কি বাছবেন? এমন একটি খুন যার কোনো সন্ধানসূত্র নেই, সেখানে কর্তব্য কি? গন্ধ আছে, বর্ণ আছে, স্বাদ আছে, তেল নেই, ঘি নেই। একমাত্র সেই বেতার সম্পর্কিত গল্পটির সঙ্গে তুলনীয়। একটি গ্রাম্য লোককে

বেতার কি বস্তু বোঝানো হচ্ছিল—"মনে কর বিরাট লম্বা এক কুকুর, তার মাথা কলকাতায় আর ল্যাজ দিল্লীতে। তুমি কলকাতায় বসে কুকুরের মাথা চাপড়াচ্ছ, আনন্দে তার ল্যাজ নড়ছে দিল্লীতে। এইবার কল্পনা কর, কুকুরের মাথাও আছে, ল্যাজও আছে শুধু কুকুরটি নেই।—এই হ'ল তোমার বেতার।" ২৪৮

উচ্চাঙ্গের মিশ্রণ, সংস্কৃতির বড় পরিচয়। সঙ্গীতের বেলায় যেমন। ওস্তাদের হাতের রাগ-মিশ্রণকে কেউ ভেজাল সঙ্গীত বলে না, এই মিশ্রণ ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতকে উন্নত করেছে, উচ্চ শিল্পে পরিণত করেছে এবং মিশ্রণই ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের প্রাণ। অন্য কথায় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতই এই মিশ্রণের সমর্থক। তাই যে-তেল বা ঘি'কে বিক্রেতা বলে খাঁটি তেল, খাঁটি ঘি, ক্রেতা বলে ভেজাল তেল, ভেজাল ঘি; সেই তেল ও ঘিয়ের নাম হওয়া উচিত যথাক্রমে ক্ল্যাসিক্যাল তেল ও ক্ল্যাসিক্যাল ঘি। শুনতেও ভাল শোনাবে, হয়তো ভোগ ক'রেও আরাম হবে। ২৪৯

*শিক্ষক চাপরাশী

আর একটি খবর মনোহর। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারি বাংলার শিক্ষকদের উদ্দেশে এমন রূঢ় মন্তব্য করেছেন যার বর্ণনাপ্রসঙ্গে যুগান্তরকে 'উবাচ' শব্দটি ব্যবহার করতে হয়েছে। কারণ উক্ত সেক্রেটারির উক্তিগুলি ছিল অমার্জিত, অসঙ্গত এবং অসংস্কৃত, তাই সংস্কৃত হেডলাইন। তিনি বলেছিলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর চাপরাশীরা ৩৫৲ টাকা ডি-এ পায়, শিক্ষকেরাও চাপরাশীর কাজ নিতে পারেন, তাঁদের আবেদন বিবেচনা করা হবে। কিন্তু কথাটা যত নিষ্ঠুরই হোক, বক্তার অজ্ঞাতসারে তা শিক্ষকদেরই দাবী সমর্থন করছে। অপ্রচুর বেতনে অর্ধাহারে ছাত্র পড়ালে ঐ রকম অমার্জিত শিক্ষাই তারা পায়। শোনা গেছে উক্ত সেক্রেটারির ভূতপূর্ব শিক্ষকও দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন। ২৫০

কুম্ভমেলার বিপত্তি

কুম্ভস্নানে যে বিপত্তি ঘটে গেছে তা নিয়ে দ্বিতীয় আর এক বিপত্তি না ঘটে। মৃতের দুই বিপরীত সংখ্যার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য অনায়াসেই হ'তে পারে। এক-দিকের সংখ্যা ৩৫০, অন্যদিকের ৫০০০। এই দুই যোগ ক'রে দুই দিয়ে ভাগ করলে দাঁড়ায় ২৬৭৫। ঘটনাস্থলে পরিত্যক্ত জুতো গুণে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০০০;

জোড়া। যত জুতো তত মৃত্যু নাও হতে পারে। যাই হোক সংখ্যা নিয়ে কলহ ক'রে লাভ কি। মৃতেরা আব কথা বলবে না। ২৫১

এক সাধু এই মেলার এক গাছে উঠে একপায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই সাধু নিশ্চয় সব দেখেছে। তাকে সাক্ষী মানলে সব জানা যেতে পারে, অবশ্য সে যদি অসাধু না হয় এবং পালিয়ে গিয়ে না থাকে। পক্ষকাল গাছেব ডালে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো ধার্মিক বা বকধার্মিকেব পক্ষেই সম্ভব নয়, সে বকম দাঁড়াতে সম্ভবতঃ শুধু বকেরাই পারে। ২৫২

অতএব কলহ বাধবে, কাদের অবহেলায় এই বিপর্যয় ঘটল তাদের নিয়ে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এতবড় ভিড় নিমন্ত্রণের শিক্ষার অভাব, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক, অব্যবহিত ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাব। কুম্ভস্নানে কত লোক হবে তা অনুমান করা আদৌ কঠিন ছিল না। অতএব?—অতএব কি হবে তা শোনবার জন্য কুম্ভ-কর্ণ হয়ে রইলাম। ২৫৩

তবে ইতিমধ্যে যাঁরা সান্ত্বনা চান তাঁরা অর্থনীতি ক্ষেত্রের 'গ্রেশাম'স্ ল' নামক নীতিটিকে কুম্ভমেলায় প্রতিফলিত ক'রে দেখতে পারেন। এই নীতি হচ্ছে Bad money drives good money out of circulation—খারাপ মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজার থেকে সরিয়ে দেয়। অর্থাৎ কুম্ভমেলার ক্ষেত্রে বলা যায় পাপীরা পুণ্যবানদের ইহলোক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ২৫৪

রসিকতার ফলাফল

জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিদা এক রসিক ব্যক্তির সঙ্গে সেদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন বাঁদর দেখতে পশুশালায় যাবে কেন, পার্লামেণ্টে যাও—অনেক দেখতে পাবে। পরে পার্লামেণ্টে এ নিয়ে কথা উঠলে তিনি বলেন পার্লামেণ্টের মেম্বারদের আমি সম্মান করি, তাঁদের অপমান করার কল্পনা আমার মনে আসেনি। অথচ ইতিপূর্বে এক সমাজতান্ত্রিক মেম্বারকে তিনি গাধা বলাতে তাঁর মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। ২৫৫

এ বিষয়ে ইংরেজ বুদ্ধি জাপানী বুদ্ধিকে হার মানিয়েছে। একদা এক ইংরেজ পুলিসকে বাঁদর বলায় তাঁকে বিচারালয়ে যেতে হয়। বিচারক তাঁকে শাস্তি না দিয়ে

সতর্ক ক'রে দিলেন, বললেন, পুলিসম্যানকে ভবিষ্যতে বাঁদর ব'লো না। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাতে রাজী হলেন, তবে একটি বিষয়ে অনুমতি চাইলেন, বললেন, বাঁদরকে পুলিসম্যান বলতে পারি কি না। বিচারক বললেন, পার। অতঃপর উক্ত ভদ্রলোক সেই পুলিসকে "এই যে পুলিসম্যান্ কেমন আছ?" ব'লে আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন। ২৫৬, ২১-২-৫৪

স্বামী পছন্দ

পৃথিবীর কোথাও লোটাস্ স্ট্রীট নামক একটি রাজপথ আছে, হয়তো বা করাচীতে, আমি ঠিক জানি না, কিন্তু সেইখানকার একটি মেয়ে বিয়েব পব স্বামী পছন্দ না হওয়াতে শাড়িতে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়ে মবেছে। ২৫৭

খবরটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই খবর প'ড়ে অনেক মেয়ের মনে হ'তে পারে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে একবার স্বামীব দিকে চেয়ে দেখতে হবে পছন্দ হয় কি না, এবং যদি না হয় তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করতে হবে। যেন সংসারে সবই পছন্দ মতো পাওয়া যায়! যেন ঐ মেয়েটিও সংসারে সবই পছন্দ মতো পেয়েছিল, বাপ, মা, ভাই, বোন, বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি; কেবল ঐ স্বামী ছাড়া। অতএব তাকে মরতে হ'ল। পছন্দ অপছন্দ যার এত উগ্র, তাব তো গোড়াতেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তা না ক'বে বিয়ের পর, পছন্দ হয় বেঁচে থাকব নইলে কেবোসিনে পুড়ে মরব, এই মনোভাব নিয়ে বিয়ে পর্যন্ত এগিযে যাওয়া—ভাগ্যপবীক্ষাব এক নতুন বেকর্ড, অন্ততঃ মেযেদের দিক দিয়ে। ২৫৮

এই খবর প'ড়ে যেসব সদ্য বিবহিত অথবা দীর্ঘকাল বিবাহিত মেয়েরা ইতিমধ্যেই স্বামী পছন্দসই হয়েছে কি না ভাবতে আরম্ভ করেছে, এবং সেই উদ্দেশ্যে কেরোসিন কেনার পযসা জমাচ্ছে, তাদের প্রতি অনুরোধ, পয়সা জমিয়ে আরও শাড়ি কেন, কেরোসিন কিনো না। ২৫৯

আর একটি কথা, এমন কাঁচা মন নিয়ে সিনেমাও দেখো না। সিনেমা দেখেও অনেক সময় জীবন বৃথা মনে হয়। ও জগৎ আলাদা জগৎ। ওখানে যে-কোনো ভিখারিণী ইণ্টারভ্যালের পরবর্তী সময়ের মধ্যেই রাজরাণি হয়, যে-কোনো রাজরাণি ভিখারিণী হয়, অথবা প্রেমাস্পদকে না পেয়ে শুকিয়ে মরে। কিংবা সন্ন্যাসিনী হয়। ঐ কল্পজগৎ তোমাদের জগৎ নয়। তোমাদের মধ্যে যারা আবেগসর্বস্ব

ভাবের জগতের মেয়ে, তাদের পক্ষে সিনেমা দেখা এবং বিয়ে করা দুই-ই খারাপ। কারণ, অমুককে না পেলে যদি জীবন বৃথা মনে হয়, তা হ'লে সেই অমুককে পেলে একটা প্রচণ্ড আঘাত খাবে। তাকে পেলেই মনে হবে কি ঠকাই ঠকেছি। স্বপ্ন ভাঙবে। ২৬০

এটাই নিয়ম। কল্পনায় যাকে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য মনে হয়, বাস্তবে সে তো সাধারণ মানুষ। তখন হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, দড়ি, আফিং, কেরোসিন তারই সাহায্যে রূঢ় বাস্তব থেকে পলায়ন। এক জাতীয় মেয়েকে এই পরিণাম থেকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যারা অপেক্ষাকৃত সুস্থমস্তিষ্ক, অথচ যারা বুঝতে পারছে না কি করা উচিত, তাদের শুধু মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, মানুষ মানুষই, স্বামী-মানুষও মানুষ। এবং সংসারে অন্য সব কিছুর মতোই তাকেও মেনে নিতে হয়। ২৬১

বিয়ে রাষ্ট্র আইনেই হোক বা সামাজিক আইনেই হোক, মেনে নেওয়ার প্রবৃত্তি এবং মানিয়ে নেবার আন্তরিক চেষ্টা থাকা চাই-ই। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি তা সম্ভব না হয়, যদি সম্পর্ক প্রতিনিয়ত স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করতে থাকে, তাহলে তখন হিন্দু বিবাহ বিলের কথা ভেবো, কেরোসিনের কথা ভেবো, তার আগে নয়। কোনো চেষ্টা না ক'রেই শাড়িতে আগুন ধরানো সমর্থন করা যায় না। পার তো বাস্তব জীবনকে ঘিরে স্বপ্ন রচনা কর, স্বপ্নকে বাস্তব মনে ক'রো না। ২৬২

অপর পক্ষে ছেলেদের মধ্যেও অবাস্তব আদর্শ দুর্লভ নয়। একটি ছেলের কথা পড়েছি, সে ফুলশয্যার রাত্রে আবিষ্কার করল তার স্ত্রী, (এ + বি)২ এই ফরমুলাটি জানে না। তার স্বপ্ন ভেঙে গেল। সেই রাত্রেই সে আত্মহত্যা করেছিল। আর একটি ছেলে বিবাহরাত্রে আবিষ্কার করে তার স্ত্রী 'নিনচ্কা' নামক সিনেমা ছবি দেখেনি। পরদিন থেকে আর তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ২৬৩

জীবিত ও মৃত

জীবন্ত অবস্থায় একটি যুবক ডাক্তারের কাছ থেকে মৃত্যু সার্টিফিকেট আদায় করতে চেষ্টা করে, কিন্তু না পেয়ে কেওড়াতলা শ্মশানের একটি জলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য তাকে সেখান থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। কাদম্বিনীর সঙ্গে এই যুবকের পার্থক্য এই যে, কাদম্বিনীকে ম'রে প্রমাণ করতে

হয়েছিল যে সে মরেনি, আর এই যুবকের ইচ্ছা ছিল সে ম'রে প্রমাণ করবে যে সে মরেছে। ২৬৪

কিন্তু মৃত্যু সার্টিফিকেট চাওয়া কি এই যুবকের সত্যই অন্যায় হয়েছিল? না হয় সে নিজের মৃত্যুকে একটু বাড়িয়েই দেখেছিল, না হয় সে অর্ধমৃত অবস্থায় মনে করেছিল তার পুরো মৃত্যুই ঘটেছে। এতে তার অন্যায় হয়নি কিছু। যা দিনকাল পড়েছে তাতে আমাদের মধ্যে কোন্ লোকটি পুরো বেঁচে আছে? ২৬৫

অর্ধমৃত আর পূর্ণমৃতের মধ্যে যেটুকু তফাৎ তা শুধু দৃষ্টিভঙ্গির। আমরা যে সবাই আধমরা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি, সেই আমরা যদি বলতে পারি আমরা বেঁচেই আছি, তবে ঐ যুবকটি আধমরা অবস্থায় কেন বলতে পারবে না যে, সে মরে গেছে? "মরেই তো আছি"—এ কথা বলায় তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ২৬৬

আশাবাদী ও নৈরাশ্যবাদী—এই দুই নিয়েই সংসার। দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র হলেও দু'জনের কথাই সত্য। যে মদ্যপ আশাবাদী, সে আধ বোতল মদ দেখে বলে যথেষ্ট আছে, নৈরাশ্যবাদী মদ্যপ আধ বোতল মদ দেখে বলে, ওরে বাবা, বোতল যে একেবারে খালি! দুই-ই সত্য। এইটি বিবেচনা ক'রে ডাক্তার অন্তত তাকে একখানা অর্ধমৃত্যুর সার্টিফিকেট দিতে পারতেন। তাতে লিখতে পারতেন—The man is at least half-dead. ২৬৭

হাসি ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি হাসির গুণকীর্তনে লেগেছেন। হাসিতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, হাসি টনিকের কাজ করে, হাসিতে দেহের সমস্ত পেশী ও স্নায়ু আরাম অনুভব করে, অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডকে চাঙ্গা করে, রক্ত চলাচলে উৎসাহ দেয়, মনের শান্তি আনে এবং সবচেয়ে দামী কথা—হাসিয়ে দিলে লোকে আর লড়াই করতে পারে না। এ যদি বৈজ্ঞানিক সত্য হয় তা হ'লে যেসব রাষ্ট্রনেতা অবিরাম যুদ্ধং দেহি হাঁকছেন তাঁদের হাসানো দরকার। ইউনেস্কো এই উদ্দেশ্যে গবেষণা চালাতে পারেন, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে। রাষ্ট্রনায়কদের হাসির কথা ব'লে, হাসির ছবি দেখিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত পায়ে ধ'রে হাসানো দরকার। এবং তাতেও রাজী না হ'লে তাঁদের মেরে হাসানো দরকার। যুদ্ধ এলো-এলো, এই রকম একটা থমথমে ভাব আর ভাল লাগছে না। ২৬৮

সুগন্ধ বৃষ্টি

সম্প্রতি মেঘে কৃত্রিম উপায়ে সুগন্ধ পুরে প্যারিস শহরে সুগন্ধবৃষ্টি ঝরানো হয়েছে। এই বৃষ্টিপাতের সময় মেয়েরা আঁজলা ভ'রে বৃষ্ট সংগ্রহ ক'রে কানে এবং গলায় মেখেছে। এ এক অভিনব পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। এই গন্ধবৃষ্টিপাতের পর বর্ণবৃষ্ট কাব্য-বৃষ্ট এবং সঙ্গীতবৃষ্টির কথা যেন শুনে যেতে পাবি পৃথিবী বিধ্বংসী শেষ বোমা-বৃষ্টির আগে। ২৬৯,২৭-২-৫৪

নতুন একাঙ্ক

রঙ্গমঞ্চের বাইরে যে সব একাঙ্ক নাটিকা অভিনীত হয় তার খবর আমরা কাগজে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। কৃত্রিম মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও এইসব নাটকেব রচয়িতারা বেশ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। এক একখানি নাটিকার প্লট এবং প্রযোজনা একেবারে নিখুঁত। এদের শিক্ষা জীবন-রঙ্গমঞ্চে—তাই ঘরে ব'সে লেখা নাটক, আঁকা দৃশ্যপটে অভিনয় হ'লে যে সব ত্রুটি চোখে পড়ে, এতে সে সব ত্রুটি নেই, ত্রুটি যদি কিছু থাকে তবে তা অশিক্ষিত-পটুত্বের জন্য। ২৭০

এই একাঙ্ক নাটিকাগুলিকে দৃশ্যসংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করা যায়। দৃশ্য যত বেশি, নাটকীয়ত্বও তত বেশি। এগুলি সাধারণত এক দৃশ্যেব, দুই দৃশ্যের, অথবা তিন দৃশ্যের নাটিকা। তিন দৃশ্যের নাটিকা পবিকল্পনায় কৌশল সব চেয়ে বেশি। এই নাটিকা সমালোচকের মতে প্রথম শ্রেণীতে পড়বে। দৃশ্যপট কৃত্রিম নয় এবং অভিনয় সর্বদাই আকাশের নিচে হয়, এজন্য ইংরেজীতে এগুলিকে ওপন-এয়ার থিয়েটার বলা চলে। এ নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে, অভিনয় সর্বদাই দর্শক-নিরপেক্ষ। দর্শক না থাকলেই বরং বেশি জমে। টিকিট বেচে খরচ তুলতে হয় না, নাটকেব গঠনরীতি এমন যে, অভিনয় চলতে চলতেই খরচ উঠে আসে। ২৭১

সবগুলি নাটিকাই ঠিক ওপন-এয়ার নয়, কতগুলির পটভূমি ঘরের মধ্যে। এই দুই জাতীয় নাটিকা গত সপ্তাহে তিনটি অভিনীত হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। একটির অভিনয় স্থল শেওড়াফুলি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশনের বাইরের পথ, দ্বিতীয়টির রেওয়া রাজ্য, তৃতীয়টির কৃষ্ণনগর। তিনটি নাটিকারই প্লট-পরিকল্পনায় মূল লক্ষ্য সোনা, অথবা সোনার নামে সোনাতীত কিছু। ২৭২

ইংল্যাণ্ডের নাট্য-ইতিহাসের প্রথম যুগে যে সব নাটক অভিনীত হ'ত, তার নাম ছিল

মিরাকল্ প্লে বা মিস্টেরি প্লে। মিরাকল্-এর চলতি অর্থ অলৌকিকত্ব, মিস্টেরির চলতি অর্থ রহস্য। এই নাটকগুলি বিশেষভাবে খ্রীষ্টীয় পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে রচিত এবং সবগুলিরই মূল প্রেরণা ধর্ম। আমাদের আলোচ্য নাটিকাগুলিরও নাম দেওয়া যেতে পারে মিরাকল্ বা মিস্টেরি প্লে। অর্থাৎ জনসাধারণের কাছে মিরাকল্ এবং পুলিসের কাছে মিস্টেরি। এদেরও মূল প্রেরণা এক—সোনা। তুই-ই আদর্শমূলক নাটিকা, একটির আদর্শ আত্মিক বা নৈতিক ধর্ম, অন্যটির আদর্শ স্বর্ণধর্ম। ২৭৩

প্রথম তিন দৃশ্যের নাটিকাটির পরিচয় এই। প্রথম দৃশ্য : নরেন নামক এক ব্যক্তি তারকেশ্বর থেকে শেওড়াফুলি স্টেশনে এসে বর্ধমানের টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ব'সে আছে। কিছুক্ষণ পরে কিশোর নামক এক অপরিচিত ব্যক্তি তার কাছে এসে বসল। আরও কিছুক্ষণ পরে আরও এক অপরিচিত ব্যক্তি (তৃতীয় ব্যক্তি) সেখানে এলো। এই তৃতীয় ব্যক্তি হঠাৎ আবিষ্কার করল তার সর্বনাশ হয়ে গেছে—তার তুটি বাইশ শ' টাকা দামের সোনার বাট হারিয়ে গেছে। সে চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল। হায় হায় ক'রে কাঁদতে লাগল। এবং কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেল সেখান থেকে। ২৭৪

এর পর নরেন এবং কিশোর দেখল তাদের থেকে কিছু দূরে একটি লোক (চতুর্থ ব্যক্তি) সন্দেহজনকভাবে স্টেশনের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিশোর তাকে দেখিয়ে নরেনকে বলল, ঐ লোকটিকে সে এইখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে, মনে হয় ঐ লোকটিই সোনার বাট তুটি কুড়িয়ে পেয়েছে। অতএব চল ওকে ধরা যাক। নরেন রাজী হল। তুজনে তখন চতুর্থ ব্যক্তিটিকে অনুসরণ করতে লাগল। ২৭৫

পরবর্তী দৃশ্য—স্টেশনের বাইরের পথ। নরেন ও কিশোর দ্রুত পা চালিয়ে চতুর্থ ব্যক্তিটিকে ধ'রে ফেলল এবং বলল তুমি যে সোনার তুটি বাট চুরি করেছ তা আমরা জানি, যদি ফেরত না দাও তাহ'লে তোমাকে আমরা পুলিসে দেব। লোকটি ভয় পেয়ে বলল, কিছু টাকা দাও তাহলে দেব। কিশোর পকেট থেকে দশটি টাকা বা'র করল, তার কাছে আর কিছু ছিল না, অতএব দশ টাকার সঙ্গে হাতের আংটিটিও খুলে দিয়ে একটি বাট নিয়ে নিল এবং বলল, অন্যটিও আমার বন্ধুকে দাও। সে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, না এটা আমি দেব না, এটি আমারই থাক। তখন পঞ্চম ব্যক্তির আবির্ভাব। ২৭৬

পঞ্চম ব্যক্তি এসে বলল, আমি দেখে ফেলেছি সব, যদি আমাকে কিছু না দাও, আমি পুলিসে দেব তোমাদের। কিশোর নরেনের কানে কানে বলল, তোমার কাছে যদি টাকা থাকে তাড়াতাড়ি ওকে দিয়ে বাটটি নিয়ে তুমি পালিয়ে যাও। নরেনের কাছে আশী টাকা ছিল, অতএব সহজেই কাজ উদ্ধার হল। সে উল্লসিত-ভাবে স্টেশনের ফিরে গিয়ে আবিষ্কার করল—কিন্তু কি আবিষ্কার করল তা আর নতুন করে বলে লাভ কি। ২৭৭

তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় নরেন পুলিসের কাছে গেছে এবং পুলিস কিছুক্ষণ চেষ্টার পর কিশোরকে গ্রেফ্‌তার করেছে। নাটিকাটি হল এই, কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, নাট্য-পরিকল্পনায় পুলিসের চরিত্রটি কিছু দুর্বল হয়েছে। কারণ, লোভী নরেনকেও ঐ সঙ্গে তার গ্রেফ্‌তার করা উচিত ছিল। ২৭৮

দ্বিতীয় নাটিকার স্থান রেওয়া। এক স্বর্ণকারের দোকানে এক বিলাসিনী ঝুড়িতে এক ঘুমন্ত শিশুকে নিয়ে উপস্থিত। এক জোড়া বালা পছন্দ করলেন তিনি। তিনি বললেন, বালা জোড়া আমি একটু নিয়ে যাচ্ছি—আমার শিশুটি রইল ঝুড়িতে, তাকে জাগিযে দিও না, আমি এখুনি আসছি। ২৭৯

দ্বিতীয় দৃশ্য : বেলা বয়ে গেল, বালাও গেল, তিনি আর এলেন না, ঝুড়িতে শিশু ঘুমিয়েই রইল। স্বর্ণকার দেখল সে শিশুর নিদ্রা জাগরণ দুই সমান—কারণ সেটি কাঠের শিশু। স্বর্ণকারও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তা দেখে, অবশেষে যবনিকা টেনে দেওয়া হল এই একাঙ্ক নাটিকার উপর। ২৮০

তৃতীয় নাটিকার স্থান কৃষ্ণনগর। একটি লোক নিজের দেওয়া ডিজাইন অনুযায়ী এক স্বর্ণকারকে সোনার হার তৈরি করতে দেয়, কিছু অগ্রিমও দেয়। নির্দিষ্ট দিনে হার নিতে এসে নেওয়া হয় না, টাকা কম পড়েছে, পুরো টাকা এনে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে আর এলো না, কেনই বা আসবে, হারটি দেখবার সময় স্বর্ণকারের অলক্ষ্যে সরিয়ে সে একটি নকল হার তাকে দিয়ে এসেছে। পরবর্তী দৃশ্যে স্বর্ণকারের হায় হায় এবং বৃথা পুলিসের কাছে ছুটোছুটি। ২৮১

কৃষ্ণনগরের একাঙ্ক নাটিকাটি ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যার কাহিনী। একেবারে ডাবল অ্যাট্রাকৃশন! যুগপৎ নাটক এবং ভেল্কি। ব্যবহারের ক্ষেত্রে এইভাবে যাদুবিদ্যা

কাজে লাগালে বেশ উপার্জন হয়। শুনেছি এর ক্ষেত্র বড়বাজারে বহু বিস্তীর্ণ। অনেকেই দামী চোরাই কাপড় অন্ধকার গলিখুঁজিতে মাটির দরে পেয়ে যান, এবং চোখে দেখে কিনে এনেও প্যাকেট খুলে পান চট। প্রতারকের ভেল্কি! হাত সাফাই! বিক্রেতা ও ক্রেতা দুই-ই বাহাদুর। ২৮২

প্রতারক এবং প্রতারিত উভয়কেই আমি প্রশংসা করি। প্রতারক অনেক বিদ্যা এবং অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে এক একটি কৌশল বা'র করে, সবাই জানে তাদের কৌশল, সবাই জানে তারা এর সাহায্যে উপার্জন করে। পক্ষান্তরে প্রতারিতরাও অনেক দুঃখ স'য়ে তাদের অস্ত্রের নিচে ঘাড় বাড়িয়ে দেবার কৌশল শেখে প্রতারকদের উপার্জনের সাহায্য করার জন্য। কিন্তু তোমরা যারা প্রতারকও নও, প্রতারিতও নও, তোমাদের নীতি হওয়া উচিত: কাউকে ঠকিও না, এবং কাউকে ঠেকিও না। কোনো দিকেই কারো ব্যক্তিস্বাধীনতায় হাত দিও না। ২৮৩, ৭-৩-৫৪

হিংসা ও চিতা

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ক'দিন আগে বলেছিলেন হিংসাত্মক সকল রকম আন্দোলনকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু তার আগেই হাওড়া জেলায় একটি চিতাবাঘ হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় এবং কয়েকজন লোককে ঘায়েল করে। এই চিতা অতঃপর এক স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীর উপর আক্রমণ চালায়। অতএব একে মারার জন্য সেনাবিভাগের লোকদের ডাকা হয়েছিল। শিক্ষক আন্দোলনের পর থেকে দমন কাজে মিলিটারির সাহায্য নেবার রীতি তা হ'লে সত্যই প্রচলিত হল। ২৮৪

কিন্তু যে চিতা ছাত্রকে আক্রমণ করেছে সে কোন্ দলের চিতা সে বিষয়ে আমি সন্দেহমুক্ত নই, সরকার পক্ষ যাই বলুন। এ চিতাকে যদি সরকারবিরোধী বলেই ধ'রে নেওয়া হয়, তবু আর একটি প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকে, অর্থাৎ এ চিতা রাজ্য-চিতা না রাষ্ট্রচিতা? এ চিতা মারার দায়িত্ব রাজ্যের না রাষ্ট্রের? কে এ কথার উত্তর দেবে? তবে আশা করি এ চিতার সঙ্গে পাকিস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই। ২৮৫

দশ বছর সময় চাই

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ইংরেজী প্রশ্নপত্রের গণ্ডগোল সম্পর্কে খবরের কাগজে

বিবৃতি বেরিয়েছে। এই বিবৃতিতে প্রশ্নপত্র রচনাকারীর উপর কটাক্ষপাত করা হয়েছে আগের মতোই। এ কিন্তু অন্যায়। কারণ এ রকম ভুল প্রতি বছরেই কোনো না কোনো প্রশ্নপত্রে থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রেও থাকে। এতে প্রমাণ হয় প্রশ্নপত্র যাঁরা রচনা করেন তাঁরা অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সময়ের অসুবিধাটাই সবচেয়ে বড় মনে হয়। এক একটি পত্রে পাঁচ ছ'টি প্রশ্ন থাকে, কিন্তু তার জন্য তাঁরা সময় পান মাত্র এক বছর। এ রকম তড়িৎগতি প্রশ্নপত্র রচনায় ভুল না থাকলেই তা অসম্ভব মনে হ'ত। ছ'টি প্রশ্নের জন্য কম ক'রেও দশ বছর সময় তাঁদের পাওয়া উচিত, তা হলেই তাঁদের প্রতি সুবিচার হতে পারে। ২৮৬

হিংসা ও স্কুল ফাইন্যাল

আজ ৯ই মার্চ, বিকেল চারটের কিছু পরে ইতশ্চেতঃ লিখতে আরম্ভ ক'রে মাত্র গোটা তিনেক প্যারাগ্রাফ লিখেছি, এমন সময় আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। আমার জানালা থেকে একটি মেয়েদের স্কুল বেশি দূরে নয়, দেখলাম ছেলেরা দল ধ'রে আক্রমণ ক'রে তার গেট ভাঙল, তারপর স্কুলে ঢুকল, তারপর আর এক দরজার কলাপসিব্‌ল গেট ভেঙে দোতলায় উঠে ভয়বিহ্বল মেয়েদের ডেস্ক থেকে ইতিহাসের উত্তর লেখা খাতা কেড়ে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগল এবং সেগুলো টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে মুঠোমুঠো হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। প্রাঙ্গণস্থ গাছের পাখীরা ভয়ে চীৎকার ক'রে উড়ে পালাল, বহু কাক একত্র জুটে কি হ'ল কি হ'ল রবে আকাশ বিদীর্ণ করতে লাগল, স্তম্ভিত দ্বাররক্ষী গুঁতো খেয়ে চোরের মতো এক কোণে পড়ে ঝিমোতে লাগল, দখিন হাওয়ায় ছিন্ন পত্ররাশি প্রাঙ্গণে চঞ্চল হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। গেট ভাঙার ঝন ঝন শব্দ, বহু আক্রমণকারীর মিলিত চিৎকার, শিক্ষয়িত্রীদের ক্ষীণ প্রতিবাদধ্বনি, কাকদের কা কা, সমস্ত মিলে সে এক মহা উত্তেজনা! কিন্তু মাত্র দশ মিনিট। তারপর সব স্তব্ধ। ২৮৭

এক বন্ধু প্রথম আক্রমণের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলেন তাঁর মেয়ে যে সেণ্টার পরীক্ষা দিচ্ছে সেখানেও হয়তো আক্রমণ চলছে। তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় একটি ছেলেকে সস্নেহে বললেন, ভাই মেয়েদের স্কুলে এই আক্রমণ কি ভাল? ছেলেটি উত্তেজিত অথচ সংযতভাবে জবাব দিল—আমরা কাউকে আক্রমণ করব না, আমরা শুধু খাতা ছিঁড়ব, কারণ আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আরও হবে যদি আর সবার পরীক্ষা বন্ধ করতে না পারি। বন্ধু বললেন—কথাটা খুবই ন্যায্য। ২৮৮

তিনি ছুটে গেলেন তাঁর মেয়ের কাছে। সেখানে গিয়ে দেখলেন ছেলেরা গেট ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছে। সেই স্কুলে টেলিফোন ছিল, ছেলেরা আগেই তার যোগাযোগের তার কেটে দিয়েছে। কিন্তু গেট পেরিয়ে তারা ক্লাস-রুমের প্রবেশ পথে দুঃসাহসী হেডমিস্ট্রেসের কাছে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। হেডমিস্ট্রেস বলছেন, আমাকে না মেরে তোমরা ভিতরে যেতে পারবে না। ছেলেরা নিষ্ঠুর নয়, তারা হেডমিস্ট্রেসকে "বাই-পাস্" ক'রে পাইপ বেয়ে উপরে উঠে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে বিপদের ইঙ্গিত পেয়েই পরীক্ষার্থিনীদের কাছ থেকে যে অসমাপ্ত উত্তর সমেত খাতাগুলো আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে তা তারা জানত না, তাই তারা ব্যর্থ হ'ল। মুখে তাদের কি বেদনা! ২৮৯

ইতিহাসের প্রশ্ন নিয়েই এই গণ্ডগোল। প্রশ্নপত্র চেয়ে নিয়ে পড়ে দেখলাম, সাধারণ প্রশ্ন, সাধারণ জ্ঞান থেকেই পাস করার মতো উত্তর লেখা যায় এবং যে কোনো মনোযোগী ছাত্রের কাছে তা প্রায় জলের মতো সোজা, এই মন্তব্য শোনা গেল এক ছাত্রেরই মুখ থেকে। কিন্তু প্রশ্ন সোজা হলেই যে সবাই লিখতে পারবে এমন কথা নেই। যারা খুব কঠিন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হয়েছে তাদের কাছে সোজা প্রশ্নই কঠিন মনে হওয়া স্বাভাবিক। প্রবেশিকা পরীক্ষা সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই এটি হয়ে আসছে, অর্থাৎ একই প্রশ্ন এক দলের কাছে সোজা, আর এক দলের কাছে কঠিন। ২৯০

যাই হোক, যাদের কাছে এবারের প্রশ্ন কঠিন মনে হয়েছে তাদের কিছু একটা ব্যবস্থা হাতে হাতে করতেই হ'ল। একটুখানি ধৈর্যের অভাব ভিন্ন তাদের বিরুদ্ধে আর কিছু বলবার নেই। তারা যা করেছে অন্যদিক দিয়ে তা খুবই প্রশংসনীয়। গেট ভাঙায়, টেলিফোনের তার কাটায়, পাইপ বেয়ে উপরে ওঠায় এবং নির্ভীকতায় এই ছেলেরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তাতে গর্ব অনুভব করি। নিজেদের শাদা খাতার সঙ্গে আর সবার ছেঁড়া খাতার টুকরো মিশিয়ে, সব এলোমেলো ক'রে দিয়ে, পরীক্ষা বাতিল ক'রে দেবার এই যে চতুর বুদ্ধি, এও যে-কোনো দেশের ছাত্রদের পক্ষে গৌরবের। ২৯১

তারুণ্য ধর্মই এদের মধ্যে প্রকট দেখে আনন্দ হল। এই ধর্ম দুঃসাহসের ধর্ম, বীরত্বের ধর্ম। উদ্দেশ্যবিহীন, লাভবিহীন একটা ভাবের পিছনে ছুটে যাওয়া, শুধু ভাঙার আনন্দে ভাঙা, শুধু ক্ষতির আনন্দে ক্ষতি করা। বিবেচনাহীন লক্ষ্যহীন অন্ধকারে

ঝাঁপিয়ে পড়া। তারা কি চায় তা তারা জানে না, কেন প্রশ্নপত্রের বিরুদ্ধে তাদের এই ক্ষোভ তা ভাববার দরকার নেই, ভবিষ্যতে আরও কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তা জানা নেই, হয় তো আরও সহজ (অতএব আরও দুর্বোধ্য) প্রশ্ন আসবে, কিন্তু কিছু এসে যায় না তাতে। — উথলি যখন উঠেছে বাসনা জগতে তখন কিসের ডর। ২৯২

এরাই হচ্ছে এ যুগের ডমিন্যাণ্ট মাইনরিটি। এই তিন চার ডজন ছেলে এই শহর পরিচালনা করে। সরকারের সমস্ত শক্তি এদের কাছে ব্যর্থ। দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার এরা, দেশ শাসনের অভিজ্ঞতা এরা এইভাবে হাতে-কলমে লাভ করছে, পরীক্ষাটা উপলক্ষ মাত্র। এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাদের যাবার ইচ্ছা আছে অথচ ক্ষমতা নেই, তারা আর যাই কর, ঘরে ব'সে এদের নিন্দা ক'রো না। কারণ ভবিষ্যতেও যদি প্রশ্ন এদের মনের মতো না হয় তা হ'লে পরীক্ষা বন্ধ করার এই শিক্ষা কি এদের বৃথা যাবে ? ২৯৩

ইতিমধ্যে কি করলে এই গণ্ডগোলের একটা মীমাংসা হ'তে পারে তার উপায় চিন্তা করা দরকার। খুব সহজ উপায় আছে। প্রশ্নপত্র রচনাকারীদের যদি নির্ভুল প্রশ্ন রচনার বাসনা থাকে তবে, প্রতি বছর একদল ক'রে তাঁরা সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে নির্ভুল প্রশ্ন রচনা শিখে আসতে থাকুন। যারা যন্ত্রের ব্যালান্স ঠিক রেখে ঘড়ি তৈরি করতে পারে, তারা প্রশ্নপত্রেরও ব্যালান্স ঠিক রাখার বিদ্যা জানে। আমাদের প্রশ্নপত্রে ব্যালান্স ঠিক থাকছে না। কখনো সিলেবাসের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, কখনো দুটো মাত্র প্রশ্ন দিয়েই বলা হচ্ছে যে-কোন দুটোর উত্তর লেখ। ২৯৪

ইতিমধ্যে কর্তব্য : যে প্রশ্ন করা হবে তা পরীক্ষার অন্তত তিন মাস আগে সমস্ত খবরের কাগজে ছাপা হোক এবং এ বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের মত আহ্বান করা হোক। তারা যদি আপত্তি করে তা হ'লে সে সব প্রশ্ন দেওয়া চলবে না। তখন তারা যে মানের প্রশ্ন চাইবে তা তারা জানাবে খবরের কাগজের মাধ্যমে। অবশ্য সবাই জানাবে না, পরীক্ষার্থীদের প্রতিনিধি থাকবে, তাদের মারফত মতামত আদান-প্রদান হবে। অধিকাংশ প্রতিনিধি যে সব প্রশ্ন চাইবে শুধু তাই ছেপে পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এ ভিন্ন আপাতত অন্য কোনো পথ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড যা প্রশ্ন দিচ্ছেন, তা ক্রমেই পরীক্ষার্থী মহলে অচল হয়ে পড়ছে। তাই এর একমাত্র বিকল্প ছাত্র-সমিতিগুলির হাতে প্রশ্ন

মনোনয়নের ভার তুলে দেওয়া। আশা করি পরীক্ষার্থীমাত্রেই আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন। ২৯৫, ১৪-৩-৫৪

ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সোজা

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ইতিহাসের কয়েকটি প্রশ্নের মধ্যে যেগুলি জলের মতো সোজা সেইগুলি নিয়ে আলোচনা করছি। কঠিন প্রশ্নের উত্তর ছেলেরা ইতিহাসের জ্ঞান থেকেই লিখতে পারত, সোজা প্রশ্নগুলির উত্তর লিখতে ইতিহাসে কোনো জ্ঞান থাকবারই দরকার নেই। প্রশ্নগুলি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লেখা আছে। ৪নং প্রশ্ন ইংরেজীতে যা লেখা আছে বাংলায় তা লেখা নেই। বাংলায় লেখা আছে "সম্রাট হর্ষের রাজত্বকালে ও সেই সময়ে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির কি অবস্থা ছিল।" এই প্রশ্নে দুটি পৃথক সময়ের উল্লেখ আছে। "রাজত্বকালে" ও "সেই সময়ে।" ভারতীয় সংস্কৃতির অবস্থা বা সমাজ হর্ষের রাজত্ব "কালে" এক রকম, "সেই সময়ে" আর এক রকম। সাধারণ বুদ্ধি খাটালে আবিষ্কার করা যাবে দুটি কাল কখনও এক রকম হয় না। "রাজত্বকালে" যে সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল, "সেই সময়ে" তা থেকে কিছু তফাত ছিল। শুধু এই পার্থক্যটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কখনও বা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কখনো বা বিস্ময়ের সঙ্গে বর্ণনা করে গেলেই পাস মার্ক। ২৯৬

সাত নম্বর প্রশ্ন ইংরেজীতে যা লেখা আছে বাংলায় তা নেই। ইংরেজীতে চাওয়া হয়েছে ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ব্রিটিশ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কি contribution ছিল। বাংলায় দেওয়া হয়েছে কি অবদান ছিল। Contribution মানে অবদান নয়। Gift মানে অবদান হতে পারে। অবদানের আসল অর্থ (১) পূজার্থে দান, অর্চনার্থে দান, (২) Gift (৩) সম্পাদিত কর্ম; [achievement] (৪) বিক্রম প্রকাশ, পরাক্রম; সাহসের কায, (৫) কীর্তি, (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)। মহৎ কর্ম; কীর্তি (রাজশেখর বসু)। সম্পাদিত কর্ম; পরাক্রম; বিক্রমপ্রকাশ; সর্বজন প্রশংসনীয় বা মহৎ কর্ম; কীর্তি; ছেদ; খণ্ড; অতিক্রম; যাহা শুদ্ধ করে; উৎকৃষ্ট চরিত বা কর্ম; (সুবলচন্দ্র মিত্র)। ২৯৭

অবদান যে contribution নয় এ বিষয়ে সবাই একমত। অতএব বাংলা ও ইংরেজী প্রশ্ন পৃথক। এই সাত নম্বর বাংলা প্রশ্নটি তাই সাধারণ জ্ঞান থেকে লেখা সহজ। অবদানের যে-কোনো একটি অর্থ ধ'রে লেখা যেতে পারে। যদি

"পূজার্থে দান" ধরা যায় তাহলে আরও সহজ হয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ক্লাইভ ও হেস্টিংস পূজার্থে কি দান করেছেন। তাঁরা কালীঘাটে বা অন্যত্র কিছু দান ক'রে থাকবেন, তার কোনো রেকর্ড নেই। অতএব যার যা খুশি লিখবে। কেউ দু' আনা, কেউ দু'টাকা। ২৯৮

এবারে সরলতম প্রশ্ন হচ্ছে ১৩নং: Show how and why England defeated Napoleon. এত সরল প্রশ্ন পৃথিবীতে ইতিহাসের পরীক্ষা প্রবর্তনের পর থেকে কোনো পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করতে সাহস করেননি। Describe how নয়, Show how. তারপর চরম হচ্ছে why। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড কি উদ্দেশ্যে বা মতলবে নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করল। অর্থাৎ না করলেও তো পারত। যেমন গত যুদ্ধে মিত্রশক্তি কি মতলবে হিটলারকে পরাস্ত করল। যুদ্ধ আরম্ভ ক'রে দিয়ে হিটলারকে কোলে তুলে নাচতে বাধা ছিল কি। তাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করতে পারত। চুমো খেতে পারত। ২৯৯

ধ'রে নেওয়া যাক একটি ছেলে ইংল্যাণ্ড বা নেপোলিয়নের নাম কখনো শোনেনি। একটু বুদ্ধি খরচ করলে সেও এর উত্তর লিখে পাস মার্ক পেতে পারে। সে প্রথমে ভেবে নেবে নেপোলিয়নকে পরাস্ত যখন করেছে, তখন যুদ্ধ একটা অবশ্যই হয়েছে। এবং যুদ্ধ যখন হয়েছে তখন উভয়ের মধ্যে শত্রুতা অবশ্যই ছিল। এবং নেপোলিয়নকে যুদ্ধ পরাস্ত করার মানে লোকটা অত্যন্ত খারাপ ছিল, ইংলণ্ডকে বড়ই বিরক্ত করছিল, অতএব ইংলণ্ড তাকে পরাস্ত ক'রে ঠিক কাজই করেছে। ইংল্যাণ্ড একটি মানুষের নাম ধ'রে নিলেও ক্ষতি নেই। কেমন ক'রে পরাস্ত করেছে লেখাও অত্যন্ত সহজ। যে পক্ষ জেতে, ধ'রে নিতে হবে তার সুযোগ, সুবিধা, বুদ্ধি এবং অস্ত্রশস্ত্র বেশি। অথবা তারা বেশি কুশলী। যে কোনো বাঙালী ছেলে কাব্যের ভাষায় এই কথাগুলো পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারে। নেপোলিয়নকে গাল দিতেই তো অন্তত দু'পাতা লাগার কথা। ৩০০,২১-৩-৫৪

লোক চিনতে কত দিন লাগে

ছেলেবেলায় দেখা ঘড়ির বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ে। চার পাঁচ টাকা দামের ঘড়ির বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত গ্যারাণ্টী দশ বছর। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র দামী ঘড়ির বিজ্ঞাপন দিত তাদের গ্যারাণ্টী লেখা থাকত এক বছর। মনে হ'ত কম দামের ঘড়ি কেনা খুব লাভের, কারণ দশ বছরের মধ্যে মেরামত খরচ নেই।

তখন বুঝতে পারিনি আসল ফাঁকিটা কোথায়। পরে একজন অভিজ্ঞ লোক আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, শস্তা ঘড়ি মাসে তিনবার খারাপ হয় এবং গ্যারাণ্টীর জোরে বিনা পয়সায় দু চারবার মেরামত করানোর পরেও যখন্‌ ঘড়ি আবার অচল হয়—গ্যারান্টির ফাঁকি বোঝা যায় তখন। তখন ঘড়ির উপর দাঁড়িয়ে নাচতে ইচ্ছা করে এবং অনেকে নেচেও থাকে। ৩০১

কিন্তু দামী ঘড়ির মধ্যে ফাঁকি নেই। এই ঘড়ি তৈরির সময় যদি দৈবাৎ কোনো ত্রুটি ঘ'টে থাকে তবে সে ত্রুটি এক বছরের মধ্যে ধরা পড়বেই। এক বছরেও যদি কোনো ত্রুটি ধরা না পড়ে তা হ'লে বুঝতে হবে তৈরি নিখুঁৎ, এক বছর গ্যারাণ্টীর এই হল অর্থ। কেন্দ্রীয় পরিষদে বিশেষ বিবাহ বিলে যে নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব হয়েছে তাও প্রায় ঐ দামী ঘড়ির গ্যারাণ্টীর মতোই। ৩০২

এই নতুন ব্যবস্থায় বিয়ের তিন বছরের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করা চলবে না। অর্থাৎ আইন প্রস্তুতকারকের মতে প্রজাপতির নির্দেশে ঘটিত বিবাহের গ্যারাণ্টী তিন বছর। এই তিন বছরে যদি কোনো ত্রুটি ঘটে তা হ'লে প্রজাপতি স্বয়ং তা সংশোধন করবেন; তিন বছর পার হয়ে গেলে যদি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে তবে বুঝতে হবে সে ত্রুটি কারখানার ত্রুটি নয়, বিবাহিতদেরই ত্রুটি, তখন তারা তার সংশোধনের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। ৩০৩

তিন বছর সময় দেওয়া হয়েছে পরস্পর অপরিচিত বা অল্প পরিচিত দুটি নরনারীর মধ্যে পূর্ণ পরিচয়ের অবকাশ সৃষ্টির জন্য। অনুমান করা হয়েছে এই সময়ের মধ্যে বিবাহিতেরা পরস্পরকে ভালো ক'রে চিনতে পারবে। আমার মতে কিন্তু এ জন্য দীর্ঘ তিন বছর সময় দেওয়ার কোনো মানে হয় না। তিনদিন দিলেই যথেষ্ট। লোক চিনতে কি তিন বছর লাগে? ৩০৪

আদি অন্ত

দোহাদ জেলার প্রায় পাঁচ হাজার আদিবাসী একত্র হয়ে একটি সভা করেছে সম্প্রতি। তারা সভায় প্রস্তাব এনেছে—বিয়ের কনের দাম বর্তমানের ১০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৩২৫ টাকা করা হোক। সভার দ্বিতীয় আলোচনা হয়েছে ব্যাধি চিকিৎসার প্রথা নিয়ে। নেতারা চিকিৎসায় মন্ত্রতন্ত্র এবং নানাবিধ

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছে।—আদিবাসীদের এই দৃষ্টান্ত আমাদের মতো অন্তবাসীদের অনুকরণযোগ্য নয় কি? ৩০৫

হৃদয় কলম

নিউ অরলিন্স-এর এক হার্ট স্পেশালিস্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজন হ'লে বিষম অসুবিধাজনক অপারেশনের স্থলে ব্যাধিগ্রস্ত ক্ষত হৃদয় (হৃৎপিণ্ড) একেবারে কেটে বাদ দিয়ে সেখানে মৃতের সুস্থ হৃদয় কলম করা সম্ভব হবে। আমাদের দেশে কিন্তু অতি প্রাচীন কাল থেকে এর চেয়েও শক্ত অপারেশন চ'লে আসছে। এই রীতিতে দুটি সুস্থ ব্যক্তির দুটি চঞ্চল হৃদয় আধ ঘণ্টার মধ্যে পরস্পর কলম করা হয় শুধু মন্ত্রের সাহায্যে। ৩০৬

নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক

লণ্ডনের সুবিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নরহত্যানীতি বিশারদ, সি-আই-ডি প্রধান ডক্টর হ্যাথারিল সম্প্রতি একটি অতি নিষ্ঠুর সত্য আবিষ্কার করেছেন। —তাঁর মতে নরহত্যাকারী স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে স্ত্রীজাতি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। পুরুষ খুন করে দ্রুত, এক আঘাতে, কিন্তু স্ত্রীলোক সাধারণত বিষ ব্যবহার করে এবং সেই বিষের ক্রিয়া সে হৃদয়হীন নিস্পৃহতার সঙ্গে অনেক দিন ধ'রে প্রত্যক্ষ করে—মনে তার কিছুমাত্র করুণা জাগে না। ৩০৭

কিন্তু এ সত্য কি তাঁর নতুন আবিষ্কার? তাঁদের দেশে অন্তত বিবাহিত পুরুষ মাত্রেই জানে মেয়েরা কি কৌশলে তাদের বলিকে ফাঁদে ফেলে এবং ধীরে ধীরে তার উপর মোহ বিস্তার ক'রে গীর্জায় টেনে নিয়ে যায় হত্যাকে আইনসিদ্ধ ক'রে নেওয়ার জন্য। তারপর পুরুষের মনে বিষক্রিয়া প্রকাশ পেতে থাকে, পুরুষ তার হত্যাকারিণীর হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য ছটফট করতে থাকে, কখনো বিষক্রিয়া পূর্ণ হবার আগেই হঠাৎ সকল শক্তিতে জেগে উঠে ডাইভোর্স আদালত পর্যন্ত ছুটে যায় এবং মুক্তি পেয়েও থাকে। অথবা মনে করে মুক্তি পেয়েছে কারণ তখনই দেখা যায় নতুন আর একজনের বিষ সে ইতিমধ্যেই গিলতে আরম্ভ করেছে। ৩০৮

আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়, এখানে অবশ্য পুরুষেরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে বিবাহ নামক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে। তাই বিষক্রিয়া বুঝতে পেরেও তার

কোনো আতঙ্ক নেই। পৃথিবীতে কোথায়ও হত্যাকারিণীদের হাত থেকে পুরুষের নিষ্কৃতি আছে কি? ৩০৯,২৮-৩-৫৪

তেজস্ক্রিয়তার ছড়াছড়ি

গত যুদ্ধে জাপানীদের মেরেই পরমাণু বোমার পরীক্ষা হয়েছিল; এখন শান্তির সময়েও এই বোমার পরীক্ষায় জাপানীরা বিপন্ন হচ্ছে। পরমাণু বোমার পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত সংস্করণ হচ্ছে হাইড্রোজেন বোমা, সংক্ষেপে এচ্-বম। রুশ-মার্কিন দু পক্ষই এর পরীক্ষা চালাচ্ছে, কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে একমাত্র জাপানীদের। ২৩শে মার্চের খবর—ত্রিশজন জাপানী অধ্যাপক রেডিও-অ্যাকটিভ হয়ে মারা যেতে বসেছেন। পরমাণু বোমা যেখানে ফাটে তার চারদিকে (আসলে দশ দিকে) সমস্ত পরিমণ্ডল রেডিও-অ্যাকটিভ হয়ে পড়ে। ১লা মার্চ বিকিনিতে যে পরমাণু বোমার পরীক্ষা হয়, তারই ফলে জলের মাছ প্রথমত রেডিও-অ্যাকটিভ হয়েছে এবং সেই মাছ খেয়ে অধ্যাপকেরা পরে রেডিও-অ্যাকটিভ হয়েছেন। ৩১০

রুশদের এচ্-বম পরীক্ষা হয়েছে সাইবেরিয়াতে। এইখানে যতবার পরীক্ষা হয়েছে ততবারই রেডিও-অ্যাকটিভ ভস্ম জাপানের উপর এসে পড়েছে তার তিনদিন পরেই। তার পর এই ভস্ম পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে এক সপ্তাহ পরে আবার জাপানে এসে পড়েছে এবং দ্বিতীয়বার পৃথিবী ঘুরে শেষ বারের মতো পড়েছে আর এক সপ্তাহ পরে। এই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একাধিকবার। ৩১১

এচ্-বমের মারণশক্তি এমনিই বীভৎস যে সাধারণ ইংরেজরা এ নিয়ে আলোচনা করতেও সঙ্কুচিত হচ্ছে। যতটা ভয়াবহ কল্পনা মানুষ করতে পারে—এচ্-বমের ভয়াবহতা তাকে বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে। একজন বিশেষজ্ঞ বলছেন অ্যামেরিকার বৃহত্তম ৬৭টি নগরের উপর যদি এই বোমা পড়ে তাহলে ৯০ লক্ষ লোক তৎক্ষণাৎ মারা যাবে এবং ২ কোটি ২০ লক্ষ লোক মারাত্মকভাবে আহত হবে। এ হল কাগজে-কলমে হিসেব। বাস্তবে হতাহতের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি হবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এর মারণ ক্ষমতা হিসাবের বাইরে চলে যায় অর্থাৎ ফল কতদূর গড়াবে তা কেউ বলতে পারে না। ৩১২

আমি বলতে পারি। বড় জিনিসের সঙ্গে ছোট জিনিসের তুলনা যদি অচল না হয় তা হলে এই ছোট্ট ঘটনাটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি: ঘটনাটি

সম্প্রতি স্টুটগার্টে ঘটেছে। তিনজন শিকারী স্টুটগার্টের কাছে কোনো এক জায়গায় শেয়াল শিকারে গিয়ে একটি শেয়ালের গায়ে গুলি ছোঁড়েন। এর ফলে শেয়াল প্রায় অক্ষত দেহে পালিয়ে যায়, কিন্তু এই গুলিতে শিকারী তিনজনই আহত হয়েছেন। ঘটনাটি বিস্ময়কর, কিন্তু স্বাভাবিক। এই শেয়ালের কাছে একটি জলের পাইপ ছিল, গুলি এই পাইপে চোট খেয়ে ফিরে এসে তিনজন শিকারীকেই আহত করেছে, অর্থাৎ বন্দুকের গুলি অস্ট্রেলিযার বুমেরাং অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। হাইড্রোজেন বোমার পরিণাম কি ঘটতে পারে তার ইঙ্গিত আছে এই ঘটনার মধ্যে। ৩১৩

জাপানের ত্রিশজন অধ্যাপক রেডিও-অ্যাকটিভ হয়েছেন, তার অর্থ এই যে পরমাণু বোমা থেকে যে গামা রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছে তা তাঁদের দেহে প্রবেশ ক'রে দেহের পরমাণুপুঞ্জকে ধীরে ধীরে ভাঙতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। পরমাণু ভাঙার যে কৌশল থেকে পরমাণু বোমার উৎপত্তি, সেই কৌশলেরই প্রতিক্রিযায অধ্যাপকদের দেহের পরমাণু ভাঙছে। ৩১৪

এক একজন জাপানী অধ্যাপকের (এবং যে-কোনো দেশের অধ্যাপকের) দেহে পরমাণু সংখ্যা অগণিত। বস্তু মাত্রেরই মূল উপাদান পরমাণু। সমস্ত দেহ দূরের কথা, আঙুল থেকে যে নখটি কেটে ফেলছি তার পরমাণু সংখ্যারই কূলকিনারা পাওয়া যায় না এবং তা থেকেও অগণিত পরমাণু বোমা তৈরি হ'তে পারে। অধ্যাপকেরা প্রত্যেকে তাঁদের দেহে সংখ্যাতীত পরমাণু বোমার উপাদান বয়ে বেড়াচ্ছেন। অধ্যাপক না হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমি সবাই এই প্রচণ্ড শক্তি আমাদের দেহে সংহত ক'রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকের দেহের পরমাণু থেকে যে পরমাণু বোমা তৈরি হ'তে পারে, তা দিয়ে পৃথিবীকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ভস্ম ক'রে দেওয়া যায়। ৩১৫

কিন্তু পরমাণুরূপী আপনার আমার দেহের এই সংহত শক্তি-কণিকাগুলোকে পরমাণু বোমা ফেলে কেউ ভেঙে দেবে বলে তৈরি হয়নি। এত কাল এ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কোনো ধারণাই ছিল না, আজ পরমাণু-ভাঙা বিদ্যা আয়ত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মানুষখেকো রাজনীতিকেরা এই বিদ্যায় নিরীহ মানুষের দেহ-পরমাণু ভাঙার কাজে লেগে গেছেন। ৩১৬

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে এর প্রতিক্রিয়া নিরপেক্ষ দেশের মানুষের দেহেও দেখা দেবে।

সে বিরাট ব্যাপক বীভৎস ধ্বংসের ছবি কল্পনা করতেও মাথা ঘুরে যায়। রূপময় জগৎ রূপহীন ভস্মে পরিণত হবে। ফলাফল সকল হিসাবের বাইরে, বিজ্ঞানীরাই বলছেন। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকৃত পিশাচটা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকেও মারবে, এ তো অনিবার্য লজিক। এখন সামান্য একটি বোমার পরীক্ষাতেই রেডিও-অ্যাকটিভ ভস্ম সর্বত্র ছড়াচ্ছে, ঊর্ধ্বস্তরের অতি দ্রুতগামী বায়ুস্রোতে এই ভস্ম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরছে। এ ভস্ম মদনভস্ম নয়, বহু সম্মানীয় রাজনীতিকদেব বদনভস্ম। মুখপোড়ারা সবাইকে ধনে প্রাণে মারবে বলে তৈবি হচ্ছে। ৩১৭

ধ্বংসটা কি মূর্তিতে যে আসবে তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো সকল প্রাণী ধ্বংসের সঙ্গে হাওয়ার উপাদান, যথা অক্সিজেন নাইট্রোজেন ইত্যাদির পরমাণু ভাঙতে আরম্ভ করবে, হয়তো জলের হাইড্রোজেন অক্সিজেন পৃথক হয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। পৃথিবী চাঁদে পরিণত হবে। এতটা বিপর্যয় যদি নাও ঘটে, তবু সভ্য মানুষের অস্তিত্ব লোপ পাবেই যদি দু'পক্ষই পরস্পরেরর উপর একসঙ্গে অনেকগুলো ক'রে এচ্-বম ফেলতে পাবে। সবশেষে বহুদূর বিচ্ছিন্ন সব দ্বীপে বা পাহাড়ে দু'চারজন যারা বেঁচে থাকবে—তারা আব বর্তমান সভ্যতাব টুকবো কুড়িয়ে কুড়িয়ে এব পুনর্গঠন কবতে চাইবে না বলেই মনে হয। হয়তো তারা কিছুকাল লাঠি বা তীর-ধনুকেব জয়গান কববে, তাবপব যখন দেখবে তারা যথেষ্ট সভ্য হয়েছে, তখনই তাবা আবাব পবমাণু বোমা তৈরির কৌশল খুঁজবে। ৩১৮

ভয় পাবার কারণ নেই, হাইড্রোজেন বোমা প্রাথমিক লাঠিবই বিবর্তন সীমা। প্রকৃতিকে জয় ক'রে মানুষ কতখানি শক্তির অধিকার লাভ করতে পারে, তা না দেখা পর্যন্ত তার নিস্তার নেই। এর ফলে সবাই যদি ধ্বংস হই তাতে কি এমন ক্ষতি। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ এসে বিশ্বজগতের কি উপকার হয়েছে? জন্মাবধি নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে শুধু লড়াই ক'রে বেঁচে থাকা, তারপর আর এক যুগের হাতে অস্ত্রখানা তুলে দিয়ে চোখ বোজা। এই তো মহৎ কাজ। এ রকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পৃথিবী আকাশ পথে ছিল, এখনও আছে। কালক্রমে বহু পৃথিবীই চাঁদের দশা পেয়েছে, সব মরুভূমি হয়ে গেছে। জন্মাচ্ছে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নতুন সূর্য আর নতুন পৃথিবী। এই পৃথিবী লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আলোক বৎসরের অকল্পনীয় শূন্যতার মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র পরমাণুর মতোই তুচ্ছ। এর অস্তিত্ব যদি চূর্ণ হয়ে যায়, বিরাট বিশ্বে কোনো বিক্ষোভই

জাগবে না। অতএব আজ পর্যন্ত যে আমরা বেঁচে আছি এর জন্যই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কাল কি হবে ভেবে লাভ নেই। ৩১৯

বুঝতে পারছি পাঠকমন এ তত্ত্বকথায় সান্ত্বনা পাচ্ছে না। তা যদি হয় তা হ'লে ভুলে যাওয়া যাক হাইড্রোজেন বোমার কথা। তার চেয়ে হলিউড ঘুরে আসা যাক। একটি মূল্যবান খবর আছে। খবরটা বিশ্বজগতের নয়, বিশ্বসুন্দরীর। ৩২০

১৯৫৩ সনের মিস ইউনিভার্স বা পৃথিবীর সেরা সুন্দরী সিনেমা ছেড়ে ঘর বাঁধবার জন্য বিয়ে করেছিল। মাস দুই কেটেও গেছে। একদিন ব'সে ব'সে তার স্বামী বিবাহিত জীবনের সুখ-স্বপ্ন দেখছিল, বেচারা জানত না তার স্ত্রী তাকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে চলে গেছে আবার সেই সিনেমা জগতেরই সন্ধানে। কিন্তু হলিউডের ইতিহাসে এ বিবাহ তো যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী। এরাই বড় দার্শনিক। সংসার পাততে পাততে সংসার ভেঙে দিয়ে "সংসার অনিত্য" এই সত্যটিই এরা প্রচাব করছে। কে স্ত্রী, কে বা পুত্র—এই দর্শনেরই সাক্ষাৎ প্রচাবক এরা। আমবা ভারতীয়বা আর এদের নিন্দা কবি কোন্ মুখে। ৩২১,৪-৪-৫৪

পরীক্ষা ও ছাপা শাড়ি

আমাদের দেশে শাড়ির নানা রকম নাম আছে, এই নাম আরও অনেক বাড়িয়ে বিচিত্র রকমের সব শাড়ী এখন থেকে বাজারে বিক্রি করা যাবে এ রকম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অবশ্য এই বৈচিত্র্য একমাত্র ছাপা শাড়ির বেলাতেই খাটবে। ৩২২

এখন থেকে এই সব ছাপা শাড়ির নাম হতে পারবে সাহিত্য-শাড়ি, বিজ্ঞান-শাড়ি, ভূগোল-শাড়ি, হাইজীন-শাড়ি, জ্যামিতি-শাড়ি, বীজগণিত-শাড়ি, অথবা ডোমেস্টিক সায়েন্স-শাড়ি। এগুলো স্কুলের মেয়েরা পরবে। কলেজের মেয়েদের হবে লজিক-শাড়ি, সিভিক্স-শাড়ি, ফিলজফি-শাড়ি ইকনমিক্স-শাড়ি ইত্যাদি। ৩২৩

সত্যিই বলছি। এলাহাবাদের এক খবর থেকে জানা গেছে সেখানে প্রবেশিকা ও ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষা দিতে যে পাঁচ শ জন আন্দাজ পরীক্ষার্থী নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে ত্রিশজন মেয়েও ছিল, আর এই মেয়েরা তাদের শাড়ির আঁচলে নোট টুকে নিয়ে গিয়েছিল। ছাপা শাড়ির ব্যবসায়ীরা এর থেকেই ইঙ্গিত পেয়ে যাবেন তাঁদের ব্যবসা-ক্ষেত্র বিস্তারের কি বিপুল সম্ভাবনা সামনে। সাহিত্য,

ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির নোট দিয়ে এমনভাবে ডিজাইন তৈরি করবেন যাতে সূক্ষ্মদৃষ্টি ভিন্ন কেউ তা ধরতে না পারে। এই সব 'নোট' বা 'হিন্ট' বা 'পয়েন্ট' ফুল লতাপাতার ছদ্মবেশে শাড়ীর প্রশস্ত আঁচলে শোভা পাবে'। কোনো শাড়িতে থাকবে শুধু ঐতিহাসিক তারিখ, কোনো শাড়িতে শুধু দেশ-বিদেশের মানচিত্র। ছেলেরা এই সুবিধা থেকে স্বভাবতই বঞ্চিত থাকবে, তবু আশা করি স্বভাব-শিভ্যাল্‌রিবশত তারা মেয়েদের ধরিয়ে দেবে না। ৩২৪

রুটি ও ব্লেড

মরোকোর খবর—স্থানীয় এক রুটি বিক্রেতার কাছ থেকে এক ভদ্রলোক রুটি কেনেন, সেই রুটিতে ক্ষুরের ব্লেড পাওয়া গেছে। সম্ভবত মরোকোতে রুটি নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রি হয়, তাই বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে গলাকাটা দাম নিতে না পেরে তার গলাকাটার ব্যবস্থা করেছে রুটিতে ব্লেড ঢুকিয়ে। ৩২৫

মধু ও হুল

জবলপুরের গোয়ারিঘাট রোডের কাছে এক মন্দিরে এক মূর্তি আবিষ্কার হওয়াতে সেখানে এক যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। যজ্ঞ চলছিল এমন সময় তার ধোঁয়া গিয়ে এক গাছে অবস্থিত মৌচাকে গিয়ে লাগে এবং মৌমাছিরা বিচলিত হয়ে ওঠে। তারপর আরও কিছুক্ষণের মধ্যে মৌমাছিরা দল বেঁধে এসে যজ্ঞকারীদের উপর আক্রমণ চালায়। তাঁরা আর ওখানে তিষ্ঠোতে পারেন না, চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারেন ছুটে পালান। ফলে যজ্ঞের স্থানই শেষ পর্যন্ত বদলাতে হয়। খুবই স্বাভাবিক, কারণ যাই ঘটুক না কেন, যজ্ঞের উদ্দিষ্ট দেবতারা মধুর বরাদ্দ ঠিকই পেয়ে যান, শুধু যজ্ঞকারীদের ভাগ্যে থাকে হুল। ৩২৬

একাধিক স্ত্রী চাই?

দিল্লীর রাজ্য পরিষদে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আলোচনা ও ভোট গ্রহণ সময়ে সর্দার দলজিত সিং উঠে বলেন, প্রত্যেকটি পুরুষের একের বেশি স্ত্রী দরকার—আর এই হচ্ছে পুরুষের স্বভাবজ সংস্কার। অতএব এর বিরুদ্ধে আইন করা অন্যায়। ৩২৭

পুরুষ জাতির মনের কথা এতে ব্যক্ত হয়েছে কিনা বলা নিরাপদ নয়, কিন্তু যা কিছু সংস্কার এবং প্রবণতা বা প্রবৃত্তি সে পথে তো মানুষ বহুদিন চলে দেখেছে। অনেক রকম পরীক্ষার ভিতর দিয়েই আজকের সভ্যতা গড়ে উঠেছে, আবার ফিরে

যাবার শখ কেন? সংসারে প্রবল দুর্বলকে মারে—উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের এটি বৈশিষ্ট্য। এ সব দেখেশুনে 'জোর যার মুল্লুক তার' এ কথাও মানুষ প্রচার করেছে একদিন। কিন্তু সেই মানুষই অনেক বিবেচনা ক'রে এই সব প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করেছে। যারা আহায সংগ্রহ করতে পারে না, বিকলাঙ্গ বা দুর্বল, সবলেরা প্রকৃতির রীতি অনুসরণ ক'রে এখন আর তাদের মেরে ফেলে না, তাকে আহার্যের ভাগ দিয়ে সবল করতে চেষ্টা করে, বিকলাঙ্গকে চিকিৎসা ক'রে সুস্থ করার চেষ্টা করে। অন্যান্য প্রাণী থেকে বা পশু থেকে মানুষ এইখানেই তফাত। সকল দিকেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেই তবে আজকের মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে আবিষ্কাব করেছে। বিয়ের ব্যাপারেও তাই। আদর্শ থেকে বার বার মানুষ ভ্রষ্ট হয়, কিন্তু তার জন্য লজ্জিতও হয়। আইন ক'রে লজ্জা ভেঙে দেওয়া কি আর এখন চলে? ৩২৮

কিংবা হয়তো মানুষ আবার নিজ নিজ প্রবৃত্তিকে উচ্চাসন দিয়ে আর এক বর্বর যুগের প্রতিষ্ঠা করবে এ তার পূর্বাভাস মাত্র। হয়তো কয়েকজন প্রবল রাষ্ট্রনীতিক যদি এখন বহু বিবাহ মনোহর মনে করেন, তবে তাই চলবে পৃথিবীব সর্বত্র। মানুষের জীবন পবিত্র, বিশ্বাস করছিলাম এতদিন, sanctity of life কথাটা মুখস্থও হয়ে গেছে, কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে তা নয়। কারণ কয়েকজন রাষ্ট্রনীতিক মানুষের জীবন পবিত্র, এ কথা বিশ্বাস করছেন না আব। তাই পবমাণু বোমার আবির্ভাব ঘটেছে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশু নারী পুরুষ একটি মাত্র বোমার আঘাতে পুড়ে ছাই হযে যায।—এরকম একটি কল্পনাতীতরূপে ভয়াবহ অস্ত্র মনুষ্যত্বের কোনো দিকের বিচারেই সমর্থন করা যায় না, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এর ভয়াবহতায় চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রবল মানুষের কাছে আজ যখন মানুষের জীবনের পবিত্রতার চেয়ে সেই পরমাণু বোমার পবিত্রতাই বড় মনে হয়েছে, তখন তাঁদের কথাই মানতে হবে। নাগাসাকি হিরোশিমায় ব্যাপক নরহত্যা করেও এখনও যখন পরমাণু বোমার নতুন সংস্করণ বেবোচ্ছে তখন তো আর বলবার কিছু নেই। ৩২৯,১৮-৪-৫৪

চাপাটি-মাখনের জন্য স্ত্রী চাই

রাজকোটের খিমা গোকুল নামক এক একশ কুড়ি বছরের বুড়ো চাষী বিয়েব কনে খুঁজছে। নরম চাপাটি এবং 'চুড়া' মাখন তৈরি করতে পারে এমন একজন স্ত্রী দরকার তার।' তার আগের দুটি স্ত্রী ও পাঁচটি ছেলে মারা গেছে, দ্বিতীয় স্ত্রীর

একমাত্র ছেলে বেঁচে আছে, তার বয়স ষাট। কিন্তু একশ কুড়ি বছরের বুড়ো, চাপাটি খাওয়ার ক্ষমতা অব্যাহত রাখলেও, তার কাছাকাছি বয়সের কোনো স্ত্রীলোক চাপাটি তৈরি করতে পারবে কি না সন্দেহ। তাই বয়সের সঙ্গে মানানসই পাত্রী পেলেও দুজনের বয়সের ব্যবধান থাকবে ষাট কিংবা সত্তর বছর। অর্থাৎ পঞ্চাশ বা ষাট বছরের বেশি বয়সের কনে সে পাবে না বলেই মনে হয় ৩৩০

কিন্তু শুধু নরম চাপাটি ও মাখন তৈরির জন্য পাত্রী খোঁজা কি একটু বাড়াবাড়ি নয়? সংসারে অবশ্য অধিকাংশ বিয়েই তাই—রান্নার লোক শস্তায় সংগ্রহ করা। হয় তো অঙ্কের হিসাবে ঠিক তা নয়, চাপাটি ও স্নেহ পদার্থের সঙ্গে একটু স্নেহ, একটু মমতাও চাই। এটি দরকার। কিন্তু ঐ বুড়ো ষাট বা সত্তর বছরের যে কুমারীকে ধরে আনবে, তার মনে এক অতিবৃদ্ধের প্রতি সেই বাঞ্ছিত স্নেহমমতা জন্মাবে কি? জীবনসঙ্গীর পায়ে যৌবনের সমস্ত রাগ নিঃশেষ ক'রে দেবার পর চাপাটি তৈরির যে অভ্যাসটুকু সাধারণত বৃদ্ধা স্ত্রীর জীবনে অবশিষ্ট থাকে, হঠাৎ এক শ্মশানসঙ্গীর জন্য সে অভ্যাস নতুন ক'রে করা যাবে কি? ৩৩১

যাবে না। মাইনে নেওয়া পরিচারিকার চেয়ে সে কোনো অংশেই বেশি অনুগত হতে পারে না। উক্ত বুড়োর ব্যক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করলে সবাই একথা স্বীকার করবে। অর্থাৎ বিয়ে ক'রে বুড়ো যা চায় তা পাবে না। চাপাটিও নরম হবে না, মনের মতো মাখনও উঠবে না। আর তার অব্যক্ত উদ্দেশ্য যদি হয় শস্তায় পাচিকা সংগ্রহ, তা হ'লেও প্রস্তাব খুব লাভজনক নয়। পছন্দ না হলে পাচিকা ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, একে আর ছাড়ানো যাবে না। 'শক' পেয়ে বুড়ো অকালে মারা পড়বে। ৩৩২

কাঁচ-ভাঙা রহস্য

যুক্তরাষ্ট্রের পূব উপকূলে নতুন এক রহস্য দেখা দিয়েছে। এই অঞ্চলের হাজার হাজার মোটর গাড়ির কাঁচের আবরণ অজ্ঞাত কারণে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। তিন সপ্তাহ ধ'রে চলেছে এই কাঁচ ভাঙার কাজ। অনুমান করা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় ছাই কাঁচের সংস্পর্শে এসে এই কাজ করছে। এ ছাই অন্য কোনো কাঁচ ভাঙছে কি না জানা যায়নি। শুধু নন্‌-ব্রেকেব্‌ল্‌ কাঁচ ভাঙছে। ১৯৪৫-এর হিরোশিমা আর ১৯৫৪-এর হাইড্রোজেন—কি অদ্ভুত বিবর্তন! শুধু ৪৫ উল্টে ৫৪ হয়েছে। এতেই পৃথিবী উল্টে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। সামরিক হীরোদের নির্মমতার সীমারেখা ঐ হিরোশিমা পর্যন্তই টানা উচিত ছিল। ৩৩৩

তেজস্ক্রিয় ছাইয়ে আকাশ ছেয়ে গেছে। সে ছাই বিমানের পাখায় ভর ক'রে দেশ-বিদেশ ঘুরছে, অ্যামেরিকার মোটরে উঠে কাঁচ ভাঙছে, বহু লোকের বাড়া-ভাতে পড়ছে উড়ে। বিজ্ঞানীরা প্রাচীন নীতিবাক্য অনুসরণ ক'রে যেখানে ছাই দেখছেন সেখানেই ছুটে গিয়ে উল্টে পাল্টে দেখছেন রত্ন মেলে কি না। ৩৩৪

একটি ভবিষ্যদ্বাণী

ইতিপূর্বে পণ্ডিচেরি থেকে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা মনে আছে তো? ১৯৫৭ সনে ভারত পাকিস্থান আবার এক হবে। একশ বছব আগে ১৮৫৭তে হয়েছিল এক বিদ্রোহ, একশ বছর পরে ১৯৫৭তে হবে আর এক বিদ্রোহ। কিন্তু কোথায়? যেখানেই হোক দুই রাষ্ট্র এক হবে। এই এক হওয়াব দুটো অর্থ হ'তে পাবে, হয় ভারত পাকিস্থানে যাবে, আর না হয় পাকিস্থান ভারতে আসবে। কিন্তু যাই হোক, যে পক্ষই যেখানে আসুক, এটি রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য নয়, পরমাণু বোমাজনিত ঐক্য। কারণ, যুদ্ধ বাধলে মার্কিনবা যেমন রুশদেশে পবমাণু বোমা ফেলবে, তেমনি পাক-মার্কিন জোট ভাঙতে রাশিয়াও পাকিস্থানে পরমাণু বোমা ফেলবে। আর তা যদি হয়, তখন রুশ পরমাণু কি আর বাউণ্ডারি কমিশনের রায় মানবে, না পাসপোর্ট-ভিসার অপেক্ষায় ব'সে থাকবে? সব একাকার হয়ে যাবে। ৩৩৫

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী আরও পরিষ্কাব। তিনি মুসলিম লীগকে উদ্দেশ ক'রেই বলেছিলেন (তা আবও পবিষ্কাব করা গেল এইভাবে)—

দেখিতে না পাও তুমি
রাশা ঐ দাঁড়ায়েছে দ্বারে।
অভিশাপ আঁকি দিল
তোমার 'দ্বিজাতি' অহঙ্কারে।
ভারতে না যদি ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ
চৌদিকে জড়ায়ে 'মেরিকান,
মৃত্যুমাঝে হবে তবে
চিতাভস্মে সবার সমান।

১৯৫৭-তে এইটেই ঘটবে ব'লে আশঙ্কা হয়। অর্থাৎ তোমরাও মরবে, আমরাও

মরব। এবং ঠিক ১৯৫৭-তেই হাওড়া থেকে দ্রুতগ্রামী ইলেকট্রিক ট্রেন চলাচল শুরু হবে। যোগাযোগটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। ৩৩৬

যাই হোক, কাশ্মীর সম্পর্কে এতদিনে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন আর কেউ তার ভারতভুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারবে না, কারণ খবর এসে গেছে—সেখানে সম্প্রতি ডিগ্রী পরীক্ষার সময় বহু পরীক্ষার্থী সিলেবাসের বাইরের প্রশ্ন আসাতে প্রতিবাদস্বরূপ পরীক্ষা-গৃহ ত্যাগ করেছে। খুব ভাল খবর। ভারতীয় ছাত্র এবং কাশ্মীরের ছাত্র অন্তরে অন্তরে এক হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় প্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে কাশ্মীরের প্রশ্নকর্তারাও একাত্মা হয়েছেন। শুধু প্রশ্নপত্রে ছাপার ভুল সেখানে কি পরিমাণ হয়েছে জানা যায়নি। ৩৩৭

বৈদ্যুতিক নাচ

মর্দানের খবর—এক কৃষক অশ্বতরের পিঠে ক্ষেতের ফসল চাপিয়ে হাটে গিয়েছিল বেচতে। অশ্বতরটিকে সে এক পোলের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল, সেই পোলের সঙ্গে বিদ্যুতের তার। হাট শেষে ফিরে এসে সে দেখে পশুটি পোলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নড়ে না। তখন সে তার লেজ ধরে টানতে যায়, কিন্তু তাতে সে নিজেও তার সঙ্গে আটকে যায়। তারপর যত লোক আসে ওদের ছাড়াতে তারা সবাই একে একে আটকে যায় এবং সবাই মিলে (অশ্বতর বাদে) চিৎকার ক'রে নাচতে থাকে। অবশেষে এক বুদ্ধিমান হাটুরে আবিষ্কার করে, ছোট ছেলেদের ব্যবহার্য এক ধাতুনির্মিত কোমরবেষ্টনী তারের সঙ্গে ঝুলে পোলের গায়ে বিদ্যুতের যোগাযোগ ঘটিয়েছে। ৩৩৮

আমাদের অ্যাসেম্বলি গৃহে এই রকম একটি শর্ট সার্কিটের অপেরা দেখতে ইচ্ছা করে। তুমুল তর্কের সময় বামপন্থী দক্ষিণপন্থী সবাই পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় নাচছেন! কিন্তু মেমবাররা যে ধাতুতে গড়া, তাতে তাঁদের দেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলাচল করবে কি? ৩৩৯

আগুনের বদলে বরফ

পম্পেই গ্রাসকারী ভেসুভিয়াস ও কাটানিয়া গ্রাসকারী এটনা—এই দুই আগ্নেয়গিরির অহঙ্কার চূর্ণ হল অবশেষে। তাদের ধারণা ছিল বড় বড় জনপদ বা শহর, গলিত লাভা প্রবাহে ঢেকে দিয়ে ব্যাপক ধ্বংস সৃষ্টিতে তারাই হচ্ছে

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় আগ্নেয়শক্তি। কিন্তু পরমাণু বোমার রিপোর্ট প'ড়ে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারা হিংসা ও ঈর্ষার আগুনে জ্বলে উঠছিল মুহুর্মুহু। কিন্তু নিস্ফল ঈর্ষা। ওদের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল। তারপর গত ১৭ই এপ্রিল ভোরবেলা ঐ দুই আগ্নেয়গিরির নিকটস্থ লোকেরা অবাক হয়ে দেখতে পেল—ভেসুভিয়াস ও এটনার মাথায় কে বরফ চাপিয়ে দিয়েছে। এ কাজ যিনিই ক'রে থাকুন তাঁকে ধন্যবাদ, কারণ এ ভিন্ন ওদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার আর কোনো উপায় ছিল না। ৩৪০,২৫-৪-৫৪

ভিক্ষায় লক্ষী লাভ

মাদ্রাজে এক চোদ্দ বছরের অভিজ্ঞ ভিখারীকে ধ'রে এনে ভিক্ষুক আশ্রমে রাখা হয়। সেখানে সে বিনা খরচে থাকতে পারবে এই সুবিধা আছে। কিন্তু এটি তার পছন্দ না হওয়াতে সে অনশন আরম্ভ করেছে। তার দাবী হচ্ছে—আশ্রম থেকে ছেড়ে দিয়ে তাকে আবার স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে দেওয়া হোক। গত ১৫ই এপ্রিল থেকে সে অনশন শুরু করেছে এবং এই খবরটি এসেছে তার পাঁচদিন পরে। এতদিনে সম্ভবতঃ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ সমস্যাটা তার একান্তই ব্যক্তিগত নয়, এর সঙ্গে তার আত্মীয়-স্বজনের সমস্যাও জড়িত আছে। সে ভিক্ষা ক'রে তাদের কাছে নিয়মিত মনিঅর্ডার পাঠাত। ৩৪১

ভিক্ষা আমাদের দেশের বনেদি ব্যবসা। এই ব্যবসা এখন সরকার থেকে রীতিমতো অনুমোদিত হওয়া উচিত, তাতে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি বহুবিধ বিভাগের বহু ঘাটতি পুরণ হ'তে পারবে। প্রথমত বর্তমানে যত ভিখারী আছে এবং ভবিষ্যতে যারা এ পথে আসবে তাদের একটা লাইসেন্স ফী ধরতে হবে, নামমাত্র লাইসেন্স ফী, মনে হয় দশ টাকা করলে কোনো ভিখারীর আপত্তি হবে না। দেশে কম করেও দশ লক্ষ ভিখারী আছে। শুধু লাইসেন্স ফীতে সরকারের আয় হবে বছরে এক কোটি টাকা। উপরন্তু ইনকাম ট্যাক্স পাওয়া যাবে অন্ততএক লক্ষ ভিখারীর কাছ থেকে। ৩৪২

বিলেতের এক সাংবাদিক, জীবনের নানা বিভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ ক'রে সে সম্পর্কে রচনা লিখতেন। একবার ভিখারীর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি নিজে ভিখারী সাজেন। তারপর আর তাঁর রচনা লিখতে হয়নি, কারণ এই ব্যবসাতে তাঁর সবচেয়ে বেশি উপার্জন হ'ত। এরই উপর ভিত্তি ক'রে

ডিটেকটিভ গল্প লিখেছিলেন কোনান ডয়েল। এদেশেও হয়তো অনেক সাংবাদিক বর্তমানে এ কাজ করছেন। কিন্তু এই ব্যবসা আমাদের দেশে যেভাবে শেখানো হয় তা অবৈজ্ঞানিক এবং ঘৃণ্য। সাধারণ মেক-আপ করলে যেখানে কুষ্ঠ, অন্ধতা, খঞ্জতা প্রভৃতি ফুটিয়ে তোলা যায়, সেখানে ভিখারী-ব্যবসায়ে দীক্ষা দেওয়া হয় সত্য সত্যই অনেকের হাত-পা ভেঙে অথবা চোখ কানা ক'রে। এটি বর্বরতা। এই ভিখারী স্কুলগুলি এখন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত এবং সেখানে ভাল পরিবেশে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ৩৪৩

তীর্থক্ষেত্রগুলি তো এক একটি পৃথক ভিখারী বিশ্ববিদ্যালয় হবার উপযুক্ত। কাশী একটি বড় ভিখারী কেন্দ্র। সেখানে ভিখারীরা সকালে লুচি, তরকারী, হালুয়া, চা ইত্যাদি খেয়ে ভিক্ষায় বেরোয়। যাত্রার পূর্বে পোষাক বদলে নেয়। কিন্তু এই প্রতারণার দরকার কি? ভিক্ষা দিলে পুণ্য হয়, এই নীতিতে ভিক্ষার হাত প্রসারিত দেখলেই পুণ্যার্থী ভিক্ষা দেবে, পাত্রাপাত্র দেখবার কথা নয় তার। পাত্রাপাত্র দেখে ভিক্ষা দিলে প্রত্যেক ভিখারীর পিছনে ডিটেকটিভ লাগাতে হয়। আর তাতেও শেষ মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই পুণ্যার্থীকে ওসব কিছু না ভেবেই ভিক্ষা দিতে হয়। পুণ্য তার হবেই, যাকেই দিক। সুতরাং ভিখারীদের পৃথক করুণা উদ্রেকের জন্য বিকলাঙ্গ হওয়া বা নোংরা পোষাকে থাকার দরকারই নেই। সরকার থেকে ইস্তাহারের সাহায্যে, লাউডস্পীকারের সাহায্যে এই শিক্ষা প্রচার করা উচিত সবার মধ্যে। ৩৪৪

ভিখারীদের এতে কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই এবং হাত পাতলেই যে-কোনা লোককে ভিক্ষা দিতে হবে এ শিক্ষা প্রচার হ'লে অনেক দুর্ভোগের হাত থেকে তারা বেঁচে যাবে। এই অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে কত অন্ধ চোখ খুলবে, কত পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করবে এবং ভিক্ষার ক্ষেত্র এমন বিস্তার লাভ করবে যে এটি তখন সবচেয়ে অনেস্ট প্রোফেশনে পরিণত হবে। প্রসারিত হাতে ভিক্ষা দাও, এই নীতি চালু হলে মোটরচালক মোড় ঘোরবার সময় যখন ট্র্যাফিক আইন অনুযায়ী হাত বার ক'রে, তখন সে হাতে ভিক্ষা দিতে হবে, রাত্রে মৃদু বৃষ্টির সময় অনেকে ট্রাম-বাস থেকে বাইরে হাত বের করে দেখে বৃষ্টি থেমেছে কি না, সে হাতেও ভিক্ষা দিতে হবে। ট্র্যাফিক পুলিসের প্রসারিত হাতে ভিক্ষা দিতে হবে, ঘুষের জন্য যে হাত প্রসারিত হয় তাতেও ভিক্ষা দিতে হবে। পুণ্য একই, কোনো তফাত নেই। ৩৪৫

এতদিন পুণ্যার্থী ও ভিখারীর সম্পর্কের মধ্যে যে কনভেনশন চলে আসছে সেটাকে সম্পূর্ণ উল্টো করতে হবে, অর্থাৎ এখন থেকে ভিক্ষাদাতা পুণ্যার্থীই চোখ বুজবে এবং ভিখারী চোখ খুলে রাখবে, তাকে আর চোখ বুজতে হবে না। ভিক্ষা দেওয়ার সময় চোখ বুজলে কাকে ভিক্ষা দিচ্ছি এ সন্দেহ মনে আসবে না, পুণ্য বেশি হবে তাতে। ৩৪৬

গলায় দড়ি

অ্যামেরিকার এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীব নামে উইল ক'রে গেছেন দু' ডলার। উইলের নির্দেশ—এই টাকা দিয়ে স্ত্রী যেন মজবুত একগাছা দড়ি কিনে সেটি গলায় জড়িয়ে ঝুলে পড়েন। স্ত্রী সারা জীবন স্বামীকে দ'গ্ধে মেরেছেন তারই শাস্তিস্বরূপ এই ব্যবস্থা। উইলে ছেলের প্রতি নির্দেশ আছে—তার মা মারা গেলে তাঁকে যেন তাঁর নিজের কবর থেকে অনেক দূবে সমাহিত করা হয়। ৩৭৭

স্ত্রী ঐ উইলের টাকা অবশ্যই নেবেন না, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যই অপেক্ষা করবেন এবং তখন তাঁর মৃতদেহ যত দূরেই সমাহিত কবা হোক, মৃত্যুর পর দুজনেরই আত্মা যদি খাঁচাছাড়া হয় তখন স্ত্রীর হাত থেকে স্বামী বাঁচবেন কি করে? স্বামীর মৃতদেহ স্ত্রীর মৃতদেহের উপব বাগ করলেই কি আর দাম্পত্য কলহ এড়ানো যাবে? ৩৪৮

স্ত্রী হয়তো স্বামীকে বড়ই জ্বালিয়েছেন এবং সেজন্য অবশ্যই পাপ করেছেন। অতএব তাঁর আত্মা নরকে যাবে। কিন্তু স্বামী অপমানসূচক উইল কবে যে পাপ কবলেন, তাতে তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তির গ্যারাণ্টা দিচ্ছে কে? তাঁকেও নরকে যেতে হবে এবং ঐ স্ত্রীর হাতেই পড়তে হবে। আত্মার গতিবিধি তো আব উইল ক'বে ঠেকানো যায় না—ডিভাইন উইলে সেখানে সব একাকার। ৩৪৯

লাহোরের সাম্প্রতিক খবর, সেখানে মিথ্যা কথার একটি প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ত্রিশ, কুড়ি ও দশ টাকার তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে প্রতিযোগীদের। বিষয় Tell a lie as best as you can and get a prize. এটি সর্ব-পাকিস্থানী প্রতিযোগিতা, সহজ ইংরেজীতে একশত শব্দের মধ্যে মিথ্যা বানাতে হবে। বিচার কমিটিতে সাতজন ব্যক্তি আছেন। একজন জজ, একজন মোল্লা, একজন চিকিৎসক, একজন আইনজীবী, একজন এঞ্জিনিয়ার, একজন শিক্ষক ও একজন সাংবাদিক। ৩৫০

একজন সাংবাদিক আছেন এটি সুবুদ্ধির পরিচায়ক, কারণ সাংবাদিকেরা নাকি মিথ্যাভাষণে পৃথিবীতে সবার উপরে যান। কাজেই ছোট মিথ্যা, মাঝারি মিথ্যা, যাতে বড় মিথ্যার নামে প্রাইজ পেয়ে না বসে, তা তাঁরা সহজে ধরতে পারবেন। কিন্তু পাকিস্থানে এ সময় এমন একটি প্রতিযোগিতা দরকার হল কেন ভাববার কথা। রাষ্ট্রনীতিকেরা কি এখন সমাজের লোকদের মধ্যেও মিথ্যা বিস্তার করতে চান?

৩৫১, ২-৫-৫৪

পরীক্ষা ও লড়াই

পরীক্ষা-কেন্দ্রে যুবক ও ইনভিজিলেটরে ধস্তাধস্তির একটি শ্রুতিমধুর খবর বেরিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার স্কুল ফাইনালের কোনো কেন্দ্রে। পরীক্ষা-হলের প্রহরীরা দেখতে পান বাইরে থেকে একটি যুবক প্রাচীর টপকে ভিতরে এসে তার পরীক্ষার্থী বন্ধুকে প্রশ্নের উত্তর ঠিক ক'রে দিতে সাহায্য করছে। তখন প্রহরী উক্ত যুবককে ধ'রে ফেলতে গেলে উভয় পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়। যুবকটি প্রমাণ, গোপন মানসে প্রশ্ন গিলে ফেলে, কিন্তু তাকে পুলিসে দেওয়া হয়। পুলিস অফিসাররা সকল কেন্দ্রেই টহল দিয়ে ফিরেছেন এবারে। তাঁরা এবারে বিপদ নিবারণে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। ৩৫২

পরীক্ষার ব্যাপারে অনেক কথাই মনে পড়ে। আমরা যখন প্রথম পরীক্ষা দিই, সে অনেককাল আগের কথা। মফঃসলের অভিজ্ঞতা। সেখানে অন্তত তখন পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল উপাসনা মন্দির। শান্ত পরিবেশ। আমরা যেন নীরব উপাসক। নকল করা বা অন্য কোনো অসাধু উপায় তখন আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তারপর ক্রমে যেন সব বদলে গেল। কলকাতা শহরে প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষার সময় এই লেখকেরই হ'ল এক অভিনব অভিজ্ঞতা। পরীক্ষা-হলকে মনে হল মেছোবাজার। খুবই ভাল লাগল। যার যেমন খুশি আলোচনা চলছে। প্রহরীরা হাসিমুখে সবার সাহায্য ক'রে বেড়াচ্ছেন। কোনো বিরোধিতা নেই, কোনো তিক্ততা নেই, প্রহরীরা সবাই জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ছ-সাত সীট দূরের ছেলে জোড়-হাতে চেঁচিয়ে বলছে, দাদা, পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা একটু সাহায্য করুন। যাকে বলছে সে কাগজে নোট লিখে প্রহরীর হাতে দিয়ে দিচ্ছে, তিনি তা যথাস্থানে পৌঁছে দিচ্ছেন। সহযোগিতা তখন ছিল এমনি আন্তরিক। কারো ক্ষতি হয়নি। না বিশ্ববিদ্যালয়ের না পরীক্ষার্থীর, না প্রহরীর। আমারই মতো মফঃসল থেকে আসা এক পরীক্ষার্থী প্রথমদিন পরীক্ষা দিয়েই বলেছিল, কলকাতায় পরীক্ষা দেওয়ায় তো বড় সুখ, দাদা। ৩৫৩

পরীক্ষার মূল নীতি এতে রক্ষিত হ'ত। ছেলেদের উদ্দেশ্য পাস করা এবং পর্ষৎ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য পরীক্ষার ফী আদায় করা। কিছু শিক্ষার পরিচয় নেওয়াও অবশ্য একটা উদ্দেশ্য। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, শিক্ষার মান আগের তুলনায় কিছুমাত্র উন্নত হয়নি, বরঞ্চ বিশেষজ্ঞরা বলেন, আরও নেমে গেছে। নেমে যাওয়ার কারণ সাম্প্রতিক অসহযোগিতা। পরীক্ষা-গৃহে প্রহরীর যত কড়াকড়ি হচ্ছে, শিক্ষার মান তত নিচু হচ্ছে। ৩৫৪

কলকাতায় যখন সবাই মিলে আলোচনা ক'রে পরীক্ষার প্রশ্ন লেখার রীতি ছিল তখন প্রত্যেকেই অন্তত বিষয়গুলি আংশিকভাবে শিখত এবং মনে রাখত। পাঁচ-জনের পাঁচ অংশ মিলে সবটা পুরো হ'ত। কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষা-গৃহে আলোচনা নিষিদ্ধ হওয়াতে লুকিয়ে নোট লিখে নেওয়া ভিন্ন তো আর কোনো উপায় নেই। এই প্রথা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ এখন আর আংশিকভাবেও কিছু শিখতে হয় না, মগজ একেবারে ফ্রেশ থাকে। পরীক্ষা গ্রহণে কোন্ প্রথা ভাল, সহজেই বোঝা যাবে এ থেকে। ৩৫৫

কিন্তু শুধু পরীক্ষার রীতি বদলই তো নয়, শুধু মান নষ্ট হওয়াই তো নয়, প্রাণ নষ্ট হবার ভয় যে দিনে দিনে বাড়ছে। এবারের স্কুল ফাইনালে পুলিস অফিসারেরা টহল দিয়েছেন, পর বৎসর মিলিটারি বসবে পরীক্ষা-গৃহে। মেশীন গান্ বসবে পরীক্ষার্থীর মাথা লক্ষ্য ক'রে। কত নির্ভীক পরীক্ষার্থী বা তার সহকারী শহীদ হবে। কেউ কেউ হয় তো বোমা বা হ্যাণ্ড-গ্রেনেড নিয়ে যাবে পাল্টা আক্রমণের জন্য। এর পর বছরেই নৌবহর, বিমান-বহর এবং পদাতিক সৈন্যবহর মোবিলাইজ করতে হবে। শিক্ষার মান বাঁচবে না, কিন্তু পরীক্ষার মান বাঁচবে। কিন্তু সত্যই বাঁচবে কি? ৩৫৬

এ পথের শেষ নেই, মীমাংসাও নেই এতে। তাই আমি কিছুদিন পূর্বে (ইতশ্চেতঃ, ১৪-৩-৫৪) বলেছিলাম পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি ক'রে তা আগে পরীক্ষার্থী-ছাত্রদল-গঠিত কোনো সিলেকশন কমিটির হাতে দেওয়া হোক। কর্তৃপক্ষ আমার সে কথা রাখেননি। তাই ছেলেরা ছাপা-প্রশ্নই বা'র ক'রে এনেছে পরীক্ষার আগে। লুকিয়ে জামার পকেটে নোট নিয়ে তা থেকে টুকে পরীক্ষা দেওয়ার চেয়ে এটি অনেক ভাল। কারণ এতে প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে শিখে নিয়ে খাতায় লিখতে পারবে। শেখাটা

নির্দিষ্ট প্রশ্নের সঙ্কীর্ণ সীমানায় থাকলেও তবু তো শেখা। নেই শেখার চেয়ে কানা শেখা ভাল। তবু প্রশ্ন জানা সত্ত্বেও যে ছেলে তার উত্তর কি হবে শিখে উঠতে পারেনি, উত্তর টুকে নিয়ে গেছে পকেটে ক'রে এবং পরীক্ষা-গৃহে তা থেকে নকল করেছে, তার কোনো আশা নেই। ৩৫৭

তবে আশা এই আছে যে, অতঃপর সকল পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন পরীক্ষার্থীর হাতে এসে পৌঁছনর একটা পথ খুলে যাবে। যদি আশা নিতান্তই দুরাশা হয়, যদি সাধারণ ইনভিজিলেটরের স্থানে সশস্ত্র প্রহরী আনতে হয়, এবং আর্মি, নেভি এবং এয়ার ফোর্স মোবিলাইজ করতে হয়, তা হ'লে পরীক্ষার্থীদের উচিত হবে বাংলা প্রদেশ ছেড়ে উত্তর প্রদেশে যাওয়া। সেখানে অনেক সুবিধা। সেখানে পরীক্ষা-গৃহে প্রশ্নের উত্তর ব্ল্যাক-বোর্ডে লিখে দেওয়া হয় সেখানে বই ও ছোরা নিয়ে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়, বাইরের লোককে ভিতরে এসে উত্তর লেখায় সাহায্য করতে দেওয়া হয়, প্রয়োজনবোধে ইনভিজিলেটরকে নকলে সাহায্য করতে বাধ্য করা চলে। এত সুবিধা। ৩৫৮

সুবিধা আরও এই জন্য যে, ঐ প্রদেশের নামই 'উত্তর' প্রদেশ। বাংলা প্রদেশে এত সুবিধা নেই, কারণ এটি মূলতঃ একটি 'প্রশ্ন' প্রদেশ। অর্থাৎ প্রবলেম প্রভিন্স। এখানে কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই। এখানে জীবনের সকল বিভাগে শুধুই প্রশ্ন। তাই পরীক্ষার্থীরা এখানে পরীক্ষা দিতে ব'সে মন থেকে কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। ৩৫৯

ছাত্রদের মনে কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই, এটি এখন প্রায় সর্বভারতীয় সমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে স্থির ক'রে নিয়েছে। মোট কথা পাস করতেই হবে, কেননা শিক্ষার চেয়ে পাস বড় এবং পাসের চেয়ে চাকরি বড়। এই সব পাস করা ছেলেরাই যখন চাকুরিপ্রার্থী হয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে সাধারণ জ্ঞানের অগ্নি-পরীক্ষায় নামে, তখন তারা প্রশ্নের যে সব উত্তর দেয় তা সংবাদ হিসাবে খবরের কাগজে ছাপা হয়। উত্তরগুলো উদ্ভট হয় এবং এটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তারা ঐ একটি মাত্র জায়গায় সত্য পরীক্ষা দেবে কেন? পরীক্ষা দেওয়ায় বেঙ্গল সিস্টেম বা ইউ-পি সিস্টেম, সুবিধা-মতো এর এর যে-কোনো একটি সিস্টেমের অধীন পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেই তো হয়। এখানেও প্রশ্ন আগে জেনে নিয়ে অথবা ছোরা বা বোমা নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ায় বাধাটা কোথায়? ৩৬০, ২-৫-৫৪

কেন লিখিনি

গত রবিবার 'এককলমী' ইতস্ততঃ লিখতে পারেনি। সেজন্য 'এককলমী' বিশেষ দুঃখিত। ৩৬১

'এককলমী' একটি নির্ব্যক্তিক নাম হ'লেও তার একটি ব্যক্তিসত্তা আছে, তার একটি পার্থিব দেহ আছে যার উপর পঞ্চভূতের ক্রিয়া চলছে জন্মকাল থেকে। একদিকে এই পঞ্চভূত, আর একদিকে ব্যক্তি-দেহ, সেও আবার ঐ পঞ্চভূতেই গড়া। এই ব্যক্তিটি বাইরের পঞ্চভূত থেকে পুষ্টির উপযোগী সব উপাদান আহরণ ক'রে ক'রে বেঁচে থাকতে চায়, আর পঞ্চভূত চেষ্টা করে—ঐ ব্যক্তিটিকে নিজের দলে টেনে পঞ্চভূতে মিশিয়ে নিতে। আসলে দেহটি ষড়ভূতে গঠিত, মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে মিশে গেলে ষষ্ঠ ভূতটি মুক্ত হয়ে পুরনো ভাঙা বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ৩৬২

মানুষের দেহ পঞ্চভূত খেয়ে বেঁচে থাকে। এর মধ্যেকার সব ভূতই অবশ্য মৌখিক খাদ্য নয়। নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে এবং ত্বক দিয়েও আমরা খেয়ে থাকি। আর পঞ্চভূত মানুষের দেহ ভক্ষণের জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব। পঞ্চভূতের সঙ্গে মানুষের এই যে দ্বন্দ্ব—এতে মানুষের দেহ মাঝে মাঝে অপটু হয়ে পড়ে, পঞ্চভূত সেই ফাঁকে তাকে শেষ ক'রে ফেলতে চায়, যদিও তারা ধর্মযুদ্ধে বিশ্বাসী হওয়াতে অন্যায়ভাবে কিছু করে না, প্রতিপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অযথা তার ক্ষতি করে না, যথেষ্ট সুযোগ দেয় আত্মরক্ষার। ৩৬৩

'এককলমী'র এই রকম একটা দুর্বল মুহূর্ত এসেছিল। তবে অসতর্কতার জন্যই হোক বা অজ্ঞতার জন্যই হোক, পঞ্চভূত যে তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তা সে আগে বুঝতে পারেনি। এখন সে বুঝতে পারছে ঘণ্টা বেজেছিল ঠিকই, শুধু তা তার মর্মে প্রবেশ করেনি। তাই আক্রমণটা তার কাছে হঠাৎ-আক্রমণ মনে হয়েছে। রাত তখন দুটো। হঠাৎ তার শ্বাসরোধ হয়ে এলো, পঞ্চভূতের প্রধান ভূতটি তার গলা চেপে ধরল তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে, দম বন্ধ হয়ে এলো, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'ল, চোখে সব অন্ধকার হয়ে এলো (ঘরে আলো থাকা সত্ত্বেও), কথা বলবার ক্ষমতা লোপ পেল, সমস্ত দেহ হিমশীতল ঘর্মস্নাত। তারপর, হঠাৎ যেমন মৃত্যুর স্পর্শ লাগল, তেমনি হঠাৎ হৃৎপিণ্ড আবার চলতে আরম্ভ করল, আবার আলো ফুটল চোখে। এ অবস্থায় সব মানুষই যা ক'রে থাকে—সেই রাত প্রায় আড়াইটের সময়

নিকটের, দূরের, পরিচিত, অপরিচিত, সব ডাক্তারের শান্তিভঙ্গ—ইত্যাদি ইত্যাদি সবই হল। ৩৬৪

পঞ্চভূতের সঙ্গে এই যে যুদ্ধ এটি নিশ্চিত ধর্ম্মযুদ্ধ। মৃত্যুর মুহূর্তে 'এককলমী'র চকিতে একবার মনে হয়েছিল এ কেমন হ'ল, এর জন্য তো সে তৈরি ছিল না। পঞ্চভূতের কানে গিয়েছিল এ কথা। নইলে জীবন হরণ ক'রে আবার তারা তা ফিরিয়ে দিত না। 'এককলমী'র মনে প্রশ্ন জাগল, এই হৃদয়-দৌর্বল্য কেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই একই প্রশ্ন জেগেছিল এককালে। কিন্তু সে প্রশ্নের মীমাংসা ছিল ভিন্ন। 'এককলমী'র হৃদয় এত প্রশস্ত নয় যে তা নিজের চাপে নিজে বন্ধ হবে, এত সঙ্কীর্ণ নয় যে যে-কোনো উত্তেজনায় ফেটে যাবে। হৃদয়ের কথা সে বুঝবে কি ক'রে? রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। তিনি বলেছিলেন—

"আমি কান পেতে রই
আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে".. ৩৬৫

কিন্তু 'এককলমী' কবির মতো দীর্ঘ-গ্রীবও নয়, তাঁর মতো শ্রবণাতীত শ্রবণশক্তিও তার নেই। আপন হৃদয়ের দ্বারে কান পাতা তার পক্ষে অসম্ভব। ডাক্তার বলেন, যদি হৃদয়ের আপন ভাষা শুনতে চাও তো ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিওগ্রাফের সাহায্য নিতে হবে। সে সাহায্য 'এককলমী' নিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটি বড়ই অপমানজনক। আধ ডজন সম্ভ্রান্ত ডাক্তার এবং রোগীর সামনে 'এককলমী' খালি গায়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদের কেউ ডান পায়ে, কেউ বাঁ পায়ে, কেউ ডান হাতে, কেউ বাঁ হাতে বেষ্টনী বেঁধে একজোড়া ক'রে বিদ্যুতের তার লাগিয়ে দিলেন। একজন বুকের সঙ্গে সংযোগ ঘটালেন। এই ভাবে কোনো ভদ্রলোককে খামখা খালি গায়ে চিৎ ক'রে ফেলে তার চার হাত পা বেঁধে তারগুলো প্লাগে লাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে রীতিমতো একটা নিষ্ঠুরতা আছে। ডাক্তার মাত্রেই নিষ্ঠুর। ৩৬৬

ঘটনাটি ঘটেছিল ইসলামিয়া হসপিটালে। প্রাণের দায়ে সবই মানতে হয়। বৈদ্যুতিক চেয়ারে মারা আর বিদ্যুতের তার-বাঁধা হাতে-পায়ে ভদ্রলোকদের সামনে চিৎ করে ফেলে রাখার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এক সময়ে 'এককলমী'র মনে হয়েছিল সে সুদূর আফ্রিকার ক্যানিব্যালদের হাতে পড়েছে। ভয় হচ্ছিল ভেবে।

তার পরেই তার মনে হ'ল ক্যানিব্যাল হলেও তারা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটকে খায় না। ৩৬৭

এইভাবে হাত পা বেঁধে 'এককলমী'র হৃদয়ের ভাষা তারা যন্ত্রের সাহায্যে লিখিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে অন্য তিনজন ভদ্রলোকও খালি গা হয়েছেন। তাঁদেরও ঐ একই অবস্থা। সবাই সমান অসহায়। চারজন পরস্পর অপরিচিত ভদ্রলোক প্রায় গায়ে গায়ে লাগিয়ে পাশাপাশি বসে আছেন পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়। পরবর্তী আদেশ আরও সন্দেহজনক এবং জঘন্য। চারজন নগ্নদেহকে ঢুকতে হল এক অন্ধকার ঘরে। সবাই একে একে দাঁড়ালেন এক্স-রের সামনে। হৃদয় উদ্ঘাটিত ক'রে দেখা হল সবার, আবরণ রইল না কোথাযও। হৃদয় নিয়ে এমন খেলা 'এককলমী' ইতিপূর্বে আর দেখেনি। ৩৬৮

বাইরে এসে 'এককলমী' দেখল তার কার্ডিওগ্রাম। হৃদয়ের সমস্ত স্বীকারোক্তি। সম্মুখে প্রধান 'কন্‌ফেসর' ডাঃ বসু। 'এককলমী'র হৃদয় তার সমস্ত কথা লিখে দিয়েছে দীর্ঘ কাগজের স্কোলে। যে ভাষায় সে স্বীকারোক্তি লিখেছে 'এককলমী' সে ভাষা জানে না, ডাক্তার জানেন। এ অবস্থা আরও অপমানজনক। কবি হ'লে ঐ লিখন নিয়ে গান ধরতাম —

"দে পড়ে দে আমায় তোরা
কি কথা আজ লিখেছে সে।"

যদিও সে মিনতি বৃথা হত। ৩৬৯

কিন্তু যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে এই যে, 'এককলমী' ব্যক্তিটি কোনো আইডীয়া নয়, কল্পনা নয়। অতএব তার যেমন হাত-পা ভাঙতে পারে তেমনি হৃদয়ও ভাঙতে পারে। সুখের বিষয় হৃদয় ভাঙেনি, ডাক্তার বলেছেন। তিন হাত দীর্ঘ কাগজে হাজার কথা লেখা হয়েছে কার্ডিওগ্রাফে—তার একমাত্র অর্থ নাকি এই যে, হৃদয় অটুট আছে। তা হ'লে এত বাজে কথা বলেছে কেন তা হৃদয়ই জানে। 'এককলমী'র কৈফিয়ত হচ্ছে এই যে, সে অটুট হৃদয়ে আবার ফিরে এসেছে, যদিও হৃদয় ভাঙার মতো ঘটনা দেশে বিদেশে শত রকম ঘটছে। ৩৭০,৬-৬-৫৪

তপস্বী বিড়াল

সপ্তাহ তিনেক আগে কালিম্পং-এর একটি তপস্বী বিড়াল সম্পর্কে একটি খবর

বেরিয়েছিল। সেই বিড়ালের নাম বাঘা। তিনি নাকি কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন, নিরামিষ খান, পাত্রে আমিষের গন্ধ থাকলেও সে পাত্র তিনি স্পর্শ করেন না, অমাবস্যা পূর্ণিমায় নিশিপালন করেন। খবরে এ কথাটাও উল্লেখ ছিল যে, উক্ত তপস্বী স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতিকে একটা ইণ্টারভিউ দিয়েছেন। ৩৭১

খবরটি গত মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। তার পর থেকে অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি পরবর্তী খবরের জন্য। কিন্তু কোথায় খবর? এত বড় একটা জরুরি বিষয় সামান্য একটি রিপোর্টেই শেষ হয়ে গেল, এ বড়ই অন্যায়। তবে কি যাঁকে তপস্বী বিড়াল ব'লে প্রচার করা হ'ল, তিনি বিড়াল-তপস্বী? বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কথাটা নিশ্চিত জানা দরকার। এর উপর আমাদের অনেক কিছু নির্ভর করছে। ইনি হয় তো কোনো দেবতা, বিড়াল-অবতার রূপে দেখা দিয়েছেন বাংলার সীমান্ত প্রদেশে। এঁর কাছ থেকে বহু জিনিস জানতে ইচ্ছা করে। ইনি কোন্ পঞ্জিকামতে নিশিপালন করেন, জেনিভা বৈঠক সম্বন্ধে এঁর মত কি, পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্থানের উপনিবেশরূপে আর কতদিন থাকবে, আমাদের রাজ্য পুনর্গঠন আর কত দিন স্থগিত থাকবে, এই সব। সবচেয়ে ভাল হয় ইনি যদি রেডিওর জন্য একটি ইণ্টারভিউ দেন, তা হলে এঁর বাণী আমরা নিজ কানে শুনে কৃতার্থ হতে পারি। ৩৭২

ভেজাল-তত্ত্ব

উপযুক্ত ভেজাল বাজারে পাওয়া যায় না, গেলেও দেখা যাবে সেও ভেজালমিশ্রিত। অর্থাৎ সাপের চর্বিতে ব্যাঙের চর্বির ভেজাল, এবং ব্যাঙের চর্বিতে গরু মোষের চর্বির ভেজাল। অসাধু ব্যবসায়ীরা ধরাও পড়ছে ঠিক এই কারণে। কারণ ভেজাল হিসাবে যে জিনিসই তারা মেশাবে, সেই জিনিসটিই ভেজালমিশ্রিত। চায়ের সঙ্গে মেশানোর জন্য যদি চামড়ার টুকরো উৎকৃষ্ট মনে হয়, তবে যে চামড়ার টুকরো সরবরাহ করে, সেই বা সততা দেখিয়ে খাঁটি চামড়ার টুকরো দেবে কেন? তাতেই বা সে ভেজাল মেশাবে না কেন? এইভাবে চলতে চলতে কোনো একটা স্থানে সকল ভেজাল-স্রোত রুদ্ধ হতে বাধ্য। ৩৭৩

মনে হয় সেই অবস্থা পৌঁছে গেছে। নইলে ভেজালের বিরুদ্ধে কড়া আইন হোক এমন কথা ওঠে কেন। অভিযান চালিয়ে যেতে পারলে এবং ভেজাল বন্ধ করতেই হবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসরে নামতে পারলে কাজ হবে। কিন্তু তার আগে

অবিলম্বে "বিশুদ্ধ" "খাঁটি" প্রভৃতি কথা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন তৈরি হোক। ঘি, দুধ, মাখন প্রভৃতিব পূর্বে এই জাতীয় বিশেষণ ব্যবহার আইন ক'রে বন্ধ করা হোক। আমরা খাঁটি দুধ, খাঁটি ঘি, খাঁটি মাখন বা ভেজালহীন ওষুধ, ভেজালহীন চাল, তেল আর সহ্য করতে পারছি না। আমরা বিশেষণহীন দুধ, ঘি, মাখন, তেল প্রভৃতি পেতে চাই। বিশেষণ বন্ধ হ'লে পাওয়াও যাবে বোধ হয়। ৩৭৪,২০-৬-৫৪

মেয়েরাই পারে

মিস অ্যানা বেকার নাম্নী এক আরজেণ্টাইনবাসিনী মহিলা (৩৬) ঘোড়ার পিঠে বুয়েনস আয়ারিস থেকে অটাওয়া যাত্রা করেন। তিনি মোট সতেরো হাজার মাইল ভ্রমণ শেষ ক'রে মন্টিলে পৌঁছেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য—পুরুষেরা যা পারে, মেয়েরাও তা পারে, এইটি প্রমাণ করা। মনে হচ্ছে কথাটা তিনি বিনয় ক'রে বলেছেন। আসলে পুরুষেরা যা পারে না, মেয়েরা তা পারে; এইটিই তিনি প্রমাণ করেছেন। ৩৭৫

লালপুরের একটি স্ত্রীলোক কিন্তু পুরুষের সমকক্ষতা দাবী করতে পারে। তার নাম সাকিনা। এই স্ত্রীলোকটি "বিপজ্জনক গুণ্ডা"রূপে ঘোষিত হয়েছে। এর নম্বর দুই। পূর্ববর্তিনী আরও একজন আছে বোঝা যায়। উক্ত গুণ্ডা স্ত্রীলোক হওয়াতেই বিশেষ খ্যাত হয়েছে। অথচ কেন যে গুণ্ডামি পুরুষের একচেটে থাকবে তার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। নিজ নিজ ক্ষমতা এবং পছন্দ অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই জীবিকার পথ বেছে নেবার অধিকার থাকা উচিত। ৩৭৬

আবার ভিখারী

কিছুকাল পূর্বে ভিখারীদের প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করা হয়েছিল। প্রসঙ্গটি নতুন ক'রে আবার তুলতে হ'ল। তখন বলেছিলাম ভারতবর্ষে অন্তত দশ লক্ষ ভিখারী আছে। আমার এই অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা সম্প্রতি যে হিসাব করেছেন তাতে দেখা যায় সংখ্যা আমার অনুমিত সংখ্যার দ্বিগুণ। তাঁরা বলছেন অন্তত কুড়ি লক্ষ ভিখারী আছে ভারতবর্ষে। এক বম্বাই শহরেই আছে এক লক্ষ এবং শহরের বাইরে তেইশ হাজার। ৩৭৭

মাদ্রাজেও এটি একটি বড় সমস্যা। সেখানে রেল কর্তৃপক্ষ লাউডস্পীকারের সাহায্যে ভিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার চালাবেন স্থির করেছেন। কিন্তু ভিখারী-বৃত্তি তাঁরা

ঠেকাবেন কি ক'রে? দেশের অবস্থা যত ভালর দিকে যাবে ভিখারীর সংখ্যা তত বাড়বে। তার মানে, দেশের অবস্থা ভাল হ'লে অনেকেরই ভিক্ষা দেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, অতএব ভিখারীদের সুদিন। যে পরিবারে একজন ভিক্ষা করত, দেশের অবস্থার উন্নতি হ'লে সে পরিবারের সবাই ভিক্ষায় বেরোবে। এটা অবশ্য আমাদের দেশেরই বৈশিষ্ট্য। কাজ না করার দিকে এত লোকের ঝোঁক যে কাজের লোকদের উন্নতি দেখলে নিষ্কর্মারা উল্লসিত হবেই। ৩৭৮

লাউডস্পীকারের সাহায্যে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করা হয় তো সম্ভব, কিন্তু ভিক্ষা নেওয়া বন্ধ করা সম্ভব হবে না। উপরন্তু লাউডস্পীকারে ভিখারীদের বিজ্ঞাপনের কাজটা হয়ে যাবে। কারণ ভিক্ষা যারা দিতে বাধ্য হয় তাদের উদ্দেশে লাউডস্পীকার নতুন আর কি বলবে। আর যারা পুণ্যের জন্য ভিক্ষা দেয় তারাও সকল নিষেধ উপেক্ষা ক'রে ভিক্ষা দেবেই। তাই লাউডস্পীকার যত জোরালো হবে, ভিখারীদের সঙ্ঘবদ্ধতাও তত জোরালো হবে। ইতিমধ্যেই ওরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে। ওদের সঙ্গে যদি কখনো যুদ্ধ করতে হয় তা হ'লে অভিখারীরাই হেরে যাবে, এতে সন্দেহ মাত্র নেই। ৩৭৯

ত্রিভুবনচারী চোর

দস্যুহস্ত এতদিনে অন্তরীক্ষেও প্রসারিত হল। বর্মার ঘটনা। তিনজন লোক বিমানচালককে পিস্তল দেখিয়ে সমুদ্রতীরে বিমানখানি নামাতে বাধ্য করে এবং বিমানস্থ বর্মা সরকারের দু'লক্ষ পঁচিশ হাজার ষ্টার্লিং পরিমাণ অর্থ লুণ্ঠন ক'রে স'রে পড়ে। ৩৮০

গত কয়েকদিনের মধ্যে স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল—এই তিন জায়গাতেই চুরির অভিনবত্ব দেখা গেল। স্বর্গেরটি বলা হ'ল, ওটি বর্মাদেশের ব্যাপার। অন্য দুটির স্থান কলকাতা শহরে। একজন হিমালয় অভিযাত্রী কলকাতার বাজার করতে ট্যাক্সি নেন। ঠিক সেই সময় এক চোরও তাঁর সঙ্গে গিয়ে ট্যাক্সি-চালককে সাহেবের আর্দালি পরিচয়ে তার পাশে বসে। ট্যাক্সি ড্রাইবার জানল, সে আর্দালি; সাহেব জানলেন, সে ট্যাক্সি ড্রাইভারের সহকারী। সাহেব এক মার্কেটে অনেক কিছু মূল্যবান জিনিস কিনে অন্য মার্কেটে গেলে চোর সাহেবের নাম ক'রে ট্যাক্সির ভিতরকার জিনিসগুলি নিয়ে স'রে পড়ে। ভূগর্ভের চুরিটিও অভিনব। বিজ্ঞানী

মানুষ ভূগর্ভের প্রকৃতির সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে, এই চোরটি ভূগর্ভে টেলিফোনের তার চুরি করেছে। তার ফলে সেদিন টেলিফোনের প্রায় দু'শ লাইন অকেজো হয়ে গিয়েছিল। ৩৮১

যে-আকাশের দিকে চেয়ে কবি কাব্য রচনা করে, বিজ্ঞানী নক্ষত্রজগৎ পর্যবেক্ষণ করে, সেই আকাশে চোর বিচরণ করছে ভাবতেও ব্যাপারটা কেমন কমিক মনে হয়। কিন্তু তবু এর মধ্যে বেশ একটা নাটকীয়ত্ব আছে। এমন একটি উত্তেজনা যা নিয়ে সময় কাটানো যায় অনেকখানি। এই জাতীয় ঘটনা আমরা অর্থব্যয় ক'রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রচার ক'রে বেড়াই। মনে হয় এরই জন্যই তো বেঁচে সুখ, অস্তিত্বের সার্থকতা। অথচ কোথায় কে একটি সৎকাজ করল—এবং প্রতিদিন হাজার হাজার লোক সৎকাজ করছে তা নিয়ে কোনো উত্তেজনাও নেই, তাতে আনন্দও নেই। তবু আমরা যে আমাদের জীবনের এই সব উল্লেখযোগ্য এণ্টারটেনারদের বিরুদ্ধে পুলিসকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করি সে নিতান্তই মূঢ়তা বশতঃ। অতএব নিম্নলিখিত খবরটিকে স্বাগত জানাই— ৩৮২

চোরদের লিমিটেড কম্পানি

দোকানে কিছু কেনা উপলক্ষে বা অন্যভাবে যারা দোকান থেকে জিনিস সরায় (ইংরেজীতে shop-lifters) তারা বিশেষ শ্রেণীর চোর। সম্প্রতি এই রকম চোরেরা টোকিও শহরে একটি লিমিটেড কম্পানি প্রতিষ্ঠা ক'রে চোরাই জিনিসের লভ্যাংশ নিজেদের সভ্যদের মধ্যে বণ্টন করছে, এই রকম একটা খবর বেরিয়েছে। ৩৮৩

এই কম্পানির রিপোর্ট থেকে জানা গেছে এদের কয়েকজন ডাইরেক্টর এবং একজন প্রেসিডেণ্ট আছে এবং এরা গত চার বছরে ৬,০০০০০ ডলারের জিনিস চুরি করেছে। এই কম্পানির নাম হানশিং ট্রেডিং কোঃ, এবং এটি বিধিমতো অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে স্থাপিত। কম্পানির সভ্যরা কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য (চুরি বেশি করলে) যথারীতি বোনাস্ পেয়ে থাকে। এদের বেকারত্বের জন্য বীমার ব্যবস্থাও আছে। অর্থাৎ কেউ গ্রেফতার হ'লে, সে যদি আর কারো নাম প্রকাশ না করে, তা হ'লে তার পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়। ৩৮৪

সকল দেশেই এর অনুকরণ বাঞ্ছনীয়।—দুনিয়ার চোর এক হও। ৩৮৫,৪-৭-৫৪

হাতী অথচ মূর্খ নয়

উত্তরপ্রদেশ সংলগ্ন কোনো একটি স্থানে হাতীর হাত থেকে শস্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হওয়াতে চাষীরা বুদ্ধি ক'রে মাঠের চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। হাতীরা যথারীতি ক্ষেতে প্রবেশ করতে গিয়ে সেই আগুনে বাধা পায়, কিন্তু উদ্দেশ্য ত্যাগ করে না। হাতী হ'লেও মানুষের চেয়ে তারা কিঞ্চিৎ বেশি বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে মানুষকে অবাক ক'রে দিয়েছে। কারণ তারা কয়েক মিনিট পরে আবার সেখানে ফিরে আসে শুঁড়ভর্তি জল নিয়ে। তারপর হোস্ পাইপে যেমন দমকলের সাহায্যে আগুন নেবানো হয়, তারাও তেমনি শুঁড় থেকে জল ছেড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুন নিবিয়ে ফেলে। ৩৮৬

'হস্তীমূর্খ' এই বহুব্রীহি সমাসটি কি তা হলে নিতান্তই অর্থহীন? হস্তীর মতো মূর্খ যে সে, এই ব্যাসবাক্য কি তবে ভুল? হাতীর যদি এতটা বুদ্ধি থাকে, তা হ'লে ব্যাসবাক্য 'হস্তীর মতো বৃহৎ আকারের মূর্খ' করলেও তা হাতীব পক্ষে সম্মানজনক হবে না। কিন্তু হাতী এ বুদ্ধি কোথায় পেল? ৩৮৭

জনশ্রুতি এই যে, হাতীকে কতকগুলি কাজ শেখানো যায় বটে, কিন্তু তাকে চালনা না করলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোনো বুদ্ধির কাজই সে করতে পারে না। সে তার সংস্কারজাত অভ্যস্ত কাজ ভিন্ন কদাপি আপন গরজে অন্যের কোনো কাজ করে না। তার প্রভু যদি তার পায়ের কাছে আক্রান্ত হয়, নিজ চোখে দেখেও হাতী তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে না। হয় পালিয়ে যায়, না হয় চুপ ক'বে দাঁড়িয়ে দেখে। ৩৮৮

উত্তরপ্রদেশের নিকটবর্তী এই হাতীর দল কি তবে আগে কোথাও দমকলের কাজ করেছে? তারা যুদ্ধের সময় এ-আর-পীর অঙ্গীভূত ছিল কি? হয় তো তাই, হয় তো মানুষের শেখানো বিদ্যাটি আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কারের অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছে তারা, তাই আগুন নেবানোর জন্য যে অন্য জায়গা থেকে জল ব'য়ে আনতে হবে এবং সে জল আগুনে ঢালতে হবে, এতটা বুদ্ধির কাজ তারা করতে পেরেছে। ৩৮৯

* বানরবৃত্তি

রাণাঘাটে বানরের নাচ দেখিয়ে বেড়ায় এমন একটি লোককে, বিনা টিকিটে

রেলগাড়িতে ভ্রমণরত অবস্থায় গ্রেফতার ক'রে আদালতে হাজির করা হয়। লোকটির ভাড়া দেবার টাকা না থাকায় জেলে যাওয়াই স্থির করে। কিন্তু তা হ'লে তার দুটি বানরের ভার কে নেবে এই হয় সমস্যা। তখন তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে যখন ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করবে না এই মর্মে ঘাড় নেড়ে এবং নিজের কানমলে শপথ করছিল, তার বানর দুটিও সেই সঙ্গে ঘাড় নাড়ছিল এবং নিজেদের কান মলছিল। খবরে বলা হয়েছে বানরেরা তাদের রক্ষককে অনুকরণ করেছে। ৩৯০

আমরা অবশ্য এই ভাবেই চিন্তা করতে অভ্যস্ত। আমাদের ধারণা বানরেরা আমাদের অনুকরণ করে। ইংরেজীতেও ape করা মানে অনুকরণ করা। কিন্তু মনে হয় বিষয়টি আমাদের আর একবার ভেবে দেখা উচিত। বিবর্তনবাদ যদি সত্য হয়, তা হলে ধরাপৃষ্ঠে বানর জাতীয় প্রাণী এসেছে আগে, মানুষ এসেছে পরে। এ রকম ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীরা পরবর্তীকে অনুকরণ করবে কিসের আশায়? অর্থাৎ বানর মানুষকে অনুকরণ করবে কেন? বরং যদি বলা যায় মানুষই বানরকে অনুকরণ করে, তা হলে সেটা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়। ৩৯১

বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? মানুষের মনে মনুষ্যত্ব নামক যে আদর্শ আছে সে আদর্শ থেকে মানুষ অনেক দূরে স'রে আছে এবং ক্রমেই আরও দূরে স'রে যাচ্ছে। মানুষেরই বানরবৃত্তি এখন বৃদ্ধির মুখে। পৃথিবীর অধিকাংশ ক্ষমতাশালী মানুষ এখন মনুষ্যত্বকে ব্যঙ্গ করছে, মনুষ্যত্বকে কলা দেখাচ্ছে। এ সবই তো বানরেরই অনুকরণ। বানরের যে ব্যবহার মানুষের বিচারে বিরক্তিকর, মানুষ তারই অনুকরণ ক'রে চলেছে। ৩৯২

বাঘের সীমা

খুব ভয় পেলে অথবা মনে নৈরাশ্য জাগলে ছোট জিনিসকে অনেক সময়েই খুব বড় ব'লে মনে হয়। যে ব্যক্তি দুঃখ পায়, সে মনে করে পৃথিবীতে তার দুঃখটাই সবচেয়ে কঠিন। যাকে ভূতে তাড়া করে, সে নিজের পিছনের সেই ভূতটাকেই পৃথিবীর সেরা ভূত ব'লে মনে করে। ভুলে যায় যে, সংসারে আরও কঠিন দুঃখ এবং আরও বড় ভূত আছে। ৩৯৩

কিন্তু ছোট জিনিসকে সজ্ঞানে বড় করি আমরা বাহাদুরির লোভে। তিলকে

তাল করা একটি অতি পরিচিত প্রবাদ বাক্য। যাঁরা বঁড়শীর সাহায্যে মাছ ধরেন, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ শিকারকরা মাছের আকার কিছু বাড়িয়ে বলেন এটি সবারই জানা। একবার বিলেতে মৎস্য-শিকারীদের একটি ভোজ-সভা হয়েছিল। যে প্রতিষ্ঠান খাদ্য পরিবেশনের ভার নিয়েছিল তাদের লোকেরা প্রত্যেকটি টেবিল অন্য টেবিল থেকে পাঁচ ফুট দূরে দূরে বসিয়েছিল। এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বলেছিল—ঠিকই করা হয়েছে, কারণ প্রত্যেকেই কত বড় মাছ ধরেছেন গল্প করবেন এবং মাছের আকার দেখাতে দুখানা হাত দুদিকে বিস্তার করবেন; টেবিল দূরে দূরে না বসালে তাঁদের অসুবিধা হবে যে। ২৯৪

ব্যাপারটা কৌতুককর হলেও অসম্ভাব্যের সীমা ছাড়ায়নি, কারণ মাছের আকার (স্তন্যপায়ী জলজন্তু তিমিকেও মাছ ব'লে ধরলে) এক ইঞ্চি থেকে এক শ' ফুট পর্যন্ত হতে পারে। অতএব মাছ সম্পর্কে ভাববার কিছু নেই। ভাববার কারণ সম্প্রতি ঘটেছে বাঘ সম্পর্কে। কিছুদিন ধ'রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যাঁরা অন্তত বাঘ মারার সংবাদ পাঠান তাঁরা মাছের মতো বাঘের আকারও একটু বাড়িয়ে বলছেন। এখন থেকে সতর্ক না হ'লে ভবিষ্যতে বাঘের দৈর্ঘ্য কি দাঁড়াবে বলা শক্ত। সংবাদদাতা ও শিকারীদের মনে রাখা উচিত, (নির্বুদ্ধিতা বাদে) সকল পার্থিব জিনিসেরই যেমন একটি সীমা আছে, বাঘেরও তেমনি একটি সীমা আছে। বাঘের অন্তত ধর্ম এই যে, সে যত হিংস্রই হোক, যত অত্যাচারীই হোক, সেই সীমা কখনো সে লঙ্ঘন করে না। তাই নওগাঁ থেকে পাঠানো মিকিং পাহাড়-বাসীদের হাতে মৃত বাঘটি যখন স্বসীমা লঙ্ঘন ক'রে চোদ্দ পনেরো ফুটে গিয়ে পৌঁছেছে, তখনই বোঝা যায় এতে বাঘের কোনো দোষ নেই, দোষ তার অদৃষ্টের। ২৯৫

একটি নতুন সমস্যা

সম্প্রতি একটি নতুন সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে। হয় তো এটি সত্য সত্যই সমস্যা নয়, সত্য সত্যই যা বিপরীত মনে হচ্ছে তা বিপরীত নয়। ঘটনাটা আমাদের চোখে একটু করুণ রসাত্মক মনে হচ্ছে মাত্র। অর্থাৎ এখন বড়রা ছোটর হাতে মার খাচ্ছে। বড়দের নানা অপরাধ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বারনার্ড শ'এর সেই সোশালিস্ট লোকটি বলেছিল চল্লিশ বছর পার হ'লে প্রত্যেকটি মানুষ স্কাউণ্ড্রেল্ হয়, এটাই হয় তো খাঁটি কথা। বর্তমান বাস্তববাদিতার যুগে এ সত্যটি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ২৯৬

সম্প্রতি দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটি আমেদাবাদে। সেখানে মেহসানা জেলার এক গ্রামের পল্লীরক্ষী বাহিনীর সদস্য, নাম শ্রীলাগাজি দেখতে পায় তার পিতাজি মাদক বর্জন আইন অমান্য ক'রে মাতলামি করছেন। শ্রীমান লাগাজি তৎক্ষণাৎ তার পিতার বিরুদ্ধে পুলিস লাগিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করিয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা বারুইপুরে। প্রকাশ, সেখানে এক শ্বশুর-জামাই বিবাদের ফলে জামাইয়ের হাতে শ্বশুর গুরুতর আহত হয়েছেন এবং জামাইকে পুলিসে ধরেছে। লক্ষণ ভাল মনে হয় না। এই জাতীয় ঘটনা ঘটতে থাকলে নিতান্ত অন্ধেরও ক্রমে চোখ খুলে যাবে। ৩৯৭,১১-৭-৫৪

পরীক্ষায় সব পাস হোক

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়—ছাত্রদের মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ এমন পরিবার থেকে আসে, যার আয় জনপ্রতি ৩০ টাকা বা তারও কম। শতকরা ৭ জন মাত্র ১০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব আয়ের পরিবারভুক্ত যত সংখ্যক ছাত্রকে পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে এই হিসাব বাংলাদেশের ছাত্রজগতের পক্ষে সত্য ব'লে ধরা যেতে পারে। ৩৯৮

মাসে শতকরা ৭৫-এর বেশি স্বাস্থ্য এবং মাসে ৩০-এর বেশি টাকা খরচ ক'রে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাতে সমস্ত জীবন মাসে ৩০ টাকার বেশি উপার্জন হয় না, অথচ এই শিক্ষা আমাদেব পেতেই হয়। এই শিক্ষা—অর্থাৎ যে শিক্ষায় ওথেলো-ডেসডিমনা-ইযাগো-ম্যাকবেথ-রোজালিণ্ড-অরল্যাণ্ডো-টাচস্টোন-প্রসপেরো-মিরাণ্ডা-শাইলক-পোর্শিয়া প্রভৃতি চবিত্র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলী-কীটস-বায়বন প্রভৃতির কবিতা এবং বিশ্বের অর্থনীতি-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতির সঙ্গে রাত্রি-দিন লড়াই করতে হয় এবং ক'রেও মাসে ৩০ টাকার বেশি আয় হয় না। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের জীবনদর্শন রচিত হচ্ছে। অতএব এ শিক্ষার ত্রুটি আছে এবং তা এতদিন পবে ধরা পড়েছে। ৩৯৯

এই সব বুঝেই গতবারে আমি প্রস্তাব করেছিলাম সবাইকে পাস করিয়ে দেওয়া হোক। পরীক্ষা তুলে দিলে চলবে না, তাতে আয় ক'মে যাবে। বলেছিলাম এই জন্য যে অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই বোঝা যায় পাস ও ফেলের মধ্যে আসলে কোনো তফাত নেই। রবীন্দ্রনাথের 'ফেল' গল্প স্মরণীয়। ৪০০

যারা নিজের গরজে শেখে তারা স্কুল-কলেজে না গিয়েও শেখে, আর যারা শুধু পাস করতেই চায়, তারা আদৌ কিছু শেখে কি না তার একটা পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেই আসল সত্যটা বোঝা যাবে। দেখা যাবে, যারা ফেল করেছে তাদের সঙ্গে পাসকরাদের মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। ৪০১

তা ভিন্ন, যারা পাশ করে, তারা সবাই যদি চাকরি পেত, তা হলে শতকরা ৩০ হোক বা ৬০ হোক, পাস করানোর একটা সার্থকতা বোঝা যেত। তা যখন তারা পায় না, পাশ ক'রেও যদি তাদের ব'সে থাকতেই হয়, তা হলে কতকগুলো ছেলেকে ফেল করিয়ে মাথাগুলো আর একটু নিচু করিয়ে বসিয়ে রেখে লাভ কি? তারাও পাস ক'রেই ব'সে থাক না? সমাজের তাতে কোনো ক্ষতিই হবে না। ৪০২

মেয়েদের দিক দিয়েও কিছু বক্তব্য আছে। অনেক মেয়েই স্কুল-কলেজে পড়ে, কারণ এটি আধুনিককালের দাবী। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক' আধুনিককালের ছেলে শিক্ষিত মেয়ে চায়, পাসকরা মেয়ে চায়। বিয়ের বাজারে বরের চাহিদা বেশি ব'লেই তাদের বাছাই করার স্বাধীনতা আছে, কনের পিতারা 'বেগার্স' হয়ে 'চুজার্স' হতে পারেন না। ৪০৩

পাসকরা মেয়ে চাওয়ার মধ্যে একটি কূটনীতিও আছে। কারণ যে মেয়ে পাসকরা নয়, তার পিতার কাছ থেকে একটু বেশি পণ আদায় করা চলে। কাজেই মেয়েদেরও সবারই পাস করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে সমাজের কল্যাণ হবে, পণের দাবীও হয়তো কমবে। তা ভিন্ন আরও একটি উপকার হবে। অনেক মেয়ে পিতার টাকা পণ হিসেবে বার করিয়ে নিয়ে স্বামীর পকেট পূর্ণ করবার মতলবে ইচ্ছে ক'রে ফেল করে। সে পথ বন্ধ হওয়া দরকার! ৪০৪

সম্প্রতি আম্বালা থেকে একটি খবর বেরিয়েছে, তা থেকে নিশ্চিত প্রমাণ হবে পরীক্ষা পাসের বা স্কুল-কলেজে পড়ার যে বর্তমান বিধি—সবই অর্থহীন। খবরে প্রকাশ আম্বালা থানার অন্তর্ভুক্ত মরিন্দা মিউনিসিপ্যালিটিতে যিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন তিনি মিস্টার নিরঞ্জন, শুধু তাই নয়, তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষরও। দলিলপত্রাদিতে তিনি টিপসই দিয়ে কাজ চালান। খবরটি খুবই সময়োচিত। ৪০৫

মিউনিসিপ্যালিটি হোক বা রাষ্ট্র হোক, সুপরিচালনা নির্ভর করে শুভ ইচ্ছার উপর, সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা পাসের দরকারই নেই—যদি পরিচালনার ক্ষমতা থাকে। আমার তো মনে হয়, পৌরকর্তা মিঃ নিরঞ্জনই সর্বক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত, স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে পড়াশোনার আর দরকার নেই। ৪০৬

বিহারের সংযম

আমাদের বন্ধু প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, বাংলাদেশের দার্জিলিং, মালদহ ও দিনাজপুর জেলা বিহারের অন্তর্ভুক্ত হোক এই রকম দাবী তুলেছেন। জলপাইগুড়ি বাদ গেল কেন বোঝা যায় না। দাবীর কারণ বাংলাদেশেব সঙ্গে ঐ সব জেলার সংযোগ নেই। (সংযোগহীন বলে পূর্ব পাকিস্থানও ঐ সঙ্গে দাবী করতে পাবতেন, কিন্তু তা করেননি।) এতে বিহারের সংযমেরই পরিচয় পাওয়া যায় এবং ঔদার্যেরও। আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে বিহারের কাছ থেকে। ৪০৭

আরও সোনা আসতে দাও

কাস্টমস্ বিভাগ কর্তৃক অদ্যাবধি বে-আইনি সোনা বাজেয়াপ্তকরণের কাজ অব্যাহত আছে। অনেক সোনা এই ভাবে ধরা পডছে। কিন্তু এই সব খবর প্রকাশ না করাই তো ভাল। ববং বে-আইনি সোনা এদেশে আমদানি করায় উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিছুদিন এইভাবে চললে আবার আমরা বলতে পারব, আমাদের দেশ সোনার দেশ। ৪০৮

শিক্ষকের ঘরে বোমা নিক্ষেপ

হরিপালের অন্তর্ভুক্ত কোনো এক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের ঘরে মধ্য রাত্রে হাতবোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অনুমান করা যায় কোনো ফেলকরা ছাত্র তার অকৃতকার্যতার প্রতিবাদস্বরূপ এই উপায় অবলম্বন করেছে। কিন্তু এজন্য শুধু হেডমাস্টারকে দায়ী করা কেন? অকৃতকার্যতার জন্য অনেক কিছু দায়ী। যাঁর কাছে প্রথম শিক্ষা পাওয়া গেছে তিনি দায়ী, অভিভাবক দায়ী, পারিবারিক পরিবেশ দায়ী, এবং সর্বোপরি দেশের বর্তমান অবস্থা দায়ী। এদের প্রত্যেকের উপর হাতবোমা ছুঁড়তে হবে। অনেক বোমা দরকার। শস্তায় সফল প্রতিবাদ জানানো যায় না। ৪০৯,২৫-৭-৫৪

প্রেম ও আগুন

আমেদাবাদের এক যুবক এক তরুণীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু তরুণী তাকে প্রত্যাখ্যান করায় যুবক তার ঘরে কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বলে 'করেঙ্গে ইয়ে মারেঙ্গে।' তরুণীর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ঘরের আগুন নিবিয়ে ফেলে এবং যুবকটিকে পুলিসে দেয়। ৪১০

প্রেম ও আগুন অবশ্যই অভিন্ন। যুবকের হৃদয়ে যখন আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, তরুণীর হৃদয় তখন হিমশীতল। এ অবস্থা যুবক কি ক'রে মেনে নেয়? তাই সে কেরোসিনের সাহায্যে তরুণীর হৃদয়ে আগুন জ্বালাতে চেয়েছিল। দেখা যায়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'লে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে মাসাজ ক'রে হৃৎপিণ্ডকে সক্রিয় করা চলে। কিন্তু যে হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলেনি, বাইরে থেকে কেরোসিন বা পেট্রলের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে তাতে প্রেমের আগুন জ্বালানো চলে না। ট্রাম-বাস পোড়ানো নীতি হৃদয়ের ক্ষেত্রে সত্যই অচল, বিশেষ ক'রে যদি সে হৃদয় বেসরকারী প্রাইভেট হৃদয় হয়। ৪১১

দাড়িতে মৌমাছি

ডায়মণ্ডহারবারের এক ব্যক্তির দাড়িতে হঠাৎ এক ঝাঁক মৌমাছি এসে চাক বাঁধতে আরম্ভ করে। এই লোকটি তখন তার বৈঠকখানায় ব'সে জাল বুনছিল। বলা বাহুল্য মৌমাছির এই আক্রমণে সে বিষম বিব্রত হয়ে পড়ে এবং মৌমাছি তাড়াতে গিয়ে আরও বিপন্ন হয়। মৌমাছিরা অবশ্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যাবেলা দাড়ি ত্যাগ ক'রে চলে গেছে। ৪১২

বর্তমান সময়ে যখন জীবনের সকল বিভাগের উপরেই মানুষকে অত্যধিক চাপ সহ্য করতে হচ্ছে, জীবনধারণ সাধারণ লোকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব বোধ হচ্ছে, সে সময়ে আচম্বিতে পুরুষানুক্রমিকভাবে পালিত চাপ দাড়ির উপর এই রকম একটি চাপ, এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মৌমাছির পক্ষে দাড়িকে অরণ্য ব'লে ভুল করা কি ক'রে সম্ভব হল, সেও এক রহস্য—বিজ্ঞানীরা এর উত্তর দিতে পারবেন। ৪১৩

গত রবিবারের সাময়িকীতে 'মধু ও হৃদয়' নামক একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তা থেকে জানা যায় মধুর সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু দাড়ির সঙ্গেও যে হৃদয়ের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ সে কথা কে না জানে? মুখের যাবতীয় দাড়ি

বৃদ্ধি পেয়ে হৃদয়বিন্দুর দিকেই কনভার্জ করে—এঁ ঘটনাটি সাদা চোখেই দেখা যায়। ৪১৪

কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি? মানুষের হৃদয়ে যে মধু আছে, দাড়ির কি তারই প্রতি লোভ? তা যদি হয়, তা হ'লে মৌমাছিদের পক্ষে এ ভুল করা স্বাভাবিক যে, তারা দাড়িতে আশ্রয় নিলে মধু সংগ্রহে তাদের আর নানা স্থানে ঘুরতে হবে না। কিন্তু হায়, তারা জানত না, যে-মধু তাদের প্রয়োজন, তা কাটখোট্টা পুরুষের বুকে থাকে না, কাটমোল্লার বুকে তো নয়ই। ৪১৫

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে মুনি-ঋষিরা দাড়ি জটাজুট পালন করতেন। হয় তো তাঁরা মৌমাছিও পালন করতেন, কিন্তু সে মৌমাছি কখনো তাঁদের মাথায় বা মুখে চাক বাঁধতে চেষ্টা কবেনি। জটাজুটধারী শিবের মাথায়ও কখনো মৌচাক গড়ার চেষ্টা হয়নি, যদিও হ'লে তাঁর আপত্তি হত না। তিনি চাঁদ ধারণ করেছেন, কিন্তু চাক ধারণ করেননি। করলে তাঁর চন্দ্রচূড় নামের সঙ্গে আব একটি নাম যোগ হত—চক্রচূড়। ৪১৬

এ কালের ঋষি রবীন্দ্রনাথও আমরণ দাড়ি পালন করেছেন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অনেক বিখ্যাত নেতারই লম্বা দাড়ি ছিল, কিন্তু দাড়িতে মৌচাক গড়ার চেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম। ১৯৫৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে (৪ঠা অক্টোবরের ইতশ্চেতঃতে আলোচিত) কুর্গ রাজ্যেব মৌমাছি পালন কেন্দ্রের এক শিক্ষার্থীব মুখে শৌখীন মৌমাছিরা মাঝে মাঝে এসে বসত। কিন্তু এই শিক্ষার্থীর দাড়ি ছিল না। অতএব ভবিষ্যৎ সাধারণ জ্ঞানেব কোনো বইতে 'স্বাধীন ভারতে প্রথম' তালিকায় দাড়িতে মৌচাক গড়ার এই চেষ্টার উল্লেখ থাকলে খুশী হব। ৪১৭,১-৮-৫৪

জামা ধ'রে টান

গত ১০ই অগস্ট তারিখের যুগান্তরে প্রকাশিত একখানি চিঠি থেকে জানা গেল ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজ লণ্ডনে অবস্থানকালে জাহাজের নাবিকেরা অল্ডগেট বাজার থেকে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জামা ইত্যাদি কেনে এবং তারা এদেশে যেমন ক'রে মাথায় বোঝা বয় এবং সে বোঝা রাজপথে ফেলে বিশ্রাম করে, সেখানেও ঠিক তেমনি করে। এইভাবে লণ্ডনের লোকদের কাছে তারা উপহাসের পাত্র হয়। তারপর তারা এই সব মাল নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিক্রি করবার সময় আর এক দফা

হাস্যাস্পদ হয়। কারণ সেখানে ও সব জিনিসের এমন চাহিদা যে, ওরা নিজের গায়ের কোট এবং শার্টও বিক্রি ক'রে দিয়ে খালি গায়ে জাহাজে ফিরে আসে। ৪১৮

পত্রলেখকের বক্তব্য এই যে, লণ্ডনের লোকেরা এদের ভারতীয় ব'লে জানে, ভারতীয় ব'লেই উপহাস করে, উপরন্তু এদের ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেবা কোনো ভারতীয় দেখলেই তার জামা ধরে টানাটানি করে, বলে দাম কত? এ দুটি ব্যাপারই পত্রলেখকের মতে আপত্তিজনক। ৪১৯

পত্রলেখকের আপত্তি একদিক দিয়ে অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এর আরও একটা দিক আছে। পাকিস্থানীদের ভারতীয় মনে করা ইংরেজের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক এবং লণ্ডনের ঐ অঞ্চলে এমন অনেক অশিক্ষিত ভারতীয় আছে যারা পথেঘাটের এবং হাটেবাজারের ব্যাবহারিক জীবনে প্রতিদিন খুব মহৎ দৃষ্টান্ত দেখায় না। তা ভিন্ন ঐ সব নাবিকেরা অন্ততঃ দুই শতাব্দী ধ'রে ইংরেজদের দেশে ভারতীয় নামে পরিচিত হয়ে আসছে, আমাদের কাছে ওরা ভারতীয় ব'লে পরিচিত হাজার হাজার বছর। অর্থাৎ ওরা সবাই বাঙালী নাবিক, পাকিস্থানী নাম পেয়েছে গত কয়েক বছর মাত্র। সুতরাং এটি বড় সমস্যা নয়। হোক না ওরা ভারতীয় নামেই পরিচিত। ৪২০

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ভারতীয়রা লণ্ডন শহরে খাঁটি ভারতীয়ের মতো ব্যবহার করলে আমরা লজ্জিত হব কেন? দু-চারজন ইংরেজ যদি হাসে তা হ'লে কি এমন ক্ষতি? ওরা তো ভারতীয়দের গায়ের রং দেখেও আগে কত হেসেছে। এখনও হাসছে না কি? তা ছাড়া ইংরেজরা ভারতে এসে আমাদের ছোট মনে করেছে, আমাদের অনুকরণ করেনি। আমরা কেন তাদের দেশে গিয়ে তাদের অনুকরণ করব? রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী করেননি, তিনি তখন খাঁটি গান্ধী-পন্থী। (এবং তৎপরবর্তী কালে, আমরণ।) যারা ইংরেজের কাছে প্রার্থীরূপে অনুগ্রহ লাভের জন্য যায়, অনুকরণ তাদেরই হয় তো দরকার। ভারতীয় নাবিকেরা অনুগ্রহপ্রার্থীরূপে যায়নি, গিয়েছে তাদের জিনিস কিনে তাদের অনুগ্রহ করতে। এবং এই অনুগ্রহ যদি ইংরেজরা বেশি পায় তা হ'লে ভবিষ্যতে হয় তো একদিন দেখা যাবে যে, ইংরেজরাও মাথায় মোট বইছে এবং ভারতীয় নাবিকদের মতোই মোট পথে নামিয়ে তামাক খাচ্ছে। ৪২১

দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐ নাবিকেরা যে ঐতিহ্য গ'ড়ে তুলছে তাতেও নিন্দার কিছু নেই। ভারতীয়রা যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় বেড়াতে যায়, তা হ'লে এতে তাদের সুবিধা হবে অনেক। মুদ্রা পরিবর্তনের হাঙ্গামা আদৌ থাকবে না। সঙ্গে শুধু ডজনখানেক স্যুট রাখতে হবে। সকালে ঘর থেকে পথে বেরোলে প্রথমেই যে জামা ধ'রে টানবে তাকেই তা বিক্রি ক'রে দিলে সমস্ত দিন নিশ্চিন্ত। এই ভাবে দৈনিক একবার অথবা দুবার এক বা দু প্রস্থ স্যুট বিক্রি করা চলবে, টাকার ভাবনা আর করতে হবে না। ফেরবার মুখে শুধু অন্তর্বাসটি বাঁচাতে পারলেই যথেষ্ট। ৪২২

যুদ্ধের অভাবের বাজারে বিলেতেও এ রকম হয়েছিল। পোষাকের দোকানের বিক্রেতা কাউণ্টারের পিছন থেকে একটুখানি মাথা বা'র করে খদ্দেরকে বলেছে—বিশ্বাস করুন, শেষ প্যাণ্টটি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেছে। অতএব দক্ষিণ আফ্রিকায় গা থেকে কোট-প্যাণ্ট খুলে দেওয়ায় ভারতীয় নাবিকের অবস্থা এদের চেয়ে কিছু খারাপ হয়নি। ৪২৩

বানর হত্যা

উত্তরপ্রদেশে বানর বংশ ধ্বংসের কথা গত ১৭ই জানুয়ারি আলোচনা করেছিলাম। বানর হত্যা ক'রে তার ল্যাজ জমা দিলে ল্যাজপ্রতি তিন টাকা পাওয়া যাবে এই রকম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ছমাস যেতে না যেতে ল্যাজে ভেজাল মেশানো আরম্ভ হয়ে গেছে। হয় তো কুকুর বিড়ালের ল্যাজ অথবা সিনথেটিক খয়েরের মতো সিনথেটিক ল্যাজ তৈরি ক'রে আসলের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে। আমার এই সন্দেহের কারণ আছে। সম্প্রতি একটি খবর থেকে জানা যায়—উত্তরপ্রদেশ সরকার ঘোষণা করেছেন বানর হত্যার নতুন প্রমাণ চাই। এই প্রমাণ কি হবে তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। ঠিক হয়েছে মৃত্যুর প্রমাণ স্বরূপ বানরের বাঁ কান দাখিল করলে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের মতে তা গ্রাহ্য হবে। বিশেষজ্ঞের মত এই যে বানরের কানের সঙ্গে অন্য কোনো প্রাণীর কান মিলবে না, অর্থাৎ ভেজাল চলবে না। ৪২৪

স্পষ্টই বোঝা যায় সরকারের লোকেরা ভেজাল বিজ্ঞানীদের ক্ষমতাকে কমিয়ে দেখছেন। সাগুর বেলায় এ সত্য তো সবাই উপলব্ধি করেছেন—কেমন ক'রে তারা গ-সা-গু কে ল-সা-গু-তে পরিণত করেছে। বানরের কান তৈরি করা তাদের পক্ষে সাধারণ বানরবৃত্তির বেশি কিছু নয়। ৪২৫

তা ভিন্ন বানরকে ফাঁদে ফেলে শুধু বাঁ কান কেটে ছেড়ে দিলেই বা ধরছে কে। কর্তৃপক্ষের অনুমান সম্ভবতঃ এই যে তাতে ক্ষতি হবে না, কেননা একটি কান কাটা পড়লে যে-কোন বানর লজ্জায় এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। অতএব ফল একই। কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয় যে বানরের যে দুটি অঙ্গকে আমরা কান ব'লে জানি তা আদৌ কান নয়? বানরের মতো লজ্জাহীন পশুর কান থাকতেই পারে না। তারা দু'কান কাটা। ৪২৬

যাই হোক, আনাড়ির হাতে কিছু সংখ্যক বানর মারা পড়বেই এবং তাদের মৃতদেহগুলি অবশ্যই শকুনের আহার হবে। অথচ বানরের দেহ থেকে বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু পেতে পারেন। এদেশে বানরের গ্ল্যাণ্ড নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সম্ভবতঃ নেই। থাকলে মরা বানরেরও কিছু দাম হত এদেশে। প্রথম মহাযুদ্ধান্তে ভোরোনফের পরীক্ষার পর থেকে বানরের গ্ল্যাণ্ডের পরীক্ষা ও ব্যবহার প্রগতিশীল জাতিসমূহে বিস্তৃততর হচ্ছে, শুধু গেঁয়ো বানর ভিক্ষে পেল না। ৪২৭,২২-৮-৫৪

নতুন বিবাহ বিল

সম্প্রতি লোকসভায় বেসরকারী একটি বিল উত্থাপিত হয়েছে, যার মর্ম হচ্ছে বিপত্নীকেরা যদি পুনরায় বিয়ে করে, তা হ'লে কুমারীকে বিয়ে করতে পারবে না, বিধবাকে বিয়ে করতে হবে। বিবাহ বিচ্ছেদের দরুন একক পুরুষকে বিপত্নীক এবং একক স্ত্রীকে বিধবা বলা চলবে। ৪২৮

বিলটি খুব মজার। পূর্বে আমাদের সমাজ শত রকম বিধির সাহায্যে মেয়েদের নানাভাবে পঙ্গু ক'রে রেখেছিল। কোনো একটি বিশেষ সময়ের প্রয়োজনে এ রকম হয়ে থাকবে। কিন্তু আধুনিক সমাজ-কল্যাণীরা (নারী ও পুরুষ একত্রে) প্রায় দুশো বছর তার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং তার ফলে মেয়েদের হৃতস্বাধীনতা পুনরুদ্ধারও অনেকখানি হয়েছে। আর ঠিক এমনি সময় কিনা পুরুষের স্বাধীনতা খর্ব করবার জন্য পুরুষের এই অপচেষ্টা! ৪২৯

ভাল হোক মন্দ হোক, বর্তমান শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে মেয়ে ও পুরুষের প্রায় সকল বিষয়েই সমান অধিকার স্বীকৃত হ'তে চলেছে। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর পরিচয়ের ক্ষেত্রও ক্রমশঃ আরও ব্যাপক হবে। তার অর্থ, ভবিষ্যতে অধিকাংশ বিবাহ পাত্রপাত্রীদের পরস্পর পরিচয়ের ভিতর দিয়েই সমাধা

হবে, ঘটকের মধ্যস্থতা আর দরকার হবে না। এমন অবস্থায় পরিচয়ের সাধারণ ক্ষেত্রগুলিকে পৃথক ক'রে রাখা হবে কি উপায়ে? প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কি পৃথক উপনিবেশ তৈরি করতে হবে?—কুমারী উপনিবেশ (যেখানে একমাত্র কুমারেরা প্রবেশ করতে পারবে) এবং বিধবা উপনিবেশ (যেখানে শুধু বিপত্নীকদেব প্রবেশে বাধা থাকবে না?) ৪৩০

বর্তমান সমাজে নীতির দিক থেকে না হোক—প্রযোজনের তাগিদে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়ে ও পুরুষদের একত্র কাজ করতে হয়। অফিসে মেয়ে-পুরুষ একত্র কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে মেয়ে-পুরুষ একত্র পড়ে। বিপত্নীক, বিধবা, কুমাবী ও কুমারগণ এই সব ক্ষেত্রেই অবাধে একত্র হয়ে থাকে। কিন্তু নতুন আইন হ'লে কি এই স্বাধীন মেলামেশা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে? কিংবা পৃথক বিভাগ ক'বে গ্রুপ মিলিয়ে মিলিয়ে মিশতে দেওয়া হবে? কাবণ এই সব ক্ষেত্রে মেয়ে-পুরুষের মধ্যে যে পবিচয় ঘটে তার মধ্যকাব কিছু সংখ্যক পরিচয় অবশ্যই পরিণয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করে এবং তা অনেক ক্ষেত্রেই জাত বা গোত্র মিলিয়ে হয না। এটা খুবই স্বাভাবিক। ৪৩১

নতুন আইন হ'লে এই রকম পরিচযে যে বিপদ এবং জটিলতা দেখা দেবে তা এড়াতে হ'লে পৃথক উপনিবেশ. বা উপবিভাগ ভিন্ন গতি থাকবে না। অন্যথায় মেয়ে পুরুষের এবং পুরুষ মেয়ের হাঁড়ির খবর নিয়ে তবে ঘনিষ্ঠতা কববে। না জেনেশুনে ঘনিষ্ঠতার ঝুঁকি কেউ নিতে চাইবে না। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও যদি অজ্ঞাতকুলশীলদের প্রণয় ঘটে এবং বিবাহ-বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে, তখন কি ঘটবে কল্পনা করা শক্ত। ৪৩২

শ্রীমতী ক, শ্রীমান খ ও শ্রীমতী ক'য়েব দিদি

কিন্তু শক্ত হলেও কল্পনা করতে বাধা নেই। দু একটি ভবিষ্যৎ চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ধরা যাক পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের শ্রীমতী ক-এর সঙ্গে শ্রীমান খ-এর ভাব হল। দিন যায়, উভয়ের অজ্ঞাতসারে ভাব ক্রমে প্রণয়রূপে দেখা দিল। শ্রীমান খ হঠাৎ আবিষ্কার করল শ্রীমতী ক আশ্চর্য সুন্দর। শ্রীমতী ক-এর চোখেও শ্রীমান খ হীরো ব'লে মনে হতে লাগল। শ্রীমতী ক রীতিমতো সীরিয়াস হয়ে উঠল—অর্থাৎ তার মনে হল খ-য়ের হাঁড়ির খবর নেওয়া দরকার। (মেয়েরা এ বিষয়ে খুব প্র্যাকটিক্যাল এবং বিষয়ী)। শ্রীমান খ শ্রীমতী ক-এর

অনুরোধে তার জীবনী বলতে লাগল। (অনুরোধের উদ্দেশ্য, খ-কে স্বামীরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা দেখা)। শ্রীমান্ খ কাঁদতে কাঁদতে বলল, "উপায় নেই, আমরা ভুল করেছি।"

"কেন?"

"আমি বিপত্নীক। দুবছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল।"

শ্রীমতী ক হঠাৎ মূর্ছিত হ'ল একথা শুনে। শ্রীমান খ বিভ্রান্তভাবে লাফিয়ে উঠতেই শ্রীমতী ক ব'লে উঠল "ভয় নেই। আমার দিদি সম্প্রতি বিবাহ বিচ্ছেদের দায়ে তার স্বামীকে তাড়িয়েছে। সে এখন বিবাহেচ্ছু। চল আমার সঙ্গে, আমার দিদিকে দেখবে, আলাপ করবে। তোমার অবস্থা ভাল, স্বভাবও ভাল, দিদির আপত্তি হবে না আশা করি।"

এ কথা শুনে শ্রীমান খ মূর্ছিত হল। তখন শ্রীমতী ক তার মাথায় জল ঢালতে লাগল। মূর্ছা ভাঙতে লাগল প্রায় পনেরো মিনিট। মূর্ছা থেকে উঠেই খ বলল আমি আর বাঁচতে চাই না, আমি লেকে চললাম, ডুবে মরব।"

ক বলল, "আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যা নরহত্যার সমান। যদি হত্যা করতে রাজীই থাক, তা হলে একটা উপায়ে আছে।"

"কি?"

"আমি যে-কোনো লোককে বিয়ে করি, তুমি তাকে হত্যা ক'রে আমাকে বিধবা বানাও তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শ্রীমতী ক-এর এই বুদ্ধিতে শ্রীমান খ স্তম্ভিত হল। তারপর আব তাকে ক্লাসে দেখা গেল না। বোধ হয় সে লেকেই গিয়েছিল। ৪৩৩

বানরের আত্মহত্যা

পরবর্তী এই আত্মহত্যার খবরের সঙ্গে উপরের ঐ কাল্পনিক নায়কের আত্মহত্যার কোনো সম্পর্ক নেই। রানাঘাট জেলখানা প্রাঙ্গণে এক বানর গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। খবরে প্রকাশ, স্থানীয় বানরেরা তাকে ঘিরে রীতিমতো শোক প্রকাশ করেছিল। ঘটনার স্থান বিবেচনায় হঠাৎ মনে হ'তে পারে কোনো মারাত্মক অপরাধের জন্য তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। কিন্তু আসল ঘটনা অন্য। বানরটি আত্মহত্যাই করেছে—এবং তার প্রমাণও সে রেখে গেছে। তার ল্যাজের সঙ্গে বাঁধা একখানা চিঠি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে "আমার আত্মহত্যার জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়।" সে তার ইতিহাসটাও সংক্ষেপে লিখে গেছে। উত্তরপ্রদেশে সরকারী থেকে বানর হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করায় গত মাসে

যে সব বানর মানুষের হাতে মারা পড়েছে তার মধ্যে তার প্রণয়িনীও ছিল। উক্ত চিঠিতে লেখা আছে "ইহলোকে আমরা মিলতে পারলাম না, তাই এই পথ অবলম্বন করলাম। তোমরা আমাকে ক্ষমা ক'রো।" ৪৩৪

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপুত্র

ব্রহ্মপুত্রের সর্বগ্রাসী প্লাবনের জন্য অসহায় মানুষের সম্মিলিত প্রার্থনার কথা উঠেছে। এই প্রার্থনা ব্রহ্মের কাছে হওয়া উচিত মনে করি। পুত্রের কীর্তির জন্য তাঁর দায়িত্ব কম নয়, আশা করি এ কথা তিনি স্বীকার করবেন। ৪৩৫

হাতের মাদুলি পেটে

পঁচিশ টাকা দামের সোনার মাদুলি চুরি ক'রে ভুল স্থানে ধারণ করায় এক দাগী আসামী কিভাবে অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ করছে তার একটি খবর বেরিয়েছে কয়েকদিন আগে। দাগী আসামীটি লক্-আপে ছিল। বাইরের একটি মাদুলি ধারণ করা হাত হাতের কাছে পেয়ে সে সেটি ছিনিয়ে নেয় এবং গিলে ফেলে। লোকটি বিপত্তারণ মাদুলি মনে ক'রেই ছিনিয়ে নিয়েছিল, আশা ছিল সকল বিপদ থেকে ত্রাণ পেয়ে যাবে, নইলে লক্-আপে থাকা অবস্থায় কেউ চুরি করে? পরিকল্পনা ঠিকই ছিল শুধু ধারণ করার বেলায় ভুল হয়েছিল। হাতের মাদুলি হাতে ধারণই বিধেয়, উদরে নয়। ৪৩৬, ১২-৯-৫৪

ডি-সি স্ত্রীর বদলে এ-সি স্ত্রী?

'বিশেষ বিবাহ' নিয়ে আলোচনা চলছে। এককলমী এ বিষয়ে বড়ই উদাসীন ছিল এতদিন, এর ভবিষ্যৎ কি, অতীত কি, কিছুই তার জানা নেই। যারা বিবাহিত, তারা তাদের সেই বিবাহকে নতুন আইন হ'লে 'বিশেষ বিবাহে' বদলে নিতে পারে কি না, কিংবা কেউ বিশেষ বিবাহ কতগুলো এক সঙ্গে করতে পারে, অথবা পুরাতন বিবাহিতেরা অতিরিক্ত অন্তত একটি ক'রে বিশেষ বিবাহ করতে পারে কি না, তা তার জানা নেই। অথবা আইন হ'লে নতুন পুরনো সব বিবাহই আপনা থেকে বিশেষ বিবাহে পরিবর্তিত হয়ে যাবে কি না, এ সন্দেহও মনে জাগছে। জাগছে আরও এ কারণে যে, কলকাতায় বিদ্যুতের কারেণ্ট সব নাকি অলটারনেটিং কারেণ্ট হয়ে যাবে এবং তখন যে সব অঞ্চলে ডি-সি পাখা আছে, সে সব অঞ্চলে তা বদলে এ-সি পাখা দিয়ে দেওয়া হবে। বিশেষ বিবাহ

বিল আইনে পরিণত হ'লে এই জাতীয় কিছু হবে কি না তা আগে থাকতে সবার জানা থাকা ভাল। ৪৩৭

সার্টিফিকেট ও বিবাহ

লোকসভায় বিবাহ বিল আলোচনাকালে পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব প্রস্তাব করেন বিয়ের আগে ডাক্তারি সার্টিফিকেট দাখিলের ব্যবস্থা করা উচিত বিবাহেচ্ছু ছেলেমেয়ের। শ্রী এস এস মোরে এর প্রতিবাদ ক'রে বলেন যে, মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে এতে কেবল ডাক্তাররাই লাভবান হবেন। তাঁর আপত্তি স্বাস্থ্য বিষয়ে সার্টিফিকেট নেওয়ায় নয়, ডাক্তারেরা লাভবান হবে ভয়ে। ডাক্তারদের উপর কি বিশ্বাস! যাই হোক লোকসভার এই সভ্য মারফত জানা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারণ ক'রে ডাক্তাররা আর কিছু না পারুক, মিথ্যা সার্টিফিকেটের সাহায্যে প্রচুর লাভবান হতে পারে। ৪৩৮, ১৯-৯-৫৪

বাজি

কয়েকদিন আগে শিবকালী নামক স্থানে (দেবতারাই জানেন স্থানটি কোথায়) এক বাজির কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে চারজন লোক নিহত এবং ছ' জন লোক আহত হয়েছে—পি টি আই-এর খবর। ৪৩৯

বাজির সঙ্গে মিতালি স্থাপন করলে নিহত বা আহত না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। শব্দার্থের দিক থেকে দেখলে দমবাজি, ধাপ্পাবাজি, মামলাবাজি, দাঙ্গাবাজি, ফাটকাবাজি, ডিগবাজি এবং আরও উচ্চারণের অযোগ্য অনেক বাজির সারাংশ থেকে এসেছে এই বাজি—যা পোড়ে এবং তার চেয়েও বেশি, পোড়ায়। অঙ্ক যেমন সকল বিজ্ঞানের সার, এই বাজিও তেমনি সকল বাজির সার। ৪৪০

ইংরেজী mongering কথাটি অনেকাংশে দাঙ্গাবাজি, মামলাবাজি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত বাজির (যার অর্থ বৃত্তি) সঙ্গে মেলে। কিন্তু ইংরেজদের দেশে বাজির নাম ফায়ার ওয়ার্কস এবং বাজি তৈরির বিদ্যার নাম পাইরোটেক্নিকস। আমাদের ভাষায় শুধুই বাজি। শুনতেও ইতর, কাজেও ইতর। কারণ আমাদের দেশে, বিশেষ বিশেষ পূজা উপলক্ষে এর ব্যবহার উপভোগের জন্য ততটা নয়, যতটা পরাভোগের জন্য। ৪৪১

গাঁটকাটা

"রেলে গাঁটকাটার উপদ্রব" শীর্ষক একটি খবর থেকে জানতে পারা যায়, বর্ধমান-কাটোয়া লাইনের কাটোয়াগামী ট্রেনে এক ব্যবসায়ী যখন গাড়িব মধ্যে ঘুমোচ্ছিলেন, তখন কোনো চতুরতর ব্যবসায়ী তাঁর চার হাজার টাকার গাঁট কেটে নিয়ে কেটে পড়েছে। কিন্তু এই খবরটিকে উপদ্রবরূপে প্রচার করা হ'ল কেন বোঝা যায় না। কারণ, গাঁটকাটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যবসা। এ ব্যবসা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন আদৌ না তুলে ব্যবসা-বিচারে এটি যে প্রশংসাযোগ্য সে কথা সবাই মানবেন। ৪৪২

একটু চিন্তা ক'রে দেখুন। ব্যবসার মূলমন্ত্র কি? মূলধন? আদৌ না। মূলমন্ত্র—চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। কারণ, ব্যবসায়ীর হাতে কখন শুভসুযোগটি এসে চলে যাবে কেউ জানে না। তাই তাকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। একমাত্র গাঁটকাটাই ব্যবসার এই মূলমন্ত্রটি অক্ষরে অক্ষবে পালন ক'রে থাকে। অতএব যে ব্যক্তি চার হাজার টাকার মূলধনেব গাঁট বেঁধে নিশ্চিন্ত-মনে ট্রেনে ঘুমোচ্ছিলেন, তিনি ব্যবসায়ী হতেই পারেন না। তিনি অন্য ব্যবসার (এক্ষেত্রে গাঁটকাটা ব্যবসার) পৃষ্ঠপোষক মাত্র। ৪৪৩

উড়ন্ত চাকি

উত্তর ফ্রান্সে উড়ন্ত চাকি থেকে মানুষ নেমেছিল। চাকি ফরাসীদের দেখে চকিতে সবুজ আলো বিকিরণ করতে কবতে এবং কালো ধোঁয়া উদ্গিরণ করতে করতে পালিয়ে যায়। উড়ন্ত চাকি সৌবজগতে যে-কটা আছে সেগুলোকে আমবা অল্পবিস্তর চিনি। একটি উড়ন্ত চাকিতে তো আমরা জন্মগ্রহণই করেছি—জানি না কত লক্ষ কোটি বছর হ'ল। এই সৌরজগতে যে কটা চাকি আছে, তার বাইরে এ সব চাকির পরিচয় কি? এ সব কি তবে মানুষের তৈরি চাকি? এ মানুষ কোথাকার মানুষ? মনে হয় -ই পৃথিবীরই। উড়ন্ত চাকিকে আপাতত এইভাবে জনপ্রিয় করা হচ্ছে একটা রহস্যের আবরণ সৃষ্টি ক'রে। এতে বিজ্ঞাপন প্রচারের কাজটি বিনা পয়সায় হয়ে যাচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য কি কিছুদিনের মধ্যেই জানা যাবে। হয় তো ক্রস ওয়ার্ড ধাঁধার মতো উড়ন্ত ধাঁধা প্রচলিত হবে আমাদের মধ্যে। নির্ভুল সমাধানের পুরস্কার অঙ্কটি বেশ মোটা হবে। ৪৪৪

ফ্রান্সে যারা এসেছিল তারা বেঁটে মানুষ। হয়তো ওঁরা আফ্রিকার বামন বংশের

লোক। হেলিকপটারে ফ্রান্সে এসেছিলেন। পৃথিবীর বাইরে থেকে এভাবে আসা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় ; কে জানে হয়তো কোনো জাদুকর তাঁর জাদুবিদ্যার বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমরা অপেক্ষা ক'রে রইলাম। •৪৪৫

সহ-অবস্থিতি ও ইংরেজ

সহ-অবিস্থিতি ভিন্ন গতি নেই—বলেছেন এট্‌লি। এ সত্য আমরা অনেক আগে থেকেই জানি। পরবর্তীকালে ইংরেজদের কৌশলে দেশভাগ হলেও ভারতবর্ষের মধ্যে সহ-অবস্থিতির আদর্শে কোনো ভেজাল নেই। সহ-অবস্থিতি পুরাতন সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এট্‌লির দেশের লোকেরাই পৃথিবীর প'ড়ে পাওয়া দেশগুলিতে উপস্থিত হ'য়ে—অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই সেই সব দেশের আদিবাসীদের উচ্ছেদ করেছেন। এখনও আফ্রিকা ও এশিয়ায় সেই উচ্ছেদের কাজই অব্যাহত আছে। আসলে আর্থার র‍্যাঙ্কের ঈশ্বরই বর্তমানে এই কাজে রত হয়েছেন। ৪৪৬

আর্থার র‍্যাঙ্কের পার্পল প্লেন নামক ছবির সংলাপের অংশ—"তুমি কখনো কলকাতা গিয়েছ—সেই নোংরা আর ঈশ্বরহীন শহরটায় ?" ব্রিটিশ ফিল্মে স্কটিশ মিশনারির মুখে এই পুরনো অতি পরিচিত কথাটি বর্তমানে দেবার কি কারণ ঘটল বোঝা যাচ্ছে না। গত দুশো বছর কলকাতা শহর পরিচ্ছন্ন ছিল, শহরে ঈশ্বর ছিলেন, এ কথা তো সবাই জানে। ১৯৪৭-এর ১৫ই অগস্ট থেকে ঈশ্বর কলকাতা ছেড়েছেন, এও সবাই জানে। আর্থার র‍্যাঙ্ক অবশ্য কিছু সংযমের পরিচয়ও দিয়েছেন। তিনি আরও বলতে পারতেন, ঈশ্বর কলকাতা ছেড়ে সম্প্রতি এশিয়ার ও আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে কালোদের উপর গুলি চালাচ্ছেন। আর্থার র‍্যাঙ্কের ঈশ্বর ভারত বিভাগের পর বেকার হয়ে পড়েছিলেন, তাই কলকাতা ঈশ্বরহীন। ৪৪৭

সঞ্চয়

সংবাদ : **কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির জন্য বাজারে চিনির দর ওঠানামা করছে।··· কলকাতার কোনো একটি প্রতিষ্ঠান ত্রিশ হাজার বস্তা চিনি মজুত করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও চিনির জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু এতে মানুষের দোষ কি ? স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকে সে পড়েছে পিঁপড়ের কাছ থেকে সঞ্চয় (মজুতদারি) শিক্ষা কর। কারণ, পিঁপড়েরা প্রচুর চিনি মজুত করে। এই শিক্ষা পেয়ে সে অন্য রকম ব্যবহার করবে কেন ? তা ভিন্ন চিনির ধর্মই এই যে, যতই থাক, মনে হবে**

আরও চাই—আরও চাই। এ বিষয়ে আমরা চিরশিশু। সংসারে ডায়াবেটিস রোগী যে-কজন আছেন তাঁদের অবশ্য বাদ দিয়েই বলছি। ৪৪৮, ২৬-৯-৫৪

খদ্দেরকে বিশ্বাস

বিলেতের ডেভন অঞ্চলের এক ষোল-কামরাবিশিষ্ট হোটেলের মালিক মিস লিউটোয়েইট এক নতুন ধরনের ব্যবসা-পরীক্ষায় সংবাদ সৃষ্টির উপযোগী সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি পাঁচ মাস আগে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করলেন—"তোমরা ছুটি উপভোগকারীরা এদিকে এলে আমার হোটেলে উঠবে এবং তার জন্য আমাকে যে চার্জ দেওয়া তোমাদের উপযুক্ত মনে হয়, তাই দেবে, আমি নিজে কিছুই চাইব না।" তিনি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন নিজে বিল দিয়ে আদায় করলে যে পরিমাণ লাভ হ'ত, এই রীতিতে তার চেয়ে শতকরা দশ বেশি লাভ হয়েছে। খদ্দেরের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল, তারাও তাঁকে নিরাশ করেনি। এমন কি পরিচারকেরাও বখশিশ বেশি পেয়েছে। ৪৪৯

আর যাই করুন, আমাদের দেশে কেউ এ রকম হোটেল (পবিত্র বা বিশুদ্ধ হোটেলের কথা বলছি না) খুলবেন না, কারণ বিলেতের সঙ্গে একটা বিষয়ে আমাদের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। সেখানকার লোকেরা সব সাধু, আর এখানে সবাই চোর তা বলছি না। ওদের দেশে অসাধুতা যথেষ্ট আছে। তফাত এই যে, সেটি অধিকাংশই আন্তর্জাতিক উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। এই তো কয়েকদিন আগেও চল্লিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের সোনা চুরি হ'য়ে গেল লণ্ডনের কে-এল-এম'এর মালগুদাম থেকে। ওদের দেশে এই জাতীয় উচ্চাঙ্গের চোরের সংখ্যা বেশি, আমাদের দেশে ছিঁচকে চোরের সংখ্যা বেশি। ৪৫০

আমাদের দেশটা প্রাচীনকালে বিলেতের মতোই ছিল ছিঁচকে চোর শূন্য। গৃহস্থ ঘরের দরজা খুলে ঘুমতো। এখন সব উল্টে গেছে। এখন বিলেতের লোক রাত্রে ঘরের দরজা খুলে ঘুমোয়। সেখানকার দুগ্ধ-ব্যবসায়ী ভোর বেলা ক্রেতার দরজার বাইরে দুধের বোতল রেখে যায়। খবরের কাগজ বিক্রি হয়, লোক থাকে না, পয়সা ফেলবার জায়গায় সবাই পয়সা ফেলে যায়—এই রকম শুনেছি। ওখানে খাবারে ভেজাল নেই, ওষুধে ভেজাল নেই। মোটামুটিভাবে ওদেশের সাধারণ লোক নিরাপদ এবং সাধারণ লোক সৎ। তাই ওদেশে মিস্ লিউটোয়েইট "যা খুশি দেবেন" প্রস্তাবে হোটেল খুলতে পেরেছেন, এদেশে কেউ তা কল্পনা করতে পারে না। ৪৫১

আরও চোর চাই?

এ দেশে ছিঁচকে চোরের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে। আরও বাড়বে। এই তো এ বছর পূজোর বাজারে এক কলকাতা শহরেই দশ লক্ষ চোরের দরকার ছিল। চোরদের কেন্দ্রীয় অফিস অত চোর দিতে পারেনি, তাই অনেক পদ খালি পড়ে আছে এবং অনেক পদ আনাড়িরা এসে ভর্তি করেছে। এবারে পুজোর বাজারে বিক্রি এত বেড়ে যাবে তা উক্ত কেন্দ্রীয় অফিস আগে বুঝতে পারেনি, তাই আগামী বছরের জন্য সর্দারেরা তৈরি হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে এ বছরের অনেক বীরের হাত এবং দাতার হাত আগামী বছরে চোরের হাতে পরিণত হবে। রিক্রুটিং-এর কাজ জোর চলছে। ৪৫২

বিধান সভায় রসিকতা

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় গত ২২শে সেপ্টেম্বর কোনো একটি বিষয়ে ভোট গ্রহণের সময় একটি ভুলের ব্যাপার নিয়ে খুব হট্টগোল হয় এবং সদস্যদের ব্যবহার শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে। কেউ চড় মারতে চান, কেউ জুতো। ৪৫৩

ঘটনাটি যখন রসিকতার সীমা ছাড়িয়েছে ব'লে অনেকে সন্দেহ করছেন, তখন মনে হয় না কি যে এটি ভাঁড়ামির সীমানায় পৌছেছিল? তা যদি হয় তা হ'লে এর কয়েকদিন আগেই কৃষ্ণনগরে যে গোপাল ভাঁড় সপ্তাহ পালন করা হয়েছে স্পষ্টতঃই এ তারই প্রভাব; আমাদের আদি হিউমার ভাঁড়ামি ভিন্ন আর কিছুই নয়, আর ভাঁড়ামি মানেই 'প্র্যাকটিক্যাল জোক', হাতে-কলমে অন্যকে জব্দ ক'রে হাসানোর চেষ্টা। তা ভিন্ন এ কথাও তো ঠিক যে রসিকতা যত স্থূল হয় ততই তা প্রাণবন্ত এবং সাধারণ-গ্রাহ্য হয়। অবশ্য স্থূলতার দিকেও একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। সে সীমা জুতো পর্যন্ত পৌছেছে কি না, তা অনায়াসেই একটা বাউণ্ডারি কমিশন বসিয়ে ঠিক ক'রে ফেলা যায়। ৪৫৪

ফুটবল ও ছোরা

ঈজিপ্টের মানসুরা নামক স্থানে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর দুটি ছাত্র দল ফুটবল খেলছিল। খেলার স্থান—তথাকার মিউনিসিপাল স্টেডিয়াম। খেলার সময় কোনো ঘটনা নিয়ে দু'পক্ষে ঝগড়া আরম্ভ হ'য়ে যায়, রেফারী তার বক্তব্য বোঝাতে না পেরে একটি খেলোয়াড়ের বুকে ছোরার আঘাত করে। আহত ছেলেটি হাসপাতালের পথেই মারা গেছে। ইতিপূর্বে অনেক রেফারীর অনেক যুক্তিই আমরা

দেখেছি, এ রকম ধারালো যুক্তি কোথায়ও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে খেলার ইতিহাসে এই প্রথম রেফারীর যুক্তির ঘায়ে ক্ষুব্ধ খেলোয়াড় নীরব হ'ল। চলতি প্রথা হচ্ছে এ রকম ক্ষেত্রে রেফারীই হাসপাতালে যান। ৪৫৫

সংসার ও গাছের মাথা

চুঁচুড়ায় গঙ্গার তীরে এক প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের মাথায় বিরলবসন এক প্রৌঢ়-বয়স্ককে বিপজ্জনকভাবে ধ্যানরত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও দমকল ও পুলিস এসে পড়ে। দমকলের লোকদের গাছে উঠতে দেখে উক্ত ব্যক্তিটি জোড়হাতে অনুরোধ জানাতে লাগল—আমি ধ্যান করছি, দয়া ক'রে আমাকে বিরক্ত করবেন না, আমি সংসারের বিষাক্ত কোলাহল থেকে দূরে এসে একটু নির্মল বায়ু সেবন করছি। কিন্তু তার কথা অগ্রাহ্য ক'রে দমকলের লোকেরা তাকে নামিয়ে এনে থানায় নিয়ে যায়। ৪৫৬

—কিন্তু গজদন্ত মিনারই হোক বা বৃক্ষ মিনারই হোক, সংসার থেকে পালিয়ে কোথায়ও নিষ্কৃতি নেই দাদা, এই সার কথাটি যদি কেউ আজও বুঝে না থাকো, তবে তা বোঝাবার ভার দমকলের বা পুলিসের লোকেবা নেবে না তো কে নেবে? সংসারকে এড়িয়ে নয়, সংসাবকে মেনে নিয়েই সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায়, গাছে উঠে তা সম্ভব হয় না, এই কথাটিই দমকলের গাড়িগুলো পথে পথে অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির সাহায্যে প্রতিদিন প্রচার ক'বে থাকে। ৪৫৭

*প্রায়শ্চিত্ত ও পেনিসিলিন

শিলংবাসী একটি অপহৃতা বালিকাকে পুনরুদ্ধারের পর প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়। হিন্দু রীতি অনুসারে গঙ্গাজল, ব্রহ্মপুত্র জল, এবং গোবর ব্যবহারের পরেও কিছু সন্দেহ থেকে যায়, তখন কড়া জীবাণুনাশক মেশানো জলে তাকে স্নান করানো হয়। এটি অত্যন্ত আধুনিক প্রথা এবং বিজ্ঞানসম্মত। বরঞ্চ প্রাচীন পদ্ধতি বাতিল ক'রে দিয়ে কড়া জীবাণুনাশকে স্নান এবং কড়া পেনিসিলিন ইনজেক্‌শন প্রচলন হওয়া দরকার। —প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রে এই অভিনব সংস্কার অনুমোদনযোগ্য অবশ্যই। ৪৫৮, ৩-১০-৫৪

একটি গোপন নির্দেশ

পত্রান্তরে প্রকাশ, ঝাড়গ্রাম মহকুমার সংলগ্ন সীমান্তে যে-সব ছাত্র-ছাত্রী বাংলা

বই নিয়ে স্কুলে যায়, তারা উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের দ্বারা তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হয়। তারা বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দি তাদের বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্কুলে বাঙলা ভাষার প্রাধান্য হ'লে সে সব স্কুলে সরকারী সাহায্য বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে, এই মর্মে গোপন নির্দেশ এসেছে। ৪৫৯

এই জাতীয় নির্দেশের কথা অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে, অতএব এর নাম আর গোপন নির্দেশ কেন। যাঁরা এ নির্দেশ দেন তাঁরাই বা গোপনে দেন কেন বোঝা যায় না। বাঙালী এখন এমন একটা উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে সে এসব এখন গ্রাহ্যই করে না। এমন কি বাংলাদেশে ব'সেও যদি কেউ বলে বাংলা ভাষা সহ্য করব না, তবে সে দাবীও আমরা সানন্দে পূরণ করব। অসহায় এবং অক্ষমের পক্ষে উদার হওয়া ভিন্ন গতি নেই, এই সত্য কথাটি খুলে বলার সময় এসেছে। ৪৬০

খুলে না বললে, "ঐ যে ওরা আমাদের মেরে গেল", "ঐ যে ওরা আমাদের আবার মারছে"—এই ধরনের কান্না আমাদের সহজে থামবে না। সত্য কথা এই যে, আমরা যদি দুর্বল থাকি, ওরা তো মারবেই। যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাগাতে চেয়েছিলেন আমাদের জীবনে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, কারণ আমাদের জাগবার আর প্রয়োজন নেই। ৪৬১

বাংলার সঙ্গে হিন্দি অতিরিক্ত ভাষারূপে নয়, বাংলাভাষীকে বাংলা ভুলে হিন্দি পড়তে হবে, এতবড় রাষ্ট্রীয় খবরটা খবরের কাগজের এক কোণে স্থান পেল কেন বোঝা যায় না। যে কাজ অপরাধ-মূলক তা এ রাষ্ট্রে প্রকাশ্যভাবে ঘটে। পণ্ডিত নেহরু বলেন হিন্দি জোর ক'রে চাপিও না, এঁরা শোনেন চাপাও, এতে বাঙালীর অপদার্থতা বিষয়ে এঁরা যে নিঃসন্দেহ এটি সহজেই প্রমাণ হয়। এঁদের সবাইকে বিজয়ার প্রীতি জানাই। ৪৬২

গো-সংলাপ

ইতিমধ্যে এক বৃষ্টির দিন ফুটপাথের একই শেডের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম দু'টি গোরুর সঙ্গে, এমন সময় ওদের আলাপ কানে এলো কিছু। এক গোরু অপর গোরুকে বলছে "কেমন আছ দাদা? অনেক দিন দেখিনি।"

"দেখবে কেমন ক'রে, দিনকাল যা পড়েছে। গুঁড়ো দুধ কিনতে বেরিয়েছিলাম।"

"তা যা বলেছ, দিনকাল বড়ই খারাপ।"

"হ্যাঁ ভাই, অকারণ মাথা গরম হয়ে ওঠে; এই তো খানিক আগে গোবধ নিরোধ আন্দোলনের দুজন মানুষকে গুঁতিয়ে দিলাম হঠাৎ।"

"ঠিক করেছ দাদা। যারা আমাদের আজকের দিনে বাঁচাতে চায় তারা আমাদের শত্রু।"

"শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার হ'লেও হয় তো মাথা গরম হ'ত না, কিন্তু দলটির আবির্ভাব জোড়া বলদের বিরুদ্ধে।"

এরপর গলার স্বর এত খাটো ক'রে ফেলল যে, আর কিছু শোনা গেল না, বৃষ্টিও থেমে গেল। ৪৬৩

বিক্ষোভ ও জল

লক্ষ্ণৌ শহরে গোবধ নিরোধক বিক্ষোভকারীদের উপর হোস পাইপের জল প্রয়োগ ক'রে তাদের মাথা ঠাণ্ডা করা হয়েছে।—অতএব হোস পাইপের জয়গান দেখা গেল একখানা কাগজে। প্রথম পরীক্ষা হিসাবে জয়গান করা চলে অবশ্যই, কিন্তু দ্বিতীয়বারে যখন তারা ওয়াটারপ্রুফ গায়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে তখন কি হবে? ৪৬৪

টাকার স্বপ্ন

মালদহ জেলাবোর্ডের লোহার সিন্দুক থেকে সম্প্রতি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি গিয়েছিল তা উদ্ধার হওয়ার সংবাদ আমরা জানি। কিন্তু প্রাপ্তিটি নাকি স্বপ্নযোগে ঘটেছে এই রকম প্রচার। উক্ত জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান আসাদুল্লা চৌধুরী টাকার স্বপ্ন দেখেন এবং তা কোথায় লুকানো হয়েছে তাও স্বপ্নে দেখতে পান। খুবই বিস্ময়কর। স্বপ্নে আমরাও অবশ্য টাকা দেখি—এবং মালদহ জেলাবোর্ডের টাকার চেয়ে বেশিই দেখি, কিন্তু জাগলে সে টাকা শূন্যে মিলিয়ে যায়। ৪৬৫

আলিঙ্গন ও চুরি

বিজয়ার আলিঙ্গন করতে গিয়ে একজন আর একজনের ঘড়ি চুরি করেছে, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ অঞ্চলের খবর। বিজয়ার কোলাকুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটাই তো তাই—আলিঙ্গনকালে অন্যের পকেট থেকে জিনিস সরানো। লোকে ব্যাপকভাবে এই সুযোগটি গ্রহণ করে না এটাই আশ্চর্য। অবশ্য জীবনের কোন্ উদ্দেশ্য থেকেই বা আমরা ভ্রষ্ট হইনি? ৪৬৬

*পরীক্ষা তুলে দাও

স্বরাষ্ট্রসচিব ডঃ কাটজু গুজরাট বিদ্যাপীঠের এক ছাত্রসভায় বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা তুলে দেওয়া উচিত। তাঁর মতে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতায় ছাত্রদের মনে নৈরাশ্য জাগে, অতএব সমস্ত বছরের আচরণ, পাঠ, উপস্থিতি প্রভৃতি দেখে পাস করিয়ে দেওয়া উচিত। ৪৬৭

ডঃ কাটজু এই বক্তৃতা দিয়েছেন গত ৮ই অক্টোবর। কিন্তু তার আগেই পরীক্ষা সম্পর্কিত আরও যুক্তিসঙ্গত পথ নিয়ে ইতশ্চেতঃতে আলোচনা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছিল সহজতম প্রশ্ন দিয়ে বই-খুলে লেখার অনুমতি দেওয়া হোক। পরীক্ষার্থীরা যেন পরস্পরকে টুকতে না পায়। প্রশ্নগুলি এমন হবে যা কোনো নোট বইতে রেডিমেড পাওয়া যাবে না, অথচ এমন সরল যা একটুখানি বুদ্ধি থাকলে সবাই লিখতে পারে, বিশেষ ক'রে যদি রেফারেন্স বই খুলতে দেওয়া হয়। মার্ক দেবার ব্যবস্থা থাকবে কে কত ভাল লেখে তার উপর। স্বরলিপি দেওয়া হ'ল তা দেখে মিলিয়ে সবাই যন্ত্রসঙ্গীত বাজাক না? সুর মুখস্থ ক'রে বাজানো আর স্বরলিপি সামনে নিয়ে বাজানোর মধ্যে বাজনার ওস্তাদি-পরীক্ষায় কোনো বাধা সৃষ্টি করে কি? ৪৬৮

পরীক্ষা পদ্ধতি তুলে দেওয়ার চেয়ে এ পদ্ধতি অনেক ভাল আরও এই কারণে যে, পরীক্ষার মধ্যে যে একটি প্রতিযোগিতার ভাব আছে, বৎসরান্তে পড়াশোনা বিষয়ে একটা তৎপরতার ভাব আছে, তা থেকে পরীক্ষার্থীকে হঠাৎ বঞ্চিত করা উচিত নয়। তা হ'লে তাদের মনে হবে শিক্ষা স্বাদহীন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাস করা যায়। ৪৬৯

পরীক্ষা তুলে দেওয়া ঠিক নয়, কারণ এর মধ্যে একটা স্পোর্টেরও ভাব আছে, নইলে এই উপলক্ষে ছোরা ও হাতবোমার ব্যবহার হ'ত না। স্পোর্টের আনন্দটা রাখতেই হবে, অতএব পরীক্ষা একেবারে তুলে দেওয়া এখনই উচিত নয়, যদিও সেইটিই আমাদের শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। ৪৭০

পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন হওয়াতেই পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে আপত্তি। কঠিন প্রশ্ন দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। ছাত্রকে বিভ্রান্ত করা এবং ঠকানোর মনোভাব এর পেছনে আছেই, অথচ পরীক্ষার উদ্দেশ্যের কথাটি ভাবলেই বোঝা যাবে

পরীক্ষার এই আচরিত পদ্ধতিটি বর্জনীয়। যদি কিছু শিক্ষাদান উদ্দেশ্য হয় তা হ'লে স্কুল ফাইনালে যে প্রশ্নটি করা হবে, গোড়া থেকে—অর্থাৎ ইনফ্যাণ্ট ক্লাস থেকে—ছাত্র তার জন্য প্রস্তুত হয়েছে কি না, সেইটি আগে দেখা দরকার। তা না দেখে প্রশ্ন করা অপরাধ। এখন যে পরীক্ষা চলছে তা শুধুই যান্ত্রিক পরীক্ষা; যে পরীক্ষা, পাসের কৌশল জানা থাকলে, অজ্ঞ ছাত্রও পাস করতে পারে। ৪৭১

উলট পুরান

ম্যানচেষ্টারের এক খবরে প্রকাশ, ভারতীয় কাপড় বিলেতে প্রচুর আমদানি হওয়াতে ল্যাঙ্কাশিয়রের বস্ত্রশিল্পে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে। শোনা যাচ্ছে সেখানে বিদেশী বস্ত্র বয়কট প্রচার উদ্দেশ্যে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই"—এই বাংলা গানটিতে ইউরোপীয় সুর সংযোজনা করা হবে—এ গান ইংরেজরা পথে পথে গেয়ে বেড়াবে। ভারতীয় কাপড় প্রকাশ্য স্থানে পোড়ানোর ব্যবস্থাও হবে। ৪৭২

খবরটি আশাপ্রদ। এর পর ওদেশে অভঙ্গুর হাঁড়িতে তাড়ি ও ধেনো রপ্তানি করতে হবে। তারপর হিন্দী প্রচার। তারপর স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি দান। তারপর—কিন্তু তারপর কি কর্তব্য সেটাও কি ব'লে দিতে হবে? ৪৭৩

যক্ষ্মানিবারণী প্রক্রিয়া

পয়লা অক্টোবর তারিখে রয়টার-প্রচারিত একটি খবর—ডেনমার্কের নারী চিকিৎসকদের ক্লাবে ডেনমার্কের স্বামী সম্প্রদায় উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছেন। স্বামী সম্প্রদায়ের কৃতিত্ব হচ্ছে, ডেন পরিবারসমূহে তারাই জুতো পরিষ্কার করে, কয়লা ব'য়ে আনে, বাজার করে, ঘর পরিষ্কার করে এবং কাপড় ধোয়। উক্ত চিকিৎসকদের ক্লাব ৬৩৩টি পরিবারে অনুসন্ধান চালিয়ে এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এর পর ১০ই অক্টোবর রয়টার-প্রচারিত আর একটি খবর থেকে জানা যায় ডেনমার্কে গত এক বছরে পঁচিশ বছরের কম বয়স্ক কোনো লোক যক্ষ্মাতে মারা যায়নি, ডেনরা জাতীয় স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি ক'রে ফেলেছে অল্পদিনের মধ্যেই। ৪৭৪

উপরের এই দুটি খবরের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি? অর্থাৎ পরিবারের

কাপড় ধোয়া, জুতো সাফ করা, বাড়িঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ পুরুষেরা করলে দেশের স্বাস্থ্য ভাল থাকে? না এই জাতীয় প্রচার, নারীসম্প্রদায়ের স্বার্থপ্রণোদিত প্রচার—উদ্দেশ্যমূলক প্রচার? সমস্ত কাজের বোঝা পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে ক্লাবে ব'সে আড্ডা জমানোর কৌশল? ৪৭৫

নেহাৎ কুকুর

টোকিওর একটা খবর থেকে জানা যায় ওসাকার এক কুকুরের মালিক প্রচার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন—তাঁর পুরস্কার-প্রাপ্ত বুলডগকে যে স্ত্রীলোক চুম্বন করবে তাকে তিনি দশ হাজার ইয়েন (১৩৫ টাকার কিছু বেশি) পুবস্কার দেবেন। ষাট জন স্ত্রীলোক এতে রাজী হয়, কিন্তু আশ্চয ব্যাপার, কুকুরকে রাজী করানো সম্ভব হয়নি।—নেহাৎ কুকুর বলেই! ৪৭৬

ওরা বিক্ষুব্ধ জলে মাছ ধরে

আমাদের দেশে এমন এক বিপর্যয়কারী জল-প্রলয় হ'য়ে গেল এবারে, আমরা এ থেকে কিছু শিক্ষাও করিনি, কিছু লাভও করিনি, শুধুই নীরবে ক্ষতি সহ্য করেছি। অথচ এই একই জাতীয় বন্যায় চীনাদের ব্যবহার হয়েছে অন্য রকম। বন্যাকেও যে মূলধনরূপে ব্যবহার করা যায় সম্প্রতি তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে সকল মূলধন-বিরোধী কমিউনিস্ট চীন। রয়টারেব খবর—মধ্যচীনে গুরুতর প্লাবনের মধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায় দেড় লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাছ ধরার সরঞ্জাম বিতরণ করলেন বন্যায় ভাসা লোকদের মধ্যে। দারু-শিল্পীরা ৬০,০০০ মাছধরা নৌকো তৈরি ক'রে ফেলল তাদের জন্য। বন্যায় সম্পূর্ণ ক্ষতির মধ্যে কিছু ক্ষতিপূরণ তাদের হ'য়ে গেল এইভাবে। ৪৭৭

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে এক ইংরেজ আর এক স্কটসম্যানের গল্প। ইংরেজের মাথায় টাক পড়ল। সে মাথায় চুল গজাবার জন্য শত শত টাকা খরচ করল, কত ওষুধ, কত প্রক্রিয়া, কত মাসাজ, কিন্তু কোনো ফলই হল না। এক স্কটসম্যানের মাথায় টাক পড়ল। সে তৎক্ষণাৎ তার আয়না, চিরুনি ও ব্রাশ বিক্রি ক'রে ফেলল। ৪৭৮

উড়ন চণ্ডীরা

উড়ন্ত চক্রের মনোপলি আর নেই, এখন আকাশে উড়ন্ত ডাণ্ডা, উড়ন্ত সিগার এবং

উড়ন্ত গোলক—সবই দেখা দিচ্ছে। এরা সবাই এখন জ্যোতির্ময়। এমন কি যে সব মঙ্গল-গ্রহের উড়ন্ত গোলক থেকে গোলকবিহারিণীরা ফ্রান্সে নামছেন সেই সব গোলকও জ্যোতির্ময়। ৪৭৯

এদের ফ্রান্সের মাটির প্রতি আকর্ষণ বেশি। যদি এদের ছদ্মবেশে চলাফেলা করা এবং পার্থিব তথ্য সংগ্রহই মতলব হ'য়ে থাকে তবে ফ্রান্সের তুল্য জায়গা আর নেই। সেখানে শিশুরা হাঁটতে শেখার সঙ্গে মদ খেতে শেখে এবং তিন বছরের শিশুর ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্স হয়—এই তো সেদিনের খবর। অতএব ফ্রান্সের মতো মদ্যরসোন্মাদ জাত পৃথিবীতে আর নেই। হয় তো এই জন্যই চুলচেরা বিচারে এবং বিশুদ্ধ লজিকে তারা অতিশয় অগ্রগামী জাতি। উড়ন্ত গোলক থেকে যে মঙ্গলিনীরা সত্যিই নেমেছে এ কথার প্রমাণও সেজন্য একমাত্র ফরাসীরাই দিতে পারে, অন্তত যুক্তির সাহায্যে। ৪৮০

উড়ন্ত গোলক বা চক্র বাস্তব হোক বা অবাস্তব হোক, এ থেকে একটি বিষয় প্রমাণ হয় এই যে, যুদ্ধোৎসাহীদের মনে অবিলম্বে যুদ্ধ বাধবে এ আশা যে কারণেই হোক বর্তমানে কিছু ক্ষীণ হয়েছে। তা না হ'লে আকাশে এমন ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাতের সময় তাদের হ'ত না। অথবা যুদ্ধোৎসাহীদের সক্রিয় মগজ হঠাৎ নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়বে ভয়ে আকাশে এই ডাইভার্শন সৃষ্টি করা হয়েছে? ৪৮১

হয়তো বা গত যুদ্ধই এর জন্য দায়ী। যুদ্ধের পর থেকে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসই যখন চ'ড়ে গেল, তখন অপ্রয়োজনীয়েরাই বা ব'সে থাকে কি ক'রে? তাই চায়ের ফাটা ডিশ, চুরুট এবং প্রি-ফ্যাব বাড়ি, সব এখন শূন্যে চ'ড়ে জ্যোতির্ময় হ'য়ে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে এ চড়া ইনফ্লেশনের চড়া, সহজে নামবে না। ৪৮২

কিন্তু যদি নামে। যদি কেন, কয়েকবার তো নেমেছে। উড়ন্ত গোলক থেকে শেষ যে দুজন গোলকবিহারিণী মঙ্গলিনীর অবতরণ কথা বলা হয়েছে তারা পদ্মপত্রে জলের মতোই ক্ষণকালের জন্য ফরাসী-পত্রে (পাত্রে নয়) নেমেছিল। তারা যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা তাদের সিদ্ধ হয়েছে। তারা এসেছিল পৃথিবীতে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, যুদ্ধচিন্তা থেকে মানুষের মনোযোগ সত্যিই অন্যদিকে ঘুরিয়ে

দেবার উদ্দেশ্যে। কোনো উপায়ে মানুষের চিন্তা এলোমেলো ক'রে দিতে পারলে এ কাজ সহজে সম্পন্ন হয়। ৪৮৩

তার প্রমাণ, এ বিষয়ে যে শেষ খবরটি বেরিয়েছে (যুগান্তর, ১৮ই অক্টোবর '৫৪) তাতেই পাওয়া যাবে। খবরটি ফ্রান্স থেকে পাঠানো হয়েছে ১৬ই অক্টোবর। খবরটি এই—মঙ্গলগ্রহ থেকে মানুষ নেমে আসছে এই চিন্তায় ফ্রান্সের অধিবাসীদের মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছে। গত রাত্রে উত্তর ফ্রান্সের এক কৃষক যখন তার মোটর গাড়ি মেরামত করার চেষ্টা করছিল সেই সময় তার এক প্রতিবেশী তাকে মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা মানুষ মনে ক'রে রাইফলের সাহায্যে দুবার গুলি করে। দুবারই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে তার মাথার পাশ দিয়ে মোটর গাড়িতে গিয়ে লাগে। ৪৮৪

এ রকম ঘটনা এখন অনেক ঘটবে। এখন গাড়ি হোক বা বাড়ি হোক তার পটভূমিতে কাউকে দেখলেই মনে হবে সে মঙ্গলী, অতএব তাকে লক্ষ্য ক'রে চালাও গুলি। অন্তত গুলি চালানোর পর বলা চলবে যে, তাকে মঙ্গলী ব'লে সন্দেহ হয়েছিল।...কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী মদ কি এখন এতই খারাপ হয়ে উঠেছে? ৪৮৫

একটি লাভজনক কৌশল

অভিজ্ঞতার অভাব হেতু ব্যবসা শেখানো আমার এলাকা বহির্ভূত। কিন্তু তবু একটি লাভজনক ফরম্যুলা সাধারণ্যে প্রচার করছি। ইচ্ছাটা জেগেছে জল মেশানো দুধের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ দেখে। খবর থেকে জানা যায় মানিকতলা অঞ্চলে এক গোয়ালা প্রকাশ্য স্থানেই দুধে জল মেশাচ্ছিল, এমন সময় এনফোর্সমেণ্ট পুলিস তাকে হাতে-নাতে ধ'রে ফেলেছে। পুলিস বাধা সৃষ্টি না করলে ঐ দুধ আমরা এক টাকা সের কিনতাম আনন্দের সঙ্গে। কিন্তু এই কেনা কি সত্যই অপরিহার্য? ৪৮৬

আমর ফরম্যুলা এই—বিদেশী পূর্ণস্নেহ গুঁড়ো দুধ (ফুল ক্রীম মিল্ক পাউডার) এক পাউণ্ড এক টাকা বা পাঁচসিকেয় কিনতে হবে। এ থেকে উৎকৃষ্ট দুধ হবে প্রায় তিন সের। এই তিন সের দুধের সঙ্গে এক বালতি জল মিশিয়ে নিলেই খোলা বাজারে যে জলমেশানো দুধ বিক্রি হয় তার সমান হবে—সের প্রতি খরচ পড়বে চার পয়সা। প্রতি সেরে পনেরো আনা বাঁচবে। ৪৮৭

শিক্ষিত ডাকাত

গত সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গে ষাটটি ডাকাতি হয়েছে। এর মধ্যে বরিশালের একটি ঘটনায় ডাকাতেরা পরস্পর ইংরেজীতেও কথা বলেছে। এরা সবাই শিক্ষিত ডাকাত। শিক্ষার আরও বিস্তার হওয়া দরকার যাতে সকল জাতীয় ডাকাতিতে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা বাড়তে পারে। শিক্ষিত লোক বেশি এলে ডাকাতি নরহত্যা প্রভৃতির গৌরব অবশ্যই বাড়বে। ৪৮৮

কয়লা ও নার্স

একটি খবর থেকে জানা গেল, বাংলা দেশের এক হাসপাতালের হিসাব পরীক্ষার সময় প্রকাশ পেয়েছে যে, সেখানকার নার্সদের কোয়ার্টার্সে জল গরম করার জন্য সমস্ত বছর দৈনিক ৫৬ মোন ক'রে কয়লা লেগেছে। এই খবর পড়ে হঠাৎ মনটা খুশি হয়ে উঠল। একটি সন্দেহ মনকে পীড়িত ক'রে আসছিল কয়েক বছর ধ'রে, যখন থেকে প্রথম জানতে পারি কোনো কোনো হাসপাতালের নার্স রোগীর সঙ্গে উদাসীন ব্যবহার করেন। নার্স হওয়া সত্ত্বেও সেবাকাজে মনে কোমলতা নেই কেন, মনে মমতার উত্তাপ নেই কেন, এ কথা ভেবে কোনো কূলকিনারা পাওয়া যায়নি। এখন বুঝতে পারলাম—কয়লার অভাব। যে হাসপাতাল দৈনিক ৫৬ মোন কয়লা পোড়াতে পারে, শুধু সেই হাসপাতালে নার্সদের মনে উত্তাপ জাগবে, নইলে মন হিমশীতল থাকবেই। ৫৬ মোন কয়লাও পোড়ে না, নার্সও নাচে না, এই সত্যটি আবিষ্কার ক'রে মন প্রফুল্ল আছে। ৪৮৯

প্রতারক চাকরিদাতা

কলকাতা পুলিসের ডিটেকটিভ বিভাগ থেকে পোস্টার প্রচারের কথা শোনা গেছে, তাতে নাকি লেখা আছে—আপনি কি টাকা জমা দিয়ে অথবা শেয়ার কিনে কোথাও চাকরি নিতে চলেছেন? এ রকম অবস্থায় অনুগ্রহ ক'রে কলকাতা পুলিসের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে পূর্বে পরামর্শ করুন। ৪৯০

বলা হয়েছে এতে অসতর্ক চাকরিপ্রার্থী সাবধান হবে, প্রতারকদের হাতে পড়বে না। কিন্তু এতে ফল হবে কতটুকু? দু'চার জন, যারা শত শত চাকরিপ্রার্থীর মতো নিতান্ত অভাবগ্রস্ত নয়, তারা হয় তো ভাবতে পারে কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু যারা সম্ভাবিত চাকরির জন্য একদিনও অপেক্ষা করতে পারে না তারা ঐ বিজ্ঞপ্তি গ্রাহ্যই করবে না। তারা হাতে কলমে না ঠকলে কিছুই গ্রাহ্য করে না।

সম্পন্ন মানুষের দেখা পাওয়া গেছে, কিন্তু এ যুগে মানুষের মধ্যে ভৌতিকতাবোধ জেগেছে খুব বেশি। শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। ১০০

পৃথিবীর শহরগুলি সবই নতুন চেহারা পাচ্ছে, কাজেই ভূতদের জন্য আর্বান কলোনি আর গড়া চলবে না। এখন পুরনো ইটকাঠ দিয়ে সাব-আর্বান কলোনি বা পল্লী-কলোনি গঠন করা প্রয়োজন। পল্লী-কলোনী অবশ্য বড় বড় গাছ দিয়ে গড়া চলে। যাই হোক, অবিলম্বে কর্তব্য। ভূতে মানুষে ক্রমে একাকার হ'য়ে যাচ্ছে এটি আর ভাল লাগছে না। ১০১,২৪-৭-৫৫

আস্ফালনের যুগ

পঞ্চাশ বছর প্রায় হয়ে এলো, বাংলা বিভাগ হওয়ার ফলে এদেশে যে নব-জাগরণের একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে সমস্ত দেশময় ভেঙে পড়েছিল, সে যুগের মূল্য কি আমরা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করেছি? সে যুগে বোমা ছিল, হিংসা ছিল, হত্যা ছিল, একথা ঠিক। কিন্তু ছিল ব'লেই তো স্বাধিকারপ্রমত্ত ইংরেজের সঙ্গে বালক ও যুবক বাঙালীর অসম দ্বন্দ্ব বাঙালী জাতিকে, ও পরে সমগ্র ভারতবর্ষকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তুলতে সাহায্য করেছিল। গান্ধীজি অহিংসা যুদ্ধ প্রবর্তন করলেন অনেক পরে, কিন্তু তা সব সময় অহিংস থাকেনি। অহিংস যুদ্ধের জন্য একটা জাতিকে তৈরি করতে সময় লাগে, সে সময় তিনি পাননি, তাই ফাঁক পেলেই হিংসা মাথা তুলেছে, যদিও তিনি তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন একাধিকবার। ১০২

কিন্তু তবু গান্ধীজির পন্থাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। ঠিক ঐ একই কারণে স্বদেশী আন্দোলনের যুগকেও আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। কিন্তু শ্রদ্ধার পরিবর্তে সে যুগকে স্বদেশী আস্ফালনের যুগ বলায় কেমন একটা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। অথচ গত ২৪শে জুলাই রবিবার পত্রান্তরে প্রকাশিত খবরে আস্ফালন কথাটিই ব্যবহৃত হয়েছে, সম্ভবত স্বদেশী যুগের সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্যোক্তাদের দ্বারাই। ১০৩

খবরটি এই—

স্বদেশী আস্ফালনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব কমিটি গঠিত

"অদ্য ১২৫ নং রাসবিহারী এভেনিউ-এ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভারতের স্বদেশী আস্ফালনের সুবর্ণ-জয়ন্তী উদযাপনের উদ্দেশ্যে

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তকে প্রেসিডেণ্ট এবং অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীকে সেক্রেটারি করিয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে।”…ইত্যাদি। ১০৪

সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্যোক্তাগণ আশা করি বিষয়টি ভেবে দেখবেন। সে যুগে যাঁরা স্বদেশী করেছেন তাঁরা বিপ্লবী ছিলেন, তাঁরা যা বিশ্বাস করেছেন তা প্রাণ দিয়ে ক'রে গেছেন। সে যুগে সত্যই আস্ফালন ছিল না। আস্ফালনের যুগ হচ্ছে বর্তমান যুগ। এখন আমরা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘরে ব'সে আস্ফালন করি, প্রতিকার কিছুই করতে পারি না। বাঙালীর যা কাম্য, যা তার প্রাণ চায়, তা এখন আর সে নিজ হাতে গ'ড়ে তুলতে পারে না। এখন অন্যেরা এগিয়ে চলেছে, আমরা দেখছি বসে বসে। ১০৫

কিংবা হয়তো শব্দের অর্থ ই ব্যাপক হচ্ছে, কিংবা বদলে যাচ্ছে। যেমন রাষ্ট্রনীতিতে দর-দস্তর আগেও চলত, কিন্তু তার নাম সামিট টক ছিল না। চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও চূড়া-তলের আলোচনা ছিল না। এখন হয়েছে। এর অনুকরণে বাজারেও এখন সব সামিট-প্রাইস, চড়া দরের বদলে চূড়া-দর। যার উপরে আর কিছু নেই, শুধু পতাকা উড়ছে—প্রাইভেট ব্যবসায়ীর পতাকা। ১০৬

৩১-৭-৫৫

মহিলাদের একটি ভুল আন্দোলন

নতুন দিল্লী ও দিল্লী সিটিতে এক অভিনব আন্দোলন শুরু করছেন মহিলারা। এক এক দল মহিলা দোকানে গিয়ে শো-উইণ্ডোতে মেয়েদের পোষাক রাখা নিষেধ করবেন। 'আদর্শ মহিলা সভা'তে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যে, মহিলারা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করবেন এ রকম শস্তা উপায়ে তাঁরা যেন নারী জাতিকে কলঙ্কিত না করেন। তাঁরা আরও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ফেডারেশনকে অনুরোধ করবেন যাতে ব্যবসায়ীরা কোনো পণ্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে স্ত্রীলোকের ছবি ব্যবহার না করেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে নারী পবিত্রতা সরলতা ও ত্যাগের প্রতিমূর্তি, অতএব সে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু হ'তে পারে না। ১০৭

এই দুটি অনুরোধই খুব যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, মেয়েদের পোষাক বা মেয়েদের মূর্তি এ দুটি শব্দের সঙ্গেই কোনো বিশেষণ ব্যবহার করা হয়নি, তা থেকে

মনে হয়, যত সুন্দর ভাবেই শাড়ি ব্লাউজ ইত্যাদি শো-কেসে রাখা হোক বা নারীমূর্তি আঁকা হোক, তা তাঁদের কাছে আপত্তিকর হবেই। সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায়, বস্ত্রহীন নারীমূর্তিতে বা ছবিতে আপত্তি যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু মূর্তিহীন বিশুদ্ধ নারী-বস্ত্রের কি অপরাধ? তা হ'লে তো সমাজ থেকে মেয়েদের অস্তিত্বই নিষিদ্ধ করতে হয়। তাদের ব্যবহার্য যাবতীয় জিনিস নিষিদ্ধ করতে হয়। অর্থাৎ নিয়ম হওয়া উচিত পথে মেয়ে দেখলেই গুলি করবে এবং কারো হাতে শাড়ি ব্লাউজ দেখলে তা কেড়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেবে। ৭০৮

সংসারে যেসব জিনিসের সীমারক্ষার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে তার মধ্যে উৎসাহের সীমা বোধ হয় সর্বপ্রধান। কারণ এই জিনিসটি সীমা ছাড়ালে অনেক বিড়ম্বনা। আদর্শ মহিলাসভাকে এই অতি-উৎসাহের হাত থেকে বাঁচানো দরকার। যদি তাঁরা "পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনে স্ত্রীলোকের ছবি ব্যবহারে স্ত্রীজাতির অপমান হবে কেন" এব যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পাবেন—তা হলেই তাঁরা সুস্থ হবেন। নারীর ব্যবহার্য জিনিসকে পণ্য করা মানে যদি নারীকে পণ্য করা হয়, তা হলে তাঁদের মনের জট অবিলম্বে খুলে দেওয়া দরকাব। ৭০৯

তা সম্ভব না হ'লে শাড়ির বিজ্ঞাপনে (বিজ্ঞাপনেও যদি আপত্তি না থাকে) পুরুষকে শাড়ি পরাতে হবে। কোনো শিশু-পথ্যের বিজ্ঞাপনে মায়ের ছবি আঁকা চলবে না, আঁকতে হবে পিতার কোলে শিশু দুধ খাচ্ছে। কেশ প্রসাধনের বিজ্ঞাপনেও পুরুষের দাড়ি ব্যবহার করতে হবে ছবিতে। কিন্তু দোকানে যখন মেয়েদের পোষাক ঝোলানো নিষেধ, তখন তার ছবিও কাগজে ছাপা অবশ্য নিষেধ হওয়া উচিত। হবেও হয় তো তাই। এবং তখন এর একমাত্র পরিণতি হবে সংসার থেকে নারী-জাতিকেই বিদায় করা। ৭১০,১৪-৮-৫৫

শত্রুর প্রবেশ পথ

আত্মরক্ষার জন্য যত পাকা ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, কোথাও বিন্দু পরিমাণ খুঁত থাকলে শত্রু ঠিক সেই পথে এসে ভিতরে প্রবেশ করে। লখিন্দরের জন্য লৌহ-বেষ্টনী দেওয়া ঘর তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তাতে সরষে পরিমাণ ছিদ্রের খুঁত ছিল, সাপ সেই পথেই প্রবেশ ক'রে তার প্রাণসংহার করল। ৭১১

দেহের কোনো অংশ যদি অশুচি থাকে—আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীদের মতে—ভূত

প্রেত বা পিশাচ নাকি সেই পথে এসে দেহে ভর করে। গ্রীক পুরাণে আছে অ্যাকিলিসের মা থেটিস অ্যাকিলিসকে অমর করবার জন্য স্টিক্স নামক নদীতে ডুবিয়েছিলেন, তাতে তার সর্বাঙ্গ দুর্ভেদ্য হয়েছিল, কিন্তু গোড়ালিটি তার মায়ের হাতে চাপা ছিল ব'লে সেখানে স্টিক্সের জল লাগতে পারেনি। অ্যাকিলিসের দুর্বলতম দেহাংশ তার গোড়ালি, মৃত্যু প্রবেশ করল সেই পথে, অ্যাপোলোর হাতে। ৭১২

ভারতবর্ষের মধ্যে এখন সবচেয়ে দুর্বল অংশ হচ্ছে পর্টুগীজদের বিন্দু রাজ্যগুলি। আমরা ভারতে যেমন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিনি, তেমনি আমরা বিদেশীদের বিন্দুরাজ্যও সহ্য করব না। কিন্তু ভারতের শত্রুরা (তার মধ্যে ইংরেজরাও আছে, যদিও অতি প্রীতিবশত রক্ষণশীল নাম দিয়ে তাদের পৃথক ক'রে দেখছি) ঐ রাজ্যগুলো জিইয়ে রাখতে চায় নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে। তারা জানে পথ যত সঙ্কীর্ণ হোক, পথটা যদি থাকে তবে কোনো না কোনো ছুতো ক'রে সেই পথে তারা ভারতে পুনঃ-প্রবেশ করতে পারবে। ঐ বিদেশী জলদস্যুদের রাজ্যগুলি হচ্ছে অ্যাকিলিসের গোড়ালি। ১৯৪৭ সালেই ওর ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোন্ থেটিসমাতা ভারতকে স্টিক্সের জলে ডোবাবার সময় তার গোড়ালি চেপে ধরেছিলেন কে জানে। ৭১৩

বিলেতের সবাই মিলে এখন ভারতকে উপদেশ দিচ্ছেন, বলছেন এ তোমাদের বড়ই অন্যায়। অথচ নিজেরা ভারত ছেড়ে কিন্তু মহানুভব সেজেছেন! উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এতে আরও প্রমাণ হয় গোয়া আন্দোলন ঠিকই হচ্ছে। গোয়াকে এতকাল স্বীকার ক'রে নেওয়াই হয়েছে আমাদের 'গোয়ায় গলদ'। ৭১৪

জ্ঞানীর গুপ্ত আশ্রয় ত্যাগ

গত ১১ই অগস্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় এই খবরটি ছাপা হয়েছে :

বরোদা, অগস্ট ১০,• ভারুচের সেবাগ্রাম দাবাখানায় ডাক্তার পারিখ একটি স্ত্রীলোকের পেটে অস্ত্র-প্রয়োগ ক'রে এক মৃত সন্তান বা'র করেছেন। ঐ সন্তান ঐ স্ত্রীলোকটির পেটে গত ১৭ বছর ধ'রে আবদ্ধ হয়ে ছিল। রাজপুত স্ত্রীলোক, বয়স ৬৫ বছর। এক্স-রে পরীক্ষায় এই প্রথম ধরা পড়ে যে, পেটে সন্তান আছে। ৭১৫

পৃথিবীতে এমন ঘটনা ইতিপূর্বে অন্য কোথাও ঘটেছে ব'লে জানা যায়নি। চিকিৎসা জগতে এটি একটি বিস্ময় ব'লেই হয় তো মনে হবে। আমি জানি তাঁরা এর কোনো

ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না। অথচ ব্যাখ্যাটি খুব দুরূহ নয়। প্রাচীন যুগের মতো বর্তমান যুগেও এ রকম ঘটনা একমাত্র ভারতবর্ষেই ঘটতে পারে, কারণ এখানে মিরাকল্-এর স্থান এখনও আছে। চিরদিনই থাকবে। ৭১৬

আজ থেকে ১৭ বছর আগে ছিল ১৯৩৮ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের এক বছর আগে। সেই সময় এবং তখন থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ব্যক্তির এই ভারতবর্ষেই আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-বশত তা আর হ'ল না। পাঠকেবা বুঝতে পারছেন আমি ঐ ৬৫ বৎসর বয়স্কা বাজপুত রমণীর মৃত সন্তানের কথা বলছি। ৭১৭

এই জ্ঞানী ব্যক্তিটি মাতৃগর্ভে থাকতে যখনই বুঝতে পারলেন—জন্মালেই যুদ্ধের ও যুদ্ধের আনুষঙ্গিক যাবতীয় বীভৎসতার সম্মুখীন হতে হবে ; চারিদিকে ব্ল্যাক মার্কেট, চারদিকে হাহাকাব, এরই মধ্যে বাস করতে হবে, পরমাণু যুগের ধ্বংসলীলাব ভিতর দিয়ে হিংস্রতর যুগে উত্তীর্ণ হতে হবে ; তখনই তিনি জন্মাবেন না, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা ক'রে মাতৃগর্ভেই বয়ে গেলেন। রয়ে গেলেন দীর্ঘ সতেরো বছর। এমন বীভৎস পৃথিবীতে কে আব জন্মায়। ৭১৮

বেশ ছিলেন সেখানেই, কিন্তু ডাক্তারেরা তাঁর মায়ের পেটে অস্ত্রপ্রয়োগ ক'রে সেখানে যখন এ যুগের বিষাক্ত আলো-হাওয়া বইয়ে দিলেন, তেজস্ক্রিয় ভস্মের গন্ধ তাঁর নাকে প্রবেশ করল, তখনই তিনি ডাক্তারদের চালাকি বুঝতে পেরে ইহলোকের গুপ্ত আশ্রয় ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। রিটার্ন টিকিট কাটাই ছিল, আমাদের সবারই যেমন আছে। ৭১৯

আধুনিক সমালোচক বলবেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনো ভীরু হন না, তাঁরা সংসারের দুঃখ চরমে উঠলে সংসার ত্যাগ করেন না, সংসারকে 'এস্কেপ' করেন না, দুঃখকে এড়িয়ে, দুঃখীকে এড়িয়ে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' নীতিকে আশ্রয় করেন না, বরং যা করেন তা ঠিক এর বিপরীত। অর্থাৎ অধর্মের বাড়াবাড়ি হ'লে, দুঃখপীড়া চরমে উঠলে, তাঁরা আবির্ভূত হন। ভারতীয় জ্ঞানী লোকের সংজ্ঞা হচ্ছে এই। অবশ্য বিপরীত দলের সংজ্ঞাও প্রস্তুত আছে—তাকে বলা যায় আধুনিক সংজ্ঞা, অর্থাৎ আধুনিক কালের বিচারে যিনি জ্ঞানী তাঁর সংজ্ঞা। ৭২০

জ্ঞানীর আধুনিক সংজ্ঞা

আধুনিক কালের বিচারে তিনিই জ্ঞানী যিনি ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলেন না, ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করেন না। সামনে গুরুতর অন্যায় অনুষ্ঠিত হ'তে দেখেও চুপ ক'রে থাকেন, ঘটনা ঘ'টে গেলে উপদেশ দেন। তিনি কোনো গোলমালের মধ্যে যান না, একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করলে যেখানে একটি গুরু অন্যায় বন্ধ হ'তে পারে সেখানেও তিনি বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে থাকেন। সংসারের দুঃখকে পরিহার করেন তিনি সযত্নে, সর্বক্ষেত্রে তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তি। দেখে লোক বলে সংসার বিরাগী জ্ঞানী। ৭২১

এই সংজ্ঞা, ভারুচের ঐ সপ্তদশবর্ষগর্ভবাসী ভ্রূণ সম্পর্কেও খাটে। অর্থাৎ আধুনিক সংজ্ঞাতেই তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। যে বয়সে ভ্রূণ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে সম্পূর্ণ আত্মচেতনাহীন অবস্থায় থাকে—সেই অবস্থায় তিনি আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত অভিসম্পাতের কথা বিবেচনা করেছেন এবং দীর্ঘ সতেরো বছর পৃথিবীর অন্নগ্রহণে অস্বীকার ক'রে পেটেই রয়ে গেছেন! অবশ্য শুধু এইটুকুই তাঁর মাহাত্ম্য প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি এর উপরেও মাহাত্ম্য দেখিয়ে পৃথিবীর আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে আসামাত্র পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আর কি। ৭২২

চাঁদের প্রোমোশন ?

পৃথিবীর চারদিকে উপগ্রহ ঘোরাবার মতলব করছেন যে সব মার্কিন বিজ্ঞানী, তাঁরা ভাবছেন অতঃপর চাঁদের চারিদিকেও অন্তত একটি উপ-উপগ্রহ ছাড়তে হবে। খুব বিবেচনাসঙ্গত কথা। 'একচন্দ্র'-পৃথিবীর চন্দ্রাধিক্য ঘটলে আমাদের প্রাচীন চাঁদের ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। তা ভিন্ন সিনিয়রিটির দাবীতে অকৃত্রিম চাঁদকেও যদি কৃত্রিম নবাগত চাঁদের সঙ্গে একই বেতনে একই কাজ করতে হয়, তা হ'লে সে হবে তার পক্ষে বড়ই অপমানজনক। এটি বুঝেই সম্ভবত চাঁদকে গ্রহের মর্যাদায় প্রোমোশন দেবার জন্য তাকে একটি উপগ্রহ দান করবার কথা ভাবা হচ্ছে। এজন্য মার্কিন বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানাই। ৭২৩,২১-৮-৫৫

হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ

কেরোর একটি খবরে প্রকাশ জনৈক পুরুষ নার্স একটি আরব প্রবাদবাক্য শুনে এমন হাসতে আরম্ভ করে যে তাকে আর থামানো যায় না। সে হাসতে হাসতে মারা

গেছে। প্রবাদবাক্যটি কি তা প্রকাশ করা উচিত কি না ভাবছি। আমরা যে-কোনো হাসির ব্যাপারে বলি বটে 'হাসতে হাসতে মরি' বা 'হেসে মরি', কিন্তু সত্যিই মরি না। ওটি 'আহা মরি' জাতীয় শব্দ। কিংবা 'মরি মরি' জাতীয়। ১২৪

আসলে 'মরি মরি' 'বাঁচি বাঁচি'র অতিশোয়োক্তি। কোনো দৃশ্য বা সংগীত বা ঘটনা যখন আমাদের বিষণ্ণ জড়মনকে হঠাৎ চাঙ্গা ক'রে তোলে তখন আমরা নিজেদের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বই অনুভব করি, মৃত্যুর নয়। অথচ বলবার সময় বলি মরি মরি! কবি যখন গেয়ে ওঠেন 'মরি মরি পূব হাওয়াতে দেয় দোলা', তখন তাঁর আসলে বলা উচিত 'বাঁচি বাঁচি পূব হাওয়াতে'...। কিন্তু যা নিছক সত্য, তার বিবৃতি গান নয়। তাই বাঁচি বাঁচির উল্টো 'মরি মরি' গান। এবং কেরোর যে নার্স 'হেসে মরি' না ব'লে হেসে সত্যিই মরে গেল, সে নিছক গদ্যে একটি সাধারণ ঘটনা ঘটাল মাত্র। লোকটির রসবোধ থাকলে সম্ভবতঃ এ কাজ করত না। ১২৫

যে প্রবাদ বাক্য শুনে কেরোর নার্স মরেছে, তা প্রকাশ করায় এখন আমাদের দেশেও বিপদ আছে। কারণ এদেশেও এখন রসবোধের অভাব ঘটছে। ভয় আছে সে জন্য। হাসতে হাসতে সত্যিই ম'রে যাওয়া মানে হাসির উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ ক'রে দেওয়া। এ দলে লোক বাড়ছে ক্রমশঃ। একটি অন্ততঃ বিরোধী দল গণতন্ত্রে থাকা দরকার এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, হয় তো রস-বিরোধী দলেরও অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু দেখতে হবে রস-বিরোধীরা সংখ্যায় রসপক্ষীয়দের ছাড়িয়ে না যায়। ১২৬

অতএব আমাকে সেই প্রবাদ বাক্যটি প্রকাশ করতেই হবে, অন্ততঃ এই আশায় যে, এটি প'ড়ে রস-বিরোধীরা অন্ততঃ হাসবে। এতে রসিক ব্যক্তির হাসবার সম্ভাবনা আমি দেখছি না, অতএব ভয় নেই। এবারে আসল ঘটনাটি প্রকাশ করি। কেরোর ঐ মৃত নার্সটি কিছুদিন যাবৎ অসুখে ভুগছিল। নার্সের নাম এজব রাতুয়ান। সে তার এক বন্ধুর কাছে গিয়ে নিজের অসুখের কথা বলে। তখন বন্ধু এই প্রাচীন প্রবাদটি তাকে বলে—"ছুতোরের নিজের দরজাই সব সময় ভেঙে পড়ে।"—এই অর্থে বলে যে, যে লোকটি অসুস্থ লোকদের শুশ্রূষা করে, সে নিজেই অসুস্থ হয় এই হচ্ছে মানুষের প্রতি বিধাতার ব্যঙ্গ। কিন্তু প্রবাদ বাক্যটিতে রাতুয়ান এমন সশব্দে হাসতে থাকে যে সেই হাসির চোটে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়। রসিক

লোকেরা বলবে এতেই এত হাসি?—হয় তো ঠিকই বলবে। আমিও সেই ভরসাতেই এটি প্রকাশ করলাম। ১২৭

প্রতি মন্ত্রীর চারটি পাশবিক গুণ

আহমেদাবাদের খবর: কেন্দ্রীয় খাদ্য উপমন্ত্রী এম ভি কৃষ্ণাপ্পা বলেছেন আদর্শ মন্ত্রী হতে হ'লে প্রত্যেক মন্ত্রীতে চারটি পশুর বিশেষ গুণাবলী থাকা দরকার। তিনি বলেছেন: যে কোনো আদর্শ মন্ত্রীকে উটের ন্যায় পরিশ্রমী হ'তে হবে, তার চামড়া হবে মোষের মতো পুরু, তাকে খাটতে হবে গাধার মতো এবং ঘুমোতে হবে কুকুরের মতো। ১২৮

কিন্তু বক্তা সম্ভবত ভুলে গেছেন যে, সকল মানুষের মধ্যেই অনেকগুলো ক'রে পশু বাস করছে আদিকাল থেকে। মানুষ হচ্ছে animality ও rationality-র যোগে তৈরি প্রাণী। অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ পাশবিক শক্তি ও বিবেচনাশক্তি দিয়ে তৈরি। অন্য কোনো প্রাণীর বিবেচনাশক্তি নেই। Animal-এর অর্থ যদি পশু না হয়ে শুধু প্রাণী হয় তাহলে মানুষের মধ্যে পশুপাখী কীটপতঙ্গ সবই আছে। উক্ত উপমন্ত্রী মহাশয় এর পরেও চারটি পশুর গুণ যোগ করতে বলেছেন। ১২৯

কিন্তু এর অসুবিধার দিকও একটি আছে, সেটি সম্ভবত চিন্তা করা হয়নি। সেটি হচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যে যে প্রাণী বা পশু অংশ আছে তার পরিমাণ সবার ক্ষেত্রে এক নয়। কোনো মানুষের মধ্যে গাধা বেশি আছে, কারো মধ্যে কুকুর বেশি আছে, কারো মধ্যে উট বেশি আছে, কারো মধ্যে বা মোষ বেশি আছে। মন্ত্রী হলেও এই পশুত্ব লোপ হয় না। যে মন্ত্রীর মধ্যে উটের গুণ প্রধান তাঁকে আর সাধনা ক'রে উট হতে হবে না। যাঁর মধ্যে গাধার গুণ বেশি তাঁকে আর কষ্ট ক'রে গাধা হবার দরকার কি?—তবে এটা ঠিক যে, মন্ত্রী হ'তে হ'লে প্রত্যেকেরই পিঠের চামড়া পুরু হওয়া দরকার। কিন্তু সেজন্য মোষ খুব বড় আদর্শ ব'লে মনে হয় না। চামড়াটা গণ্ডারের হ'লেই ভাল। ১৩০, ২৮-৮-৫৫

বিবাহ-মিটার

ব্রিস্টল (ইংল্যাণ্ড)-এর খবর—বিজ্ঞানীরা এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে সুখের বিবাহের উপায় জানা যেতে পারবে। অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে কোন্ ছেলের সঙ্গে কোন্ মেয়ের ভাল জোড় মিলবে তা এই যন্ত্র মগজ পরীক্ষা ক'রে

বলে দেবে। যন্ত্রটি অবশ্য এখনও বাজারে আসেনি, জবরজং পর্যায়ে আছে—সুদৃশ্য এবং সহজ ব্যবহার্যরূপে অল্পদিনের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করবে আশা করা যায়। ৭৩১

কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ যন্ত্রের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, তা সিদ্ধ হবে কিনা সন্দেহ। কারণ মনের মতো সঙ্গী কে হবে তা হয়তো এ যন্ত্র একবার ব'লে দিতে পারে, কিন্তু মানুষ আমরণ অপরিবর্তিত থাকবে এমন গ্যারান্টি কে দেবে? ধরা যাক যন্ত্রের নির্দেশে কোনো ব্যক্তি মনের মতো স্ত্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হ'ল, কিন্তু যন্ত্র কখনো বলতে পারবে না এদের দাম্পত্যজীবন বরাবর সুখে কাটবে কিনা। কত কারণে মানুষের মনের, ইচ্ছার এবং প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের পূর্বাভাস কোনো যন্ত্রে ধরা পড়তে পারে না। হয়তো এজন্য প্রতি সপ্তাহে স্বামী স্ত্রীকে একবার ক'রে যন্ত্রীর কাছে পাঠাবে চেক-আপ করানোর জন্য অথবা স্ত্রী স্বামীকে। দিন কয়েক দাম্পত্যজীবন সুখে কাটাবার পরেই যখন খিটিমিটি বাধবে, তখনই (অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সদভিপ্রায়ী হয়) স্বামী বলবে প্রিয়ে, অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না, চল একবার ল্যাবরেটরিতে। কিংবা স্ত্রী স্বামীকে বলবে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে—চল একবার দেখিয়ে আনি। ৮৩২

বাস্তব জীবনে অবশ্য এ রকম হবে না। ঝগড়ার মধ্যে যে একটা মাধুর্য আছে তা নষ্ট ক'রে মগজ পরীক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী কেউ ল্যাবরেটরিতে যেতে রাজি হবে না। আর গিয়েই বা লাভ কি। যদি যন্ত্রে ধরা পড়ে স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল নষ্ট হয়ে গেছে, তখন কি ব্যবস্থা? ব্যবস্থা নেই। আর যে যন্ত্র মনকে বদলে দিতে পারে না, শুধু মৈত্রী বা বৈরিতার খবর ব'লে দিতে পারে, সে যন্ত্রের সার্থকতা খুব বেশি নেই। ৭৩৩

আর এ যন্ত্র যদি কখনো সমস্ত জীবনের খবরই একবারে বলতে সক্ষম হয়, তাতেই বা এর সার্থকতা বাড়বে কেন? দাম্পত্যজীবনের আনন্দ কি সমস্ত জীবনের সুখের গ্যারান্টির উপর নির্ভর করে? সমস্ত জীবন নির্ঝঞ্ঝাট, শান্ত, সমস্ত জীবন মনের মিল, সমস্ত জীবন এই পূর্বজ্ঞান কি সমস্ত জীবনের আনন্দকেই বিঘ্নিত করবে না? ৭৩৪

একটানা শান্তিময় জীবনের কোনো অর্থ নেই। বৈচিত্র্যহীন জীবন বৃথা জীবন। তাই মনে হয় এই যন্ত্র—অদ্যাবধি দাম্পত্যজীবনে যেটুকু আনন্দ অবশিষ্ট আছে—

তা নষ্ট করবে। কারণ দাম্পত্যজীবনের বা যে-কোনো জীবনের আনন্দ নির্ভর করে খানিকটা অনিশ্চয়তার উপর। জীবনের অ-দৃষ্ট অংশ প্রতি মুহূর্তে উদ্ঘাটিত হচ্ছে নতুন চেহারা নিয়ে। তাই তো জীবন এত সুন্দর। উপন্যাস পড়তে ভাল, লাগে, কারণ প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ঘটনা, নতুন নতুন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হয় মনশ্চক্ষুর সম্মুখে। বইয়ের প্রথম পাতাতেই বইয়ের শেষ পযন্ত জানা হয়ে গেলে বই পড়া বৃথা। বউ সম্পর্কেও তাই। ১৩৫

প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে পুনরাবৃত্তি আছে। পৃথিবী প্রতিদিন ঘুরছে, প্রতিদিন একই নিয়মে দিনের পরে রাত্রি আসছে, রাত্রির পরে দিন। তাই এর মধ্যে অনিশ্চয়তার আনন্দ নেই। কিন্তু বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি একই চেহারায় আসে না, তাই তাতে অহেতুক অনিশ্চয়তার আনন্দ। আবহবিদেরা মাত্র আগামী দু'চার দিনের ভবিষ্যৎ বলতে পারলেও তাতে ক্ষতি হয় না। ১৩৬

দাম্পত্যজীবনেও ঠিক তাই, সুখ-দুঃখ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ব'লেই এর মধ্যে যেটুকু অভিনবত্ব। অদেখা আগামী দিনগুলি কি চেহারা নিয়ে আসবে জানি না ব'লেই আমাদের জীবনে এত তৎপরতা। সমস্ত ভবিষ্যৎ একদিনে দেখা গেলে জীবন থেকে সমস্ত আনন্দ অন্তর্হিত হ'ত। ১৩৭, ১৮-৯-৫৫

রুচির বিরুদ্ধে সরকারী ও বেসরকারী আক্রমণ

সরকারী অফিসে মহিলা কর্মীদের রঙ-চঙা পোষাক ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে শুনেছিলাম। শাড়িতে পাড় থাকাও নিষেধ করা হয়েছিল মনে পড়ছে। নিশ্চিত ক'রে বলতে পারছি না, মহিলারা সাদা থান প'রে অফিস করছেন কি না। কারো জানা থাকলে বিষয়টি আমাকে জানাতে পারেন। কিন্তু সম্প্রতি মহিলাদের পক্ষ থেকে পুরুষের পোষাকের উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। ১৩৮

চিঠি লেখালেখি চলছে স্টেটস্‌ম্যানে। মহিলারা লিখছেন পুরুষেরা রঙীন নক্সা আঁকা বুশশার্ট প'রে বেড়ালে কিম্ভূত দেখায়। মেয়েদের নক্সা-আঁকা শাড়ি নিষিদ্ধ হ'ল সরকার থেকে, মহিলারা তার প্রতিশোধ নিচ্ছেন পুরুষদের বিলাসিতা হরণ ক'রে। পুরুষদের রঙীন নক্সাওয়ালা শার্ট দেখতে খুব ভাল। তালপাতা, সাপ, মৈ প্রভৃতির ছবি সমস্ত পেটে পিঠে হাতে—খুবই রুচিসঙ্গত পোশাক। কিন্তু এর শুধু বাইরে দেখলেই চলবে না। এই রঙচঙা নক্সা তার মনেরই প্রতিফলন—অর্থাৎ মনে যে

সব ছবি আছে বাইরে তারাই রূপ ধরেছে; এ থেকে পুরুষকে বঞ্চিত ক'রে লাভ কি? ৭৩৯

ডিজাইনগুলো বিলিতি তাই ওতে মৈ থাকবেই। মৈ বেয়ে জানলায় বা গাছে ওঠা ওদেরই যৌবন-ধর্ম। বিলেতি যুবকদের মনের ইডেন গার্ডেনে সাপও থাকা চাই। নইলে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াতে কে আর প্রলুব্ধ করবে। মৈ থাকা চাই আধুনিক কালে, কারণ এখন ইডেন উদ্যানের ফল পাড়তে মৈ দরকার, হাতে নাগাল পাওয়া যায় না। এত ভেবেচিন্তে এত আয়োজন ক'রে শার্টে এই নক্সা ছাপা হয়েছে, এখন এর প্রতিবাদ ক'রে লাভ কি? ৭৪০

মেয়েদের পোশাকে যদি আড়ম্বরহীনতা চালু হয় তা হ'লে সে আড়ম্বর পুরুষ নিয়ে নেবে এটা স্বাভাবিক। মেয়েদের ভাল ভাল নক্সাওয়ালা শাড়ি কেটে পুরুষ শার্ট বানাবে অতঃপর। ৭৪১

আরও কিছুদিন পরে যদি সরকারী আদেশে মেয়েদের কেশবাহুল্যও বাতিল হয়ে যায় এবং পুরুষের মতো খাটো চুলরাখা বাধ্যতামূলক হয় তা হ'লে পুরুষ দাড়ি রেখে খানিকটা ভারসাম্য রক্ষা করবে। ভাব-সাম্যও রক্ষা হবে এতে। প্রাণী জগতে স্ত্রীজাতিতেই সব সময় জাঁকজমক থাকে না। সিংহ ও সিংহী, মোরগ ও মুরগীর দিকে লক্ষ করলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। ৭৪২

পোশাক সম্পর্কে মহামতি কণ্বের মনে কি ধারণা ছিল জানি না, কিন্তু শকুন্তলা আধুনিক কালের সরকারী মহিলা কর্মীদের অপেক্ষাও হীন পোশাকে থাকা সত্ত্বেও দুষ্মন্ত বলেছিলেন—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।[১]
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

অতএব যাঁরা সাত রংকে একাকার ক'রে সব সাদা বানাবার পক্ষপাতী, তাঁরা নির্বোধের স্বর্গে বাস করছেন সন্দেহ কি। ৭৪৩

ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার কেটে পার হওয়ার প্রতিযোগিতায় এবারে শ্রীমিহির সেন

নামক একজন বাঙালী ব্যারিস্টার নেমেছিলেন, কিন্তু তিনি অকৃতকার্য হয়েছেন। জুলিয়াস সীজারের সময় থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হবার চেষ্টা চলছে—আজ পর্যন্ত নেপোলিয়ান, বিলহেলম কাইজার, হিটলার ও মিহির সেন ব্যতীত আর সবাই সাফল্যের সঙ্গে পার হয়ে গেছেন। ৭৪৪,২৫-৯-৫৫

উদোর পিণ্ডি উদোর ঘাড়েই

অ্যালাবামা (যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য) থেকে প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়—তথাকার ট্যালাডেগা নামক স্থানের মিসেস গাই-এর বাড়িতে মিসেস হজেস ঘুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় সেই বাড়ির উপর আকাশ থেকে উল্কাপাত হয় এবং উল্কার একটি টুকরোর আঘাতে মিসেস হজেসের হাত জখম হয়। উল্কাপিণ্ড পতনের সঙ্গে সঙ্গে মিসেস হজেসের কাছে ক্রেতাদের প্রস্তাব এলো। উল্কাপিণ্ডের সর্বোচ্চ দর উঠল ৫৫০০ ডলার! এদিকে বাড়ির মালিক মিসেস গাই আদালতে মিসেস হজেসের বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দিলেন, বললেন ঐ উল্কাপিণ্ড তাঁর বাড়িতে পড়েছে অতএব তার মালিকও তিনি। শেষ পযন্ত আদালতের বাইরেই দুপক্ষে একটা মিটমাট হয়ে গেছে: মিসেস হজেস মিসেস গাইকে ৫০০ ডলার দেবেন তাঁর মালিকানা বাবদ প্রাপ্য হিসাবে, এবং মিসেস গাই এই টাকা নিয়েই খুশি হবেন। ৭৪৫

উল্কাপিণ্ডটির ওজন প্রায় সাড়ে চার সের। বাড়ির মালিক মিসেস গাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন পিণ্ডটি যখন তাঁর বাড়িতে পড়েছে তখন ওটি তাঁরই, যদিও ওতে আঘাত পেয়েছেন মিসেস হজেস। অর্থাৎ মিসেস গাইয়ের মতে উক্ত পিণ্ডটি উদোর, বুধোর ঘাড়ে পড়েছে মাত্র। তবু ভাল যে একটা রফা হয়েছে। এই রফা থেকেই বোঝা যায় পিণ্ডটি বুধোর, অর্থাৎ তার নিজের পিণ্ডই তার নিজের ঘাড়ে পড়েছে। ৭৪৬

রায়গঞ্জ নামক স্থানের এক গলিপথের ধূলি সংগ্রহের জন্য স্ত্রীলোকেরা কাড়াকাড়ি করেছে, একটি খবরে জানা গেল। ঐ স্থানে পূর্বরাত্রে দেবীর আবির্ভাব ঘটেছিল। লাল সিঁদুর চিহ্নিত পায়ের ছাপ ছিল সেই গলিতে। খবরের মধুর শেষে একটি হুল জুড়ে দেওয়া হয়েছে—"এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঐ অঞ্চলে রঞ্জন পাউডারের একটি গুদাম আছে।" ৭৪৭

একবার রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল বীরভূম জেলার কোনো একটি জীর্ণ সেতুর ভাঙা

বহুদিনের বেকার জীবনে অথবা দারিদ্র্যে মনের যে অবস্থা গড়ে ওঠে, তাতে মনের এক অংশ যদি স্পষ্ট বুঝতে পারে ঠকাচ্ছে, অন্য অংশ ঠকে। তাই মনে হয় যদি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ডিটেকটিভ বিভাগ সেই বিজ্ঞাপনদাতাদের উপর নজর রাখে তা হ'লে সব প্রতারণার মূলোৎপাটন করা সম্ভব। ৪৯১

মনের পরিবর্তন

পত্রান্তরে প্রকাশিত এক 'চিঠি'র একটি জায়গায় একটি ঘটনা উল্লেখ ক'রে শেষের দিকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। ঘটনাটি এই: হায়দ্রাবাদে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় বহু যাত্রী নিহত ও আহত হয়, এই সুযোগে স্থানীয় অনেক দুর্বৃত্ত অসহায় যাত্রীদের টাকা পয়সা লুঠ করে। অতঃপর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি দুর্বৃত্তদের উদ্দেশে এক আবেদন প্রচার ক'রে অনুরোধ জানান—তারা যেন লুণ্ঠিত টাকা পয়সা ফেরৎ দেয়। এর ফলে নগদ টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মিলিয়ে আট হাজার টাকার চোরাই সম্পত্তি কংগ্রেস অফিসে জমা পড়ে। চিঠির লেখক এই ঘটনাটি মহাত্মাজির গুণ্ডাদের কাছে অস্ত্রসমর্পণের আবেদনের সঙ্গে তুলনা ক'রে প্রশ্ন তুলেছেন—"গান্ধীজির বহুবিঘোষিত মতবাদ 'মনের পরিবর্তন' অসম্ভব ব'লে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা এই বর্তমান ঘটনাকে কি বলবেন?" ৪৯২

বলবেন এই যে 'মনের পরিবর্তন' গান্ধীজির মতবাদ নয়, ওটি মানুষের মন সৃষ্টি হবার সময় থেকেই আছে। তা ভিন্ন হায়দ্রাবাদের ঘটনা অস্ত্রসমর্পণের চেয়ে বড় ঘটনা, কেননা অস্ত্র ত্যাগ মূল্যবান বস্তু ত্যাগ নয়, অহিংসা নীতিতে দীক্ষা নেবার প্রতিশ্রুতি মাত্র। প্রতিশ্রুতি অতি সহজেই ভাঙা যায়, অস্ত্র সংগ্রহ অতি সহজ। কিন্তু যারা স্বভাবদুর্বৃত্ত, তাদের পক্ষে লুণ্ঠিত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে ত্যাগ আছে। কারণ তারা ইচ্ছে করলেই পুনরায় আট হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারবে না। ইতিপূর্বে ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার ব্যাপারেও সরকার থেকে আবেদন প্রচার ক'রে অংশতঃ সাফল্য লাভ হয়েছিল। আসল ব্যাপার হচ্ছে আবেদন ক'রে একটি বা কয়েকজন মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটানো সোজা, একটা জাতির মনের পরিবর্তন ঘটানো সোজা নয়। যে সব শর্তে বা অবস্থায় তা সম্ভব সেই শর্ত বা অবস্থা সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন। বাধার পর বাধা এসে সব নষ্ট ক'রে দেয়, সেখানে শুধু আবেদন অচল হয়ে পড়ে, অতএব একটার সঙ্গে আর একটার তুলনা না করাই ভাল। ৪৯৩

চতুর ছেলে

গোরক্ষপুরে এক শিশুর জন্ম হয়েছে, তার ওজন এবং চেহারা ছ মাসের শিশুর মতো। বলা হয়েছে এটি এক অদ্ভুত শিশু। অদ্ভুতই বটে, তবে বুদ্ধির দিক দিয়েই অদ্ভুত। জীবনে দু তিনটি ক্ষেত্রে অনেক সময়েই বয়স কমানো দরকার হয়, তাতে অনেক হাঙ্গামা। এফিডেফিট করাতে হয়। এই সব এফিডেফিট ইত্যাদির হাঙ্গামায় না গিয়ে ছেলেটি একেবারে পেটে থাকতেই ছ মাস বয়স কমিয়ে নিয়েছে! —ছেলেটি বড়ই চতুর, সন্দেহ নেই। ৪৯৪

করুণ দৃশ্য

কোনো প্রাইমারি স্কুলের এক সাব-ইন্সপেক্টর, ঘুস না পেলে শিক্ষকের বেতন-বিল পাস করবেন না ঠিক করেন। শিক্ষক অগত্যা মহাকুমা শাসকের শরণাপন্ন হন। মহাকুমা শাসক দুখানা দু টাকার নোট ও চারখানা এক টাকার নোট চিহ্নিত ক'রে সেই টাকা ঘুস দিতে শিক্ষককে নির্দেশ দেন। পুলিসকেও ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এবং যেমন হ'য়ে থাকে, সাব-ইন্সপেক্টর এই ফাঁদে পা দিয়ে ধরা পড়েছেন। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক এবং স্কুলের সাব-ইন্সপেক্টর—দুইয়েরই কি করুণ ছবি। একজন দরিদ্র প্রাইমারি শিক্ষকের টাকা মারবার জন্য দরিদ্র সাব-ইন্সপেক্টরের কি অধ্যবসায়! ৪৯৫

কলকাতা জঞ্জাল ফেলার পাত্র

অমৃতবাজার পত্রিকায় (৩১-১০-৫৪) প্রকাশিত জেমস্ ক্যামেরন লিখিত চীন সম্পর্কিত প্রবন্ধের এক জায়গায় উল্লেখ আছে…"ট্রেনটি আদৌ নতুন নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে এর চেয়ে পরিচ্ছন্ন ট্রেন আমি আর দেখিনি। একটি লোক ছিল, তার কাজ হচ্ছে সর্বক্ষণ মেঝে থেকে সব রকম জঞ্জাল বা ধুলোর কণা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করা। আমার সিগারেট থেকে মেঝেতে ছাই পড়ামাত্র সেই লোকটি তা পরিষ্কার করতে করতে আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ছাই ফেলবার পাত্রটি দেখিয়ে দিল।…এরপর থেকে মেঝেতে কিছু নিক্ষেপ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আমার পকেট দুটি এখনও পোড়া দেশালাইয়ের কাঠিতে ভর্তি হয়েই আছে—এগুলো আমি সেখানে ফেলতে সাহস করিনি।" ৪৯৬

জেমস্ ক্যামেরন অতঃপর যা করবেন, তা লেখেননি। তা অনুমান করতে পারি। তিনি দুই পকেটের সেই পোড়া কাঠিগুলো নিরাপদে কলকাতার

রাজপথ ফেলে যাবেন একদিন। সমস্ত কলকাতা শহরটিই তো জঞ্জাল ফেলবার একটি বৃহৎ পাত্র। এখানে উন্মুক্ত রাজপথ শৌচাগাররূপে ব্যবহার করা চলে। লক্ষ বাড়ির যাবতীয় নোংরা নিক্ষেপের জন্যই তো রাজপথগুলো তৈরি। মানুষ মরতেও আসে এই কলকাতার রাজপথেই। ৪৯৭

কথা বলার হিসাব

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি হিসাব থেকে জানা যায়—যদি কোনো পুরুষ এবং স্ত্রী সত্তর বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকে তবে এই সময়ের মধ্যে পুরুষ মোট কথা বলেছে চার বছর, স্ত্রীলোক মোট কথা বলেছে পাঁচ বছর। কিন্তু এই হিসাবে কোথায়ও ফাঁকি আছে। সত্তর বছরের হিসাবে একটি স্ত্রীলোকের মোট কথা বলার সময় যোগ করলে মাত্র পাঁচ বছর হয়, একথা অবিশ্বাস্য। এমন কি অবিবাহিত স্ত্রীলোক হলেও অবিশ্বাস্য। সত্তর বছরে স্ত্রীলোক কুড়ি বছর কথা বলে। বিবাহিত স্ত্রীলোক কথা বলে পঞ্চাশ বছর এবং তার স্বামী ছ মাস। ৪৯৮,৭-১১-৫৪

বুদ্ধির উপার্জন

লণ্ডনের একটি জেলায় বা অংশে চেয়ারিং ক্রস্ ও দি মল নামক দুটি রাস্তা মুখে মুখে লাগা। এই জেলার কোনো এক পাবলিক হাউসে একজন মফঃসলীয় ইংরেজ মদ্যপান করতে করতে পরিবেশিকার সঙ্গে দশ মিনিট আলাপ ক'রে চলে যাচ্ছিল, পরিবেশিকা বলল—"আপনার দামটা?" "দাম তো আমি আগেই দিয়েছি" শপথ ক'রে লোকটা বেরিয়ে গেল। পরিবেশিকা স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে রইল প্রতারক লোকটির দিকে। তারপর এক স্কটসম্যান এই গল্পটি শুনেই সেই দোকানে এসে হাজির হ'ল এবং মদ্যপান করতে করতে পনেরো মিনিট ধ'রে পরিবেশিকার সঙ্গে আলাপ ক'রে বলল "আমার ভাঙানিটা চট ক'রে দিয়ে দাও তো, বড্ড তাড়াতাড়ি আছে।" ৪৯৯

বুদ্ধি থাকিলে এভাবে কিছু মুনাফা করা সর্বত্রই সম্ভব এবং লাহোর যদিও লণ্ডন নয় তবু সেখানেও চেয়ারিং ক্রস্ এবং মল আছে এবং সেখানেও একটি মুনাফা লভ্যের ঘটনা ঘটেছে—যদিও তার চেহারা কিছু স্বতন্ত্র। লাহোরের মলের পথে খালি টোঙ্গা চালানোর আইন নেই, চালালেই শাস্তি পেতে হয়। কাজেই টোঙ্গাওয়ালারা যাত্রী না পেলে চেয়ারিং ক্রস্ থেকে মলের পথে হাইকোর্টে যেতে পারে না, ঘোরা পথে যেতে বাধ্য হয়। গত ৩রা নভেম্বর এই রকম একজন টোঙ্গা-

চালকের সোজা মলের পথে যাবার জরুরি দরকার ছিল। যাত্রী ছিল না, অতএব টোঙ্গাওয়ালা আইন বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোককে অনুরোধ ক'রে তাঁকে বিনা পয়সায় গাড়িতে তুলে নিল। কিন্তু টোঙ্গাওয়ালা জানত না, তার অনুগৃহীত বিনাভাড়ার যাত্রীটি সাধারণ লোক নয়, একজন সাংবাদিক। এবং সেই সংবাদিক সম্ভবতঃ অর্থনীতির ছাত্র। অতএব সে টোঙ্গাওয়ালার কাছ থেকে তার পরিশ্রমিক চেয়ে বসল। টোঙ্গাওয়ালা অবাক। সাংবাদিক বলল, এই পথের ভাড়া আট আনা, আমাকে চার আনা চাও। চার আনা সে আদায় করল টোঙ্গাওয়ালার কাছ থেকে। সাংবাদিকদের উপার্জন-ক্ষেত্র পাকিস্থানের সাংবাদিক কিছু পরিমাণ বিস্তৃত ক'রে দিয়ে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হ'ল, অবশ্যই। ৫০০

আকাশে রসিকতা ছড়ানো

ফিনল্যাণ্ডের খবর, সেখানে কোনো জায়গায় সন্ধ্যাকাশে এক অদ্ভুত উড়ন্ত আলো দেখে সবাই সেটাকে উড়ন্ত চাকি মনে ক'রে ভয় পেয়ে যায়। তারপর প্রকাশ পায়, ওটি একটি উড়ন্ত কাক, পায়ে তার জ্বলন্ত টর্চ বাঁধা। স্থানীয় এক জুতা প্রস্তুতকারী কাকটিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে উড়তে শিখিয়েছিল। ৫০১

উড়ন্ত চাকির যুগ এটা। এ যুগে মানুষ এখন সর্বদা আকাশে তাকিয়ে থাকে ব'লেই বহুজাতীয় রসিকতা ছাড়া হচ্ছে এখন নানা জায়গা থেকে। লোকে যে-কোনো জিনিস বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এখন আকাশে চেয়ে থাকে, তাই সে যা চায় তাই দেখে। ৫০২

আকাশে তাকাতে আমি নিষেধ করছি না। ববং তাকাতেই বলছি। এতে গৌণভাবে একটি উপকার হবে আমাদের। আমাদের যে-দৃষ্টি এখন নিম্নমুখী, প্রায় শকুনের দৃষ্টি, যতই উপরে থাকি না কেন, দৃষ্টি নিচের দিকে। কোথায় ভাগাড় আছে খুঁজি, এমন সময় উড়ন্ত চক্র আমাদের সেই দৃষ্টিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে। দৃষ্টি অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্যও যে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে এ কেবলই ঐ উড়ন্ত চাকির জন্য। আমরা শুধু এই জন্যই পর্বতারোহীদের সমমর্যাদা লাভ করেছি। কারণ যাঁরা পর্বতচূড়ায় ওঠেন তাঁদেরও দৃষ্টি সর্বদা উচ্চ লক্ষ্যে রাখতে হয়। ৫০৩

অতএব আমরা জ্যোতির্বিদ না হয়েও জ্যোতির্বিদের মতোই স্কাই গেজার হতে

চলেছি। জাতি হিসাবে চতুর হ'লে এই সঙ্গে আমরা আকাশের মানচিত্রখানাও এত দিনে আয়ত্ত ক'রে ফেলতাম। আমরা আকাশ চিনি না ব'লেই উড়ন্ত চাকি কোন্ নক্ষত্র বা গ্রহের পাশ দিয়ে উড়ে গেল তা বলতে পারি না। ৫০৪

আকাশ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল নেই বললেই চলে। ইংরেজী কাগজে প্রতি মাসে আকাশের ম্যাপ ছাপা হয়। কারণ ইংরেজী পাঠক গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান বিষয়ে কৌতূহলী। এতে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই ব'লে বাংলা কাগজে আকাশের মানচিত্র থাকে না। এ বিষয়ে আমাদের আগ্রহ জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে নয়, জ্যোতিষীর মাধ্যমে, কুষ্ঠি তৈরির সময়। অর্থাৎ ভাগ্যের উড়ন্ত চাকিখানা কোন্ নক্ষত্রের পাশ দিয়ে গেল সেটুকু জানলেই আমাদের সব জানা হয়ে যায়। অথচ দেশের মানচিত্রের চেয়ে আকাশের মানচিত্র বেশি চিত্তাকর্ষক, কারণ সবটাই চোখ মেলে মিলিয়ে নেওয়া যায় ৫০৫

নেচে গেয়ে আর্তত্রাণ

উত্তর-পূর্ব ভারতের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য বম্বাইয়ের নর্তকীরা ২০শে নভেম্বর সমস্ত রাত্রি নাচ-গানের আসর চালিয়েছিল। সকাল সাতটা পর্যন্ত নেচে ও গেয়ে এই জাত-নর্তকী সম্প্রদায় ৪০০০ টাকা তুলেছে। পূর্ব সপ্তাহে আরও এক নর্তকী দল ঠিক এইভাবে ৬০০০ টাকা তুলেছে। বম্বাইয়ের নর্তকীরা অতঃপর এই উদ্দেশ্যে দিনরাত নাচগান চালাবে স্থির করেছে। এইভাবে যত টাকা উঠবে সবই প্রধানমন্ত্রীর বন্যাভাণ্ডারে দান করা হবে। এটি নর্তকীদের পক্ষে অবশ্যই প্রশংসনীয়। সরকারী লোকেরা তাদের ধ'রে আকাশে পা তুলে হাতে হাঁটাননি, ক্রিকেট খেলাননি, তারের উপর সাইকেল চালাননি, বুকের উপর হাতী তোলাননি, তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের বৃত্তি-সাহায্যে টাকা তুলে বন্যাভাণ্ডারে দিয়েছে। এদের প্রশংসা করি। ৫০৬

দেশের আপৎকালে সবাই যথাসাধ্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে না, কিন্তু তামাসার আয়োজন করলে তাদের ভাণ্ডার মুক্ত হয়। সে জন্য শিল্পীদের নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা যা উপার্জন হবে শিল্পীরাই তা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে দান করলে তার মধ্যে প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। এ দানের মর্যাদা আছে। কিন্তু দেশের নেতৃস্থানীয়েরা যদি শিল্পীদের ডেকে তাদের সাহায্যে ব্যবসা ক'রে টাকা তোলেন তবে তাতে উদ্দেশ্য সফল হলেও নীতি হিসাবে তা হীন। অথচ এই হীনতা জরুরি নয়, এর

আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য নয়। তার প্রমাণ খবরের কাগজ থেকে ভদ্রভাবে লোকের শুভ-বুদ্ধির প্রতি আবেদন জানিয়ে আরও বেশি ফল পাওয়া গেছে, এবং যত সামান্যই হোক প্রত্যেকের স্বেচ্ছাদান সেখানে পৃথক স্বীকৃতির মর্যাদা পেয়েছে। ৫০৭

সম্প্রতি যক্ষ্মারোগোত্তর উপনিবেশ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতায় সিনেমা শিল্পীদের দ্বারা ক্রিকেট খেলানো হয়েছে। এই নির্বুদ্ধিতার অর্থ বোঝা যায় না। অত কষ্ট না করিয়ে তাঁদের সবাইকে পা আকাশে তুলে, ঘণ্টাখানেক হাতে হাঁটালেও ফল একই হত। তাঁদের ক্রিকেট-খেলা খেলা হয়নি ব'লে কাগজে দীর্ঘ সমালোচনাও বেরিয়েছে, এটি আরও হাস্যকর। খেলা দেখানো যেখানে অবান্তর, নিজেদের দেখানো যেখানে প্রধান এবং যেখানে রাজ্য প্রধানের প্রেরণা থাকায় জনসাধারণ দুর্নীতির প্রেরণা পায়, সেখানে খেলাটা কিছু হয়নি ব'লে আর লাভ কি। বলা উচিত যা আমরা দেখতে চেয়েছি দেখেছি, আয়োজনের সার্থকতা সেইটুকুই। ফিল্ম-স্টার দেখেছি, টাকাও উঠেছে। অর্থাৎ স্বীকার করলাম End justifies the means, অথবা End by any means এই আদর্শ শুধু রাশিয়ার পক্ষে উপযোগী নয়, গান্ধীবাদের দেশেও উপযোগী। দুটি দেশের আদর্শে পার্থক্য দেখানো হয় নিতান্তই তর্কের খাতিরে। অতএব ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, পতিত পাবন সীতারাম ৫০৮

ব্যাঙের লড়াই

উত্তর মালয়ের কোনো এক স্থানে ব্যাঙের লড়াই শুরু হয়েছে। যুধ্যমান দুই-দল ব্যাঙের এক দল ব্রাউন রঙের, অন্য দল কালো রঙের। ব্রাউন ব্যাঙেরা জল থেকে, এবং কালো ব্যাঙেরা স্থল থেকে, যুদ্ধ চালাচ্ছে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে ১৭ই নভেম্বর থেকে। গত ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত চারদিনের যুদ্ধের খবর এই যে, এই যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ব্রাউনরা পশ্চাদপসরণ করেছে। পর্যবেক্ষকেরা বলছেন ওটা ওদের একটা যুদ্ধ-কৌশল বা ট্যাকটিক্স মাত্র, আসলে ওরা পুনরাক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে। ৫০৯

স্থানীয় সংস্কার এই যে, এই জাতীয় ব্যাঙের লড়াই হ'লে মানুষের লড়াই আরম্ভ হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও এই রকম ব্যাঙের লড়াই হয়েছিল। এ ধারণা অবশ্য ভুল, কারণ মানুষের লড়াই নতুন ক'রে আর কি হবে—ও তো

চলছেই। ব্যাঙদের উদ্দেশ্য আসলে মানুষকে ব্যঙ্গ করা—অর্থাৎ অনুকরণে যতখানি ব্যঙ্গ সম্ভব। ৫১০,২৮-১১-৫৪

সে যে আসে

অনেকদিন থেকেই মন বলছিল সে আসছে। সেই গীতাঞ্জলির ভাষা বহুদিন পরে আবার কানে গুঞ্জরণ করতে আরম্ভ করেছিল—'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, ঐ-যে আসে, আসে, আসে।' এলো সে অবশেষে। রাত প্রায় দশটায় দিল দোলা। এক লাফে বিছানা ছেড়ে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম পথে। ৫১১

এ কি ভীরুতা? হয় তো তাই। এবং এই ভীরুতার মূলে আছে নৈরাশ্য। নৈরাশ্যবাদীরাই সাধারণতঃ ভীরু হ'য়ে থাকে। তবে এ বিষয়ে জোর ক'রে কিছু বলা শক্ত। একই ব্যক্তির মধ্যে আশা ও নৈরাশ্যবাদ একসঙ্গে থাকতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।— ৫১২

ঘটনার পটভূমি ইউরোপের কোনো শহর। ভূমিকম্পের সময় ঘরের লোকেরা উত্তেজিতভাবে পথে এসে নেমেছে। তার মধ্যে একটি যুবক সবাইকে খুব গর্বের সঙ্গে বলছে, "আমি কখনো তোমাদের মতো ভূমিকম্পে ভয় পাই না, আমার চেহারা দেখলেই তা বুঝতে পারবে। এই দেখ আমি কেমন নিশ্চিন্ত মনে শার্ট পরেছি, টাই বেঁধেছি এবং কোট প'রে বেড়াতে বেরুচ্ছি।" জনতার ভিতর থেকে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বললেন,—"বুঝলাম। কিন্তু তোমার ট্রাউজার কোথায়?" বলার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি তার নিম্নাঙ্গের দিকে তাকিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকল। ৫১৩

ভূমিকম্পের সময় আমরা শিশুকাল থেকে পালানোর শিক্ষা পেয়েছি—ঘর থেকে বাইরে পালানো। এর চরম একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ১৯১৮ সনের একটি ঘটনা থেকে। তখন আমি ডেঙ্গু জ্বরে (ওয়ার ফিবার) মারাত্মকভাবে পীড়িত। সমস্ত পেশী ও সন্ধি বেদনায় টন্‌টন করছে, হাড়সুদ্ধ ব্যথিত। পাশ ফেরাতে লোক দরকার। এমনি অবস্থায় এক নবনির্মিত ছাত্রাবাসের চারতলায় শুয়ে আছি। প্রায় অর্ধ অচেতন ভাব। এমন সময় হঠাৎ ভূমিকম্পের একটা প্রবল অনুভূতি জাগল সকল দেহে মনে। তারপর কি হ'ল কিছু মনে পড়ে না, জ্ঞান হ'লে দেখি

আমি প্রশস্ত রাজপথে ব'সে। চারতলা থেকে ছুটে পথে নেমে আসার ব্যাপারটা আজও এক মহা রহস্যই রয়ে গেছে। ৫১৪

তারপর ১৯৩৪ সনের দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকম্পের সময় যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার তুলনা নেই। ১৮৯৭ সনের কলকাতার ভূমিকম্প কেমন হয়েছিল জানি না, কিন্তু ১৯৩৪-এ কলকাতার অভিজ্ঞতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম অভিজ্ঞতা। এটি বিহার-ভূমিকম্পের ল্যাজের ধাক্কা মাত্র। সে বারে শীতও প্রচণ্ড। তার মধ্যে কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রশস্ত রাজপথে ছুটে এসে দুলছি আর ঘড়ি দেখছি। পদতলের মাটিকে কখনো এমন অস্থির দেখিনি। তাই সে সময় বাড়ি-ঘর গাছপালা সব দুলছে দেখে সবটাই এমন অবাস্তব মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন সব মায়া সব অনিত্য (কেবল আমি বাদে)। পায়ের নিচে মাটি যদি ফেটে আমাদের গ্রাস করে এমন ভয়ও হয়েছিল। ভূমিকম্পে এ সব হ'য়ে থাকে। ঘড়ি দেখাও ভুলিনি। মোট সাড়ে তিন মিনিট দুলেছিলাম পথে দাঁড়িয়ে। ৫১৫

মনে নব নৈরাশ্য

আংশিক মায়ায় বিশ্বাসী হলাম। কারণ নিজেকে মায়া ভাবা যায় না কোনো অবস্থাতেই। আরও একটি সত্য লাভ করলাম এই যে, ভূমিকম্পে কলকাতা শহরে আতঙ্কের কারণ নেই। প্রায় চার মিনিট দুলেও যখন প্রাচীনতম বাড়িটিও খাড়া রইল, তখন ভবিষ্যৎ ভূমিকম্পে ভীরুতা ত্যাগ করব, ঘরে ব'সে দোল খাব, এইটি স্থির করলাম। এইভাবেই চলছিলাম, কিন্তু আধুনিককালে মনে আবার নিরাশা জেগে উঠেছে। বিশ্বপ্রকৃতির চরিত্র দেখেই এই নৈরাশ্য। কারণ এখন যেখানে যা কিছু হচ্ছে তাই চরমে উঠছে। মানুষের মতো প্রকৃতিও ক্ষেপে উঠেছে। ৫১৬

ভিতরে বাইরে সবই এখন স্বাভাবিকত্বের সীমা ছাড়িয়েছে। এবারের বন্যা একটি দৃষ্টান্ত। ইউরোপ এশিয়ার বন্যা-সম্ভাবিত কোনো স্থানই বাদ নেই। আসাম বাংলা ও বিহারের বন্যা অভূতপূর্ব। এটি বাইরের খবর, পৃথিবীর জঠরে ব'সে বিশ্বকর্মা মহাশয়ের মেজাজই কি ঠিক আছে? তাই গত ২৭ তারিখের মৃদু ভূমিকম্পে পথে নেমে যখন লজ্জিত হচ্ছিলাম, তখন পুনরায় লজ্জা দূর হ'ল বিশ্বকর্মার আধুনিক মেজাজ স্মরণ ক'রে। তারপর খবরের কাগজ প'ড়ে বোঝা গেল ঘর থেকে ছুটে বাইরে গিয়ে ঠিকই করেছি। কারণ জানতে পারা গেল বিশ্বকর্মা কলকাতার

৪০ মাইলের মধ্যে অফিস খুলে বসেছেন। এ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ খবর। খবরের কাগজ বলছে কলকাতার ভূমিকম্পের এপিসেণ্টার বা উৎপত্তি কেন্দ্র ৪০ মাইল দূরে। ৫১৭

বিশ্বকর্মার সবই চিরন্তন

বিশ্বকর্মার পৃথিবী গড়ার কাজ আজও শেষ হয়নি। ভূগর্ভের কারখানায় অবিরাম ভাঙাগড়া চলছে। কখনো বা দুরমুশ পেটানো চলছে। কখনো পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে। কখনো সেই ফাটলে আগুন জ্বলছে। কখনো গলিত লাভার নদী ব'য়ে চলেছে। দীর্ঘমেয়াদী কারখানা। সেখানে না আছে ধর্মঘট, না আছে ছুটি। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলছে অটোক্রাট প্রকৃতি-দেবীর হুকুমে। বিশ্বকর্মার কোনো পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা নেই, সবই চিরন্তন। ৫১৮

কলকাতায় যে ভূমিকম্প হয়, সাধারণতঃ তার এপিসেণ্টার ৩০০ থেকে ৪০০ মাইলের দূরত্বে থাকে, অর্থাৎ আমরা কলকাতায় অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু এবারের এপিসেণ্টার মাত্র ৪০ মাইল দূরে! বিশ্বাস করতে মনঃকম্প উপস্থিত হয়। প্রতিদিন আশা ক'রে আসছি কাগজে ভ্রম সংশোধন বেরোবে, বলা হবে ৪০ নয় ৪০০। কিন্তু কোথায় ভ্রম সংশোধন? ৪০ মাইলের রূঢ় সত্য কথাটাই রয়ে গেল। অর্থাৎ এখন থেকে সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে থাকতে হবে। কলকাতার শত শত বাড়ি জীর্ণ হয়ে পড়েছে, আইনতঃ কর্পোরেশন হয় তো সেগুলো ভাঙতে পারে না, সে কাজ ৪০ মাইল দূরের ভূগর্ভস্থ 'ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট' থেকেই সমাধা হবে এবারে। ৫১৯

অসাধারণ

ইন্দোরে শিক্ষক পদপ্রার্থী কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়োগ কর্তৃপক্ষের কাছে সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। তার কয়েকটি উত্তর বেরিয়েছে কাগজে—

১। লাল বাহাদুর এভারেস্ট জয় করেছে।

২। লাল কেল্লা সুভাষ বসুর তৈরি।

৩। গান্ধিজী ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল।

৪। জবাহরলাল মধ্যভারতের প্রধানমন্ত্রী। ৫২০

উত্তরগুলির কোনো কোনোটায় সামান্য নার্ভাসনেসের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যথায়

এগুলিকে নির্ভুল বলা চলে। যেমন প্রথম উত্তরটিতে বক্তার বলবার ইচ্ছা ছিল যে-ব্যক্তি এভারেস্ট জয় করেছে সে তো বাহাদুর ব্যক্তি। দ্বিতীয়টিতে ভুল নেই কিছু। সুভাষ বসুর লালকেল্লা দখল করার ইচ্ছা থেকেই ওর অস্তিত্ব জনসাধারণ জানতে পারে। অতএব অন্যযুগে ওটি আর যেই তৈরি ক'রে থাকুক, এ যুগে সুভাষ বসুই লালকেল্লা তৈরি করেছেন। তৃতীয় উত্তরের 'প্রথম' শব্দের স্থলে 'শেষ' বসাতে হবে। শেষ বড়লাট কার্যতঃ গান্ধীজীই ছিলেন। চতুর্থ উত্তরে 'মধ্য' কথাটি বাদ দিতে হবে, কিন্তু প্রবাদানুযায়ী অধিকন্তু ন দোষায, অর্থাৎ না দিলেও কথাটা মিথ্যা নয়, লজিক অনুযায়ী। ৫২১,৫-১২-৫৪

নাম সত্য

ইউরোপীয় মধ্যযুগে 'নোমিন্যালিজম' বা 'নাম সত্য' দর্শনের উৎপত্তি। 'রাম নাম সত্ হ্যায়' হচ্ছে আমাদের দেশের দর্শন। অবশ্য আমাদের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কাছে নামই একমাত্র সত্য। অপরপক্ষে ইউরোপে শেক্সপীয়র যদিও 'নামে কি আসে যায়' ব'লে নামমাহাত্ম্য উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং আমাদের দেশে যদিও কার্যক্ষেত্রে বস্তুগুণ বা চেহারা মিলিয়ে নাম রাখা হয় না, তবু আমাদের স্বভাবে যে নামমাহাত্ম্য শিকড় গেড়ে ব'সে আছে, তা উৎপাটন করা দুরূহ। এই প্রসঙ্গে পাতিয়ালা থেকে প্রকাশিত খবরটি উল্লেখযোগ্য। ৫২২

পঞ্জাব এবং পেপসুর মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে বিরোধ আছে। এই উপলক্ষে নাম-মাহাত্ম্যের চরম একটি নজির স্থাপন করেছে পেপসুর কৃষক সম্প্রদায়। তারা ইউনিয়ন কৃষিমন্ত্রী ডক্টর পঞ্জাবরাও দেশমুখের নাম স্বভাবতঃই সহ্য করতে পারছে না। দাবী তুলেছে, ঐ নাম বদলিয়ে ডক্টর পেপসুরাও দেশমুখ করা হোক। আবেদনে বলা হ'য়েছে ডক্টর দেশমুখ তাদের অত্যন্ত প্রিয় বলেই এই দাবী। ৫২৩

ডক্টর দেশমুখ একথা শুনে খুব খুশি হয়েছেন, কিন্তু এ বয়সে নাম বদল করা তো আর সম্ভব নয়, তাই তিনি কিছু বিব্রত বোধ করছেন। রাম নাম সত্ হ্যায় ধ্বনি দেবার সময় তো প্রায় এসে গেল, এখন আর ব্যক্তিগত নামের কি দাম আছে। ৫২৪

রাজ্যে রাজ্যে

বিহারে সম্প্রতি যেভাবে বাংলার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, তাতে বাংলাদেশও বিহারকে কিছু ভয় করবে, এটা স্বাভাবিক। এই দুই রাজ্যেই তার ফলে নামের উপর

আক্রমণ চলতে পারে। হয়তো বাংলাদেশের বিহাবীলালকে বঙ্গলাল হ'তে হবে আর বিহারের দ্বারবঙ্গকে হ'তে হবে দ্বারবিহাব। এই সংক্রামক মনোভাব অতঃপর সকল বাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং নামই যদি সম্পর্কের মাপকাঠি হয়, তাহলে আমাদেব আদালতে যাদের আসামী বলা হয়, আসামবাসীদেবও তাতে আপত্তি করবাব ন্যাযসঙ্গত অধিকাব থাকবে। তাদেব আদালতে আসামীদেব হয়তো বাঙালী বলা হবে। অপবপক্ষে আমাদেব জামাকে পঞ্জাবি বলাতে পঞ্জাবীবা বাঙালীদেব সঙ্গে বন্ধুত্ব কববে এবং ওদেব ইংলিশ শার্টকে বলবে বাঙালী। অর্থাৎ ঘৃণায নাম থেকে বিনামা, আব শ্রদ্ধায নাম থেকে প্রনাম, নামেব দুই বিভিন্ন পবিণাম আব কি। ৫২৫

সিংহ ও পুলিস

টোকিওতে খাঁচা ভেঙে দুটি সিংহ বাজপথে বেবিয়ে পড়ায সবকাব থেকে ২০০ জন পুলিস তলব কবা হয তাদেব পাকডাবাব জন্য। সিংহ ধববাব উদ্দেশ্যে মিলিটারীকে না ডেকে পুলিসকে ডাকা হ'ল কেন বোঝা যায না। পুলিসেব সঙ্গে সিংহেব কোনো বিশেষ সম্পর্ক আছে কি? তবে শাস্ত্রে বলে বটে, "উদ্যোগিনং পুলিসসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" ৫২৬

ব্যঙ্গেব লক্ষ্য নাবী

পৃথিবীব প্রায সকল দেশেব বসিক ব্যক্তিবাই স্ত্রীলোককে সাধাবণতঃ ব্যঙ্গেব লক্ষ্য হিসাবে গণ্য ক'রে থাকেন। এটি বিশেষ ক'বে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে বেশি দেখা যায়। বিদেশী ব্যঙ্গ-কৌতুক পড়তে গেলেই দেখা যায অধিকাংশ ব্যঙ্গের লক্ষ্য নাবী জাতি। ৫২৭

সম্প্রতি আমাদেব দেশেও তাব অনুকবণ আবম্ভ হ'ল ব'লে মনে হচ্ছে। নতুন দিল্লীর একটি খবরে জানা যায়, বিজাপুরের এক নবখাদক বাঘ (চিতা কি টাইগাব উল্লেখ নেই) শুধু স্ত্রীলোকের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই পনেরো জন স্ত্রীলোককে তার ব্যঙ্গের লক্ষ্য করেছে। সে অনায়াসে গ্রামের লোকালয়ে ঢুকে, শিশু বা বয়স্ক পুরুষকে বাদ দিয়ে শুধু স্ত্রীলোককে টেনে নিয়ে যায়। ৫২৮

যোগাযোগ

লোকসভায় প্রকাশ, ডেপুটি স্পীকারসহ মোট ৬২ জন লোকসভার সদস্য যোগাভ্যাস

ক'রে থাকেন। (এ যোগের সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের যোগও ধর্তব্য, অর্থাৎ শুধু যোগ নয়, সুযোগের সঙ্গে যোগ এবং সুবর্ণ সুযোগের সঙ্গে।) প্রশ্ন উঠেছে রাশিয়ায় যোগ প্রচলন করবার চেষ্টা হচ্ছে কিনা। তার উত্তরে বলা হয়েছে, এ রকম একটা খবর বেরিয়েছে বটে, তবে মস্কোয় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে সন্ধান নেওয়া হচ্ছে খবরটা ঠিক কিনা। ৫২৯

কিন্তু এটা তো ধ'রেই নেওয়া যায়, দিল্লী-মস্কো যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব নয়। কেননা যোগ হচ্ছে অস্তির দিক, আর বিয়োগ হচ্ছে নাস্তির দিক। আস্তিক্য এবং নাস্তিক্যও বটে। অর্থাৎ ভারত যদি যোগের দিকে থাকে, রাশিয়া থাকবে বিয়োগের দিকে। কারণ, ওরা যা জানে না, তা বিশ্বাস করে না, আর আমরা যা জানি না, তাই বেশি বিশ্বাস করি। ওরা দেবতা দেখেনি ব'লে দেবতার অস্তিত্ব মানে না, আর আমরা কোনো দেবতাকে দেখিনি ব'লে ৩৩ কোটিকে মানি। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যেই মস্কোর সঙ্গে আর সবার পার্থক্য। অতএব মস্কোর সঙ্গে কোনো বিষয়ে মস্করা না করাই ভাল। ৫৩০

ক'নে দেখা

যুগান্তর সাময়িকীর নারীজগতে ক'নে দেখা নিয়ে আলোচনা চলছে। বিষয়টি পুরনো। অপরিচিতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ক'নে দেখার প্রযোজন আছে অবশ্যই। কারণ বিয়েটা মেয়েরই দরকার, ছেলের ততটা দরকার নেই ; অতএব যা কিছু দীনতা এবং পায়ে ধ'রে সাধাসাধি সবই ক'নের তরফে দরকার। ছেলের পক্ষের সব দাবীই ক'নের পক্ষকে মেটাতে হবে। না মেটানোর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এ নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। কারণ সাধারণ অর্থনৈতিক রীতিতে এই কাজ সম্পন্ন হয়। দ্রব্য গছিয়ে দেবার জন্য যদি এক পক্ষ অতি আগ্রহশীল হয়, তা হ'লে অন্য পক্ষ তার নিজের শর্তেই সেই দ্রব্য গ্রহণ করবে এটি স্বাভাবিক। মেয়েকে ঘর থেকে বিদায় করবার জন্যও ব্যস্ত হব, পণ চাইলেও অন্যায় অন্যায় ক'রে চেঁচাব, এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? ৫৩১

এটি যদি সামাজিক সমস্যা হ'য়ে থাকে, এর ভবিষ্যৎ প্রতিকার মেয়েদেরই করতে হবে। বর্তমানে তাদের অধিকাংশেরই হাটের গোরুর অবস্থা, তাই ক'নে দেখা আর গোরু দেখায় কোনো তফাত নেই। মেয়েরা যথেষ্ট আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হ'লে এই গোরু দেখা প্রথা উঠে যাবে। ইতিমধ্যেই মরীয়া হ'য়ে কোনো কোনো মেয়ে

চাকরিপ্রার্থীর মতো সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নাদির লিখিত ও মৌখিক উত্তর দেবার পর সোজা বিবাহার্থী ছেলেকে পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে এবং ছেলেকে অপছন্দ ক'রে বিদায় ক'রে দিয়েছে। ছেলে যদি শিভালরি না দেখায়, মেয়েই বা সৌজন্য দেখাবে কেন। শুভ লক্ষণ, এইবার সামঞ্জস্য ঘটবে দু'পক্ষে। ৫৩২

শিভালরির চরম

শিভালরি শব্দটির অর্থ—দুবলের পক্ষ সমর্থন, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা বিবিধ সৌজন্যসূচক ব্যবহার। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ল। একটি বাস-এ একটি লোক কোনো রকমে উঠে বসেছে। ওঠবার সময় তার পা টলছিল, বাস-এ অন্য যাত্রী কে আছে না আছে তা খেয়াল করবার মতো অবস্থা তার ছিল না। পরদিন ক্লাবে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু বলল "তুমি বাস-এ আসছিলে, এমন সময় এক মহিলা উঠলেন, তুমি তাঁকে নিজের আসন ছেড়ে দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে রড্ ধ'রে চোখবুজে দাঁড়িয়ে রইলে।" লোকটি বলল, "আমার ওটাই তো বরাবর অভ্যাস, শিভালরি দেখাতে আমি কোনো দিনই পিছপা নই, বাস-এর মধ্যে মহিলাকে আমি বরাবর আসন ছেড়ে দি।" বন্ধু বলল, "সে কথায় সন্দেহ করি না, তবে কাল সে সময় আর সবগুলো আসনই খালি ছিল।" ৫৩৩

কেমন স্বামী চাই

লোকটি শিভালরির অবতার বলা চলে। যা হোক ভিয়েনার মেয়েরা স্বামীরূপে যাদের চায়, তাদের মধ্যে শিভালরিও কিছু থাকবে, এটি তারা আশা করেছে সম্প্রতি। স্বামীরূপে কি রকম পুরুষকে তারা চায় এ বিষয়ে একটা গবেষণা করা হয়েছিল সেখানে, তাতে সকল স্ত্রীই শিভালরি কিছু পরিমাণ দেখতে চেয়েছে তাদের স্বামীদের মধ্যে। ৫৩৪

তাদের মতে স্বামী হ'তে হ'লে পুরুষদের মধ্যে যে গুণগুলি থাকা দরকার, তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে কর্মনৈপুণ্য। ২৫০০ জন স্ত্রীর মতে স্বামীদের ধূমপান অথবা মদ্যপানে আপত্তি নেই, যদি তারা ভালবাসতে জানে এবং কাজের লোক হয়। অধিকাংশ স্ত্রীই দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধি স্বামী হওয়ার পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করে না। ৫৩৫

তাদের মতে স্বামী জাতির মধ্যে যে সব গুণ থাকা চাই তার তালিকা—

কর্মনৈপুণ্য	শতকরা	৭৩
বিশ্বস্ততা	শতকরা	৬৪
প্রয়োজনীয় যোগান দেবার ক্ষমতা	,,	৫৯
দয়ামায়া	,,	৩৯
রসবোধ	,,	৩৯
বুদ্ধি	,,	৩৫
শিভালরি	,,	৩৩
বুদ্ধি চাতুয (wit)	,,	২৮
সৌন্দর্য	,,	২১
শক্তি	,,	১৮

একজন স্ত্রী বলেছে "পুরুষদের সম্পর্কে আমার ধারণা এত নিচু যে তাদের সম্পর্কে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।" ৫৩৬

কয়েকজন স্ত্রীর মতে আদর্শ স্বামীর গায়ের রং খুব ফর্সা হওয়া চাই। কেউ কেউ বলেছেন স্বামীর বাসনমাজার বিদ্যা জানা চাই। আবার অনেকের মতে স্বামী যেন রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় না আসে। প্রশ্নকারীরা বিস্মিত হয়েছেন— পৌরুষের কথা কেউ তোলেনি। ৫৩৭

আমাদের গোরু দেখার দেশে মেয়েরা স্বামীর কোন্ গুণ চায় তা বলা দূরের কথা, চিন্তা করবার অধিকারও হয় তো পায়নি অদ্যাবধি। ৫৩৮,১৯-১২-৫৪

হাতীর ভাগ্য

আসাম সরকার রাষ্ট্রপতিকে যে হাতী উপহার দিয়েছেন তার জন্য ছাব্বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একখানা বাড়ি তৈরি হয়েছে। পণ্ডিত নেহরু বলেছেন, এই হাতীকে যথেষ্ট সম্মান না দেখালে আসাম সরকারের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করা হ'ত, অর্থাৎ এই হাতীর প্রতি সৌজন্য আসাম সরকারের প্রতি সৌজন্যের সমান। অতএব যাঁরা ভাবছেন বাংলা সরকার এরই অনুকরণে রাষ্ট্রপতিকে একদল দুঃস্থ লোক উপহার দিলে বাংলা সরকারের প্রতি সৌজন্য স্বরূপ তাদেরও বাসস্থান মিলে যেতে পারে, তাঁরা ভ্রান্ত। রাজমহিমার সঙ্গে হাতীর অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজমহিমার কোনো সম্পর্ক নেই। ৫৩৯

আমরা প্রস্তুত আছি

লোকসভায় রেলমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, রেলভাড়া পুনরায় বৃদ্ধি পেতে পারে।—যাক, মস্ত বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ভাড়াবৃদ্ধি হঠাৎ ঘোষিত হ'লে সেই নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে আমাদের স্নায়ুর উপর বিষম চাপ পড়ে, সেজন্য আগে থাকতে আমাদের প্রস্তুত ক'রে নেওয়ার মধ্যে একটা প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ৫৭০

রেলভাড়া বৃদ্ধি হবে এটিকে অবশ্য খবর হিসাবে আমাদের চিন্তা করাই অন্যায়। একটি হাতীর আশ্রয়ের জন্য যেখানে ছাব্বিশ হাজার টাকা খরচ হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে রেলগাড়িতে আশ্রয় দিতে সেখানে কত কোটি টাকা খরচ হয় তা আমাদের অনুমান করাও অসাধ্য। অতএব ভাড়াবৃদ্ধি স্বাভাবিক। এর উপর শোনা যাচ্ছে আবার ইণ্টার ক্লাসও নাকি উঠে যাবে। যদি টাকার অভাবই এর কারণ হয়, তা হ'লে একবারে কত ভাড়া বাড়ালে ইণ্টার ক্লাস রাখা যায় তা আমাদের জানানো হোক, আমরা প্রস্তুত আছি। ৫৪১

প্রস্তুত আছি এই জন্য যে, ইণ্টার ক্লাস উঠে গেলে আমাদের মতো মধ্যবর্তী মানুষের সমূহ বিপদ। আমরা প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণী নই তাতে লজ্জা পাই না, কিন্তু নিতান্ত তৃতীয় শ্রেণী ভাবতেও কষ্ট হয়। সামাজিক পরিচয়ে আমরা যারা মধ্যবিত্ত (এবং নিম্নমধ্যবিত্ত), তাদের জন্য রেলগাড়িতে মধ্যমশ্রেণী থাকবে না, এটি বড়ই নিষ্ঠুরতার পরিচয় হবে। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণী যদি থাকে, তা হ'লে মাঝারিটাও থাক। ৫৪২

★ স্ত্রৈণ স্বামী সমিতি

রয়টার প্রচারিত ইস্তানবুলের খবর—উত্তর-পশ্চিম তুরস্কের ইজমেইত প্রদেশে সম্প্রতি পুরুষদের এক সভা হচ্ছিল। তাদের স্ত্রীরা অর্ধক্ষিপ্ত অবস্থায় লাঠি হাতে সেই সভার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ক্ষেপা বামার দল নাকি তাদের স্বামীদের টানতে টানতে বাড়িতে ধ'রে নিয়ে গেছে। পুলিসের হস্তক্ষেপের আগেই কাজটি শেষ হ'য়ে যায়। প্রকাশ, এটি ছিল, "স্ত্রৈণ স্বামী সমিতি"র বার্ষিক অধিবেশন। ৫৪৩

মনে হয় খবরটিতে সবখানি সত্য কথা প্রকাশ করা হয়নি। সংসারে স্ত্রৈণ স্বামী যাদের

বলা হয়, তারা প্রায় সব সময়েই স্বেচ্ছা-স্ত্রৈণ, কারণ স্ত্রৈণ হ'তে তারা ভালবাসে, এতে তারা একটা তৃপ্তি পায়। স্ত্রীর ভয়ে যারা স্ত্রৈণ, তাদের সংখ্যাও অবশ্য খুব কম নয়। কিন্তু স্ত্রীরা স্বামীদের উপর যে অত্যাচার চালায় তার প্রতিকার বাসনা নিয়ে স্ত্রীজাতির মধ্যে কোনো সমাজ সংস্কারক আজও দেখা দেয়নি, অথচ স্ত্রীজাতির উপর স্বামীদেব অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলন হয়েছে এবং বর্তমানে যে বিবাহ আইন বদলে যাচ্ছে, সে প্রধানতঃ পুরুষদেরই চেষ্টায়। ৫৪৪

স্ত্রী অত্যাচারী বেশি, না স্বামী অত্যাচারী বেশি, এ প্রশ্ন তুলেছিল এক স্ত্রী তাব স্বামীর সামনে। স্বামী তার উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করছিল (কেন, সহজেই বোঝা যায়)—তাতে স্ত্রী অধীর হ'য়ে স্বামীকে এক ঘুসি মেরে চিৎ ক'বে ফেলে। তখন স্বামী স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল—স্বামীরাই অত্যাচারী বেশি। ৫৭৫

তুরস্কে যে স্ত্রৈণ স্বামী সমিতির সভা বসেছিল তারাও স্বেচ্ছা-স্ত্রৈণ নয়, নইলে আত্মরক্ষার জন্য গোপন সমিতি গড়ত না, স্ত্রীরাও তাদের উপব হামলা চালাত না। ৫৪৬,২৮-১-২-৫৪

বর্ষশেষ ও ভবিষ্যদ্বাণী

১৯৫৪ সন বিদায় নিয়েছে।—এলো ১৯৫৫ সন। ১৯৫৪, ব্যাকরণ মতে, গত বছর। অথচ মাত্র গত সপ্তাহ! তবু আশা করি গত বছরকে পাঠকেরা ভুলে গেছেন। সেই ভরসায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই গত বছর সম্পর্কে আমি যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। বলেছিলাম, (১) বাশন প্রথা উঠে যাবে, (২) বন্যায় দেশের একটা অংশ ভেসে যাবে, (৩) বহু লোক সর্দি জ্বরে ভুগবে, (৪) চাকুরিয়ারা প্রতিমাসের শেষে টাকার টানাটানিতে কষ্ট পাবে, (৫) প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের অবস্থা সচ্ছল হবে, (৬) আকাশে উড়ন্ত চাকের সংখ্যা বাড়বে, (৭) কয়েক লক্ষ নতুন শিশুর জন্ম হবে, (৮) এবং প্রায় সমান সংখ্যক পুরনো লোক মারা যাবে। আরও অনেক কিছু বলেছিলাম। ৫৪৭

গত বছরের এইসব ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ সন্দেহ হ'ল এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সত্যিই কি আমি করেছিলাম? পুরনো ফাইল তন্ন তন্ন ক'রে ঘেঁটে দেখলাম, আমারই ভুল, ভবিষ্যদ্বাণী আমি করিনি। কিন্তু হয় তো করা

উচিত ছিল। কারণ এর মতো সহজ কাজ আর নেই। কিংবা হয়তো সহজ ব'লেই এ কাজে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। ভবিষ্যদ্বাণী যাঁরা প্রতিদিন ক'রে চলেছেন তাঁদের কাজ দেখেই মনে হয়েছে এটি জলের মতো সহজ কাজ। আমি বিশেষ ক'রে মেটিওরোলজি বিভাগের কথা বলছি। এই বিভাগ সাংকেতিক ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে থাকেন। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীর নাম পূর্বাভাস, এবং ভাষা বিপরীত। অর্থাৎ তাঁরা যদি বলেন, দিনটি ফাইন (নির্মেঘ রৌদ্রোজ্জ্বল) থাকবে তবে বুঝতে হবে সেদিন মেঘ হবে। যেমন ২৭ ডিসেম্বর প্রচার করা হ'ল ২৮।২৯ তারিখে মোটামুটি খরা থাকবে বাংলাদেশে, অথচ বৃষ্টি হ'ল। ৫৪৮

এই গল্পটি হয়তো অনেকেরই মনে আছে: আবহাওয়ার পূর্বাভাস একখানা কাগজে প্রতিদিন আশ্চর্যভাবে মিলে যেত। এই কাগজ কোত্থেকে পূর্বাভাস সংগ্রহ করে, তার সন্ধান নিতে এলেন মেটিওরোলজি বিভাগ থেকে। সম্পাদক তাঁর কাগজের পূর্বাভাসদাতাকে ডাকালেন। লোকটি বৈজ্ঞানিক নয়, গ্রাম্য অল্প শিক্ষিত লোক। সে বলল, সব কাগজে পূর্বাভাস যা দেখি, আমি তার উল্টোটা লিখে দিই, তাই এমন মিলে যায়। ৫৪৯

এটি হ'ল একদিনের আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী। দেশের সকল বিষয়ে এক বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর বেলায় শুধু উল্টো লিখলে হবে না, সব এলোমেলো লিখতে হবে। খুব জোরের সঙ্গে বললে সমস্ত বর্তমান ঘটনা এবং পরিচিত ঘটনাই ভবিষ্যদ্বাণীর মতো শোনাতে পারে। জোরের অভাবে ভবিষ্যদ্বাণীও অতীত বাণীর মতো শোনায় ৫৫০

সব চেয়ে নিরাপদ—কিছু না বলা; এবং বছর শেষ হয়ে গেলে জোরের সঙ্গে বলা যে, যা বলেছিলাম সব মিলে গেছে। পাঠকদের স্মৃতিশক্তি কম, তা ভিন্ন তাদের নিজেদেরই এত সমস্যা আছে যে, তুমি কবে কি বলেছ বা বলনি, তা তারা মনে রাখে না। তবু এ বছরে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী আমি করব। এ বছরে আলুর দর কমবে, 'সহ-বাস অথবা সহ-মরণ' নীতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে এবং পৃথিবীর জনসাধারণ বিশ্বযুদ্ধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে। ৫৫১

কিন্তু তবু এই ইচ্ছা তাদের দমিত হবে হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহারের কথা শুনে। ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে আগামী যুদ্ধে পরমাণু শক্তি ব্যবহার করা হবে।

জনসাধারণের পক্ষে এটি একটি মহা তামাসা, সেজন্য যুদ্ধ তারা চাইবে। অ্যামেরিকা যত রকম পরমাণু অস্ত্র তৈরি করেছে, রাশিয়াও তত রকম করেছে, কাজেই এ যুদ্ধ সাধারণ লোকে টিকিট কিনে দেখতে চাইবে। সর্ব-ধ্বংসের দৃশ্যের মধ্যে একটা পৈশাচিক আনন্দ আছে। ৫৫২

সুতরাং যুদ্ধ চাই এবং চাই না, এই দুই পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা সমান প্রবল হওয়াতে অবস্থা একই থেকে যাবে। আর তা যদি নাও হয়, যুদ্ধ যদি একান্তই বাধে, তখন বছর শেষে জোরের সঙ্গে এই কথাই বলব যে, কেমন? বলেছিলাম না যুদ্ধ বাধবে? এবং পাঠক অবাক হয়ে ভাববে, আশ্চর্য ক্ষমতা তো! ৫৫৩

নতুন বছরে নানা স্থানে উড়ন্ত চাক এসে নামবে এবং নতুন ধরনের সব জীব তা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করবে। যে চাক বাংলায় নামবে, তার আরোহী বাংলায় কথা বলবে। তারা বহু ভাষাবিৎ। চেষ্টা করলে তাদের দুচারজনকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকরূপে পাওয়া যেতে পারে। অনেকের ধারণা নানাস্থানের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকেরাই উড়ন্ত চাকে বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে ফিরছেন। ৫৫৪

এ রকম সন্দেহের কারণ—সম্প্রতি ফ্রান্সের শাতোনোফ-দু-পাপ নামক মদ্য-উৎপাদনকারী এক গণ্ডগ্রামের মেয়ার কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছেন—উড়ন্ত চাক বা সিগার বড়ই বিপজ্জনক, এতে জনসাধারণের মধ্যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, মঙ্গলীয় জীবেরা মানুষের চেয়ে খাটো এবং লোমশ। অনেকেই অবোধ্য ভাষায় কথা বলে, কিন্তু অনেকে আবার রুশ ও ফরাসী ভাষায় ব্যবহার করেছে। ৫৫৫

শাতোব্রিয়াঁর জিলবার লাফে নামক ১৩ বছরের এক বালক বলেছে সে উড়ন্ত চাকের চালককে দেখেছে। চালক উক্ত বালকের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলেছিল। চালকের পোশাক ছিল আলোবিকিরণকারী। সে বলেছিল পোশাক দেখতে পার কিন্তু ছুঁয়ো না। এইভাবে ফরাসীদেশের প্রায় সবাই উড়ন্ত চাক দেখেছে অথবা এমন প্রতিবেশীর কাছে গল্প শুনেছে যে 'কখনো মিথ্যা বলে না।' অবশ্য যে সব এলাকায় মদ তৈরি হয় সে সব এলাকাতেই চাকের আমদানি বেশি। ৫৫৬

আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি—এই উড়ন্ত চাক সম্পর্কে আলোচনা এবং তার চালকদের যদি বেশি বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তা হ'লে এ বছরে চাকের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে যাবে। তবে ভারতবর্ষের যে সব রাজ্যে মদ্য পান নিষেধ সেখানে চাক দেখা যাবে না। ভারতবর্ষে ক্ল্যাসলেস সমাজ গড়া হবে শুনছি, কিন্তু ঐ সঙ্গে গ্ল্যাসলেস্ সমাজ হবে না কেন? তা যদি হয় তবে উড়ন্ত চাক থেকে আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। ৫৫৭

নতুন বছরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করছি। এবাবে বিহারে বাঙালী ও বাংলাভাষার উপর বহুবার নিষ্পেষণ চলবে, এবং যতবার চলবে আমরা হিসেব ক'বে ঠিক ততবাব বিহাবের উদ্দেশে সতর্কবাণী পাঠাব। ৫৫৮,২-১-৫৫

উই ও অনিত্যতা

অমৃতবাজাব পত্রিকাব রোমবাসী বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত খবর (১-১-৫৫) থেকে জানা যায়, ইটালিতে উইয়ের অত্যাচাব অতি প্রবল আকার ধারণ করেছে। এই খবরটি প্রচারের খুব দরকার ছিল। কারণ এ থেকে সংসাবের অনিত্যতা বিষয়ে আমাদের বহুদিনেব সঞ্চিত অন্যায় বিস্মৃতিব আবও একখানি পর্দা সরে যাবার অবকাশ পেল। ৫৫৯

উই দক্ষিণ ইটালির সমস্ত শহরে, সমস্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিভাণ্ডারে, সাধারণ পাঠাগারে, দলিলপত্রের সংরক্ষণাগারে, যাদুঘরে এবং প্রাচীন প্রাসাদসমূহে বিরামহীন কর্তনক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। ভেনিস শহর পর্যন্ত এদের সুপরিকল্পিত আক্রমণ সীমা বিস্তৃত। এই পথে যাবার কালে ফ্লোরেন্সেব জাতীয় গ্রন্থাগার, সেণ্ট পীটারের গীর্জা, পেরুজিয়ার সেণ্ট ডোমিনিক নামক জাতীয় মনুমেণ্ট, রোমের আধুনিক আর্টের গ্যালারি ইত্যাদি যাবতীয় মূল্যবান সংগ্রহশালায় বা ঐতিহাসিক স্মৃতিকেন্দ্রসমূহে উই-অক্ষৌহিণীর দাঁত ক্রিয়া ক'রে চলেছে। ৫৬০

এই ধ্বংস ক্রিয়ায় কোথায়ও খুঁত নেই, কোথায়ও কণামাত্র ফাঁকি নেই। সম্প্রতি রোমে জনৈক ছাত্র, সাধারণ গ্রন্থাগারে, অতি দুষ্প্রাপ্য এবং মূলব্যান সংস্করণের একখণ্ড দান্তের ডিভাইন কমেডি হাতে নিয়ে তার খোদাই করা মলাট উল্টে দেখতে পায়, ভিতরটা একেবারে শূন্য, কমেডির চিহ্নমাত্র নেই। কয়েক বছর আগে জনৈক চার্চের কর্তাব্যক্তি বিছানায় শোবার কয়েক মিনিট পরেই চিৎকার করতে শুরু

করেন। ভৃত্যেরা ছুটে এসে দেখতে পায়, উক্ত মাননীয় ব্যক্তি খাট ভেঙে মেঝেয় প'ড়ে আকাশে পা ছুঁড়ছেন। আসল ব্যাপার—উই খাটের ক্রসবারগুলো খেয়ে দিয়েছিল। ৫৬১

তার মানে ইটালির যাবতীয় ঐহিক এবং পারত্রিক প্রাচীন গৌরব এবারে নিশ্চিহ্ন হতে চলল। কিন্তু শুধু কি ইটালির? আমাদের এই প্রাচীন ঐতিহ্যের দেশের উই-শক্তি ইটালির উই-শক্তি থেকে কমিয়ে দেখবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। শক্তি সমান হতেই হবে। কাবণ উই সৃষ্টি করেছেন বিধাতা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। ৫৬২

আমরা জানি পৃথিবীতে কিছুই চিবস্থির নয়। কিন্তু সত্যই জানি কি? আমরা জানি বা না জানি, এদেশের জ্ঞানীরা অন্তত কথাটা জনেতেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভাবত যে উচ্চাসন লাভ করেছিল তার উচ্চতা চিরদিন থাকবে না তাও তাঁরা জানতেন। তাই কোন্ যুগে কি রকম পরিবর্তন ঘটবে তাও তাঁবা কল্পনা ক'বে গেছেন। মোট কথা এগিয়ে চলাই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ, বিধাতারও ইচ্ছা—মানুষ এগিয়ে চলুক, অতীতের অভিজ্ঞতায় শুধু পথ আলোকিত ক'রে নিক মাত্র। তাই পাছে কোনো জাতি গতিপথে থেমে গিয়ে, ভবিষ্যতের কথা ভুলে, শুধু অতীত গৌরব নিয়ে মেতে যায়, তাই তিনি উই সৃষ্টি করেছেন। ৫৬৩

ঝিকে মেরে

বিধাতার এটি একটি প্রচণ্ড রসিকতাও বটে,—একেবারে ডিভাইন কমেডি। যেখানে সংগ্রহ, যেখানে স্তূপ, যেখানে গতিপথ রুদ্ধ, যেখানে আলো-হাওয়া প্রবেশের পথ নেই, সেইখানেই উই গিয়ে সব ঝরেঝরে ক'র দেয়। যাকে এতকাল ধ্রুব ব'লে মনে হয়েছিল, দেখা যায়, তারই পাদমূলে ব'সে উইয়ের দল হো হো ক'রে হাসছে। বিধাতাপুরুষ তো আর এসব নিজহাতে করেন না, তিনি পরস্পরবিরোধী সব প্রাণী সৃষ্টি ক'রে একেকে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—তাঁর নিজস্ব নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে। বিধাতা ঝিকে মেরে বৌকে শেখান। ৫৬৪

রামণের মতে

বৈজ্ঞানিক সি, ভি, রামণের মতে আজকের পরমাণু শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলি পরমাণু অস্ত্রের লড়াইয়ে পরস্পর ধ্বংস হয়ে গেলে বিশ্বের অবস্থা ভালই হবে। ৫৬৫

এটি সত্য কথা কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কারণ যুদ্ধ বাধবেই এবং পরমাণু অস্ত্রে সব ধ্বংস হবেই, কিন্তু এতে যা ভাল হবে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। ইতিপূর্বে ইতশ্চেতঃতে তা আলোচনা করা হয়েছে। যুদ্ধান্তে যারা অবশিষ্ট থাকবে তারা গুহা গহ্বরে লুকিয়ে বেঁচে থাকবে। তারা বর্তমান পরমাণু-সভ্যতা চাইবে না, আত্মরক্ষায় লাঠি এবং তীর-ধনুকই তাদের পক্ষে প্রথম প্রথম উপাদেয় বোধ হবে। এবং তা তারা ব্যবহার করবে হিংস্র জন্তুর বিরুদ্ধে এবং খাদ্যের জন্য প্রাণী হত্যায়। তারপর তারা যদি সমবেত উদ্যমে পরস্পরকে সাহায্য না ক'রে পৃথক হবার চেষ্টা করে তা হলে ঐ লাঠি ও তীর-ধনুক তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করবে। ৫৬৬

এতএব দ্বন্দ্ব মানুষে মানুষে হবেই এবং তার থেকেই ক্রমশ অস্ত্রের উন্নতি হতে থাকবে। এবং যুদ্ধের লক্ষ্য যেহেতু মানুষ মারা (কেন না শত্রুকে আয়ত্তে আনতে এইটেই সহজতম পথ), সেইহেতু অস্ত্র যত উন্নত হবে ততই যুদ্ধের পক্ষে সুবিধা হবে। এর মধ্যে মানবিকতার প্রশ্ন নেই। যেন পরমাণু বোমার চেয়ে সাধারণ উচ্চ বিস্ফোরক বোমা ঢের করুণাময়; যেন রাইফলের গুলির চেয়ে লাঠির ঘায়ে হত্যা বেশি মানবিকতা। মানুষ মারা যেখানে লক্ষ্য এবং সমর্থিত, পারমাণবিক অস্ত্রই সেখানে পবম মানবিক। ৫৬৭

অতএব পরমাণু যুদ্ধে সাময়িক কল্যাণ হবে মাত্র। অসুবিধা হবে এই যে, অবশিষ্ট জীবিত মানুষেরা যদি এতবড় অভিজ্ঞতার পরেও একসঙ্গে মিলে বাস করতে না পারে তবে ধ্বংসাস্ত্র সবই আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। এইটিই যা অসুবিধা। ৫৬৮

আকার দেখেই বোঝা যায়

একখানি কাগজের হেডলাইন: "কলিকাতায় উৎকট গৃহ সমস্যা, পূর্বের ন্যায় এখনও মধ্যবিত্তদের দুরাবস্থা।" সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের "দুরাবস্থা"র কাহিনীটি স্মরণীয়। অর্থাৎ আকার দেখেই বোঝা যায়। ৫৬৯

কিন্তু এই আকার দেখতে বা শুনতে তুচ্ছ হলেও জিনিসের আকার বদলাতে এর শক্তি কম নয়। এবারের ইংরেজী বর্ষ অন্তে তার পরিচয় পাওয়া গেল। বর্ষ অন্তে বর্ষা অন্ত ঘটল। এ রকম বর্ষা ইংরেজী বর্ষান্তে বাংলা দেশে কমই ঘ'টে থাকে। ৫৭০,৯-১-৫০

নৃত্যনাট্য ও পুলিস

পাটনার একটি খবরে প্রকাশ, বিহারের পুলিস বিভাগকে নৃত্য, নাট্য এবং সঙ্গীত সচেতন করবার চেষ্টা চলছে। বিহার সরকার বিহারের ৩০,০০০ পুলিসকে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাবেন। অধিকাংশ পুলিস যাতে নাচ, গান, অভিনয় এবং ছবি আঁকা শেখে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৫৭১

এই বিভাগ থেকে একটি শিক্ষা-পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল জেলা থেকে প্রথম কিস্তিতে ৩৬ জন কনস্টেবলকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তারা পাটনা শহরে এসে নাচগান ও অভিনয় শিখছে। শিক্ষান্তে তাদের পল্লীগ্রামে পাঠানো হবে। সেখানে তারা নাচগান ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে অপরাধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে সচেতন ক'রে তুলবে। ৫৭২

এই নৃত্যনাট্য কোন্ পদ্ধতিতে শেখানো হবে জানি না। ভরতনাট্য পদ্ধতি অবশ্যই নয়, কেননা ভরতনাট্যশাস্ত্রে পুলিসনাট্য নামক কোনো বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ নেই। তা ভিন্ন যে উদ্দেশ্যে বিহারে পুলিস কনস্টেবলকে সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা সফল হবে কি না আমি জানি না। কারণ, বিহারের জনসাধারণ দেশের সংস্কৃতি কনস্টেবলদের মারফত গ্রহণ করবে কেন তা আমার পক্ষে ধারণা করা শক্ত। আমি কেবলমাত্র বাংলাদেশ সম্পর্কে ভাবতে পারি। ৫৭৩

আমার মতে বাংলাদেশের কনস্টেবলদের যদি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে এ রাজ্যের একটা বড় উপকার হবে। কারণ, এখানকার পুলিস প্রায় সকল রকম প্রতারণার বিরুদ্ধেই অভিযান চালাতে সক্ষম, কেবল সাহিত্য ও শিল্পের নামে অনেক ক্ষেত্রে যেসব প্রতারণা চলছে তার বিরুদ্ধে তার বিদ্যাবুদ্ধি অচল। পুলিস কনস্টেবলরা হাতে কলমে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'লে একমাত্র তখনই তারা এই প্রতারণা ধরতে পারবে। হয়তো নিজেরা নেচে-গেয়ে ও অভিনয় ক'রে ভেজাল নাচগান অভিনয়ে যারা অপরাধী তাদের বিরুদ্ধেও জনসাধারণকে সচেতন করতে পারবে। ৫৭৪

ভিক্ষায় হয় না?

স্পেন দেশের এক ভিখারিণী অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় প্রায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে। মৃত্যুর পর তার ঘরে তার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় ষাট হাজার টাকা

পাওয়া গেছে। ভিক্ষায় কিছুই হয় না যিনি বলেছেন, সম্ভবতঃ তাঁর বলবার উদ্দেশ্য ছিল—ভিক্ষায় টাকা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। ৫৭৫,২৩-১-৫৫

ঈভের দোষ নেই

বাইবলের মতে ঈশ্বর পৃথিবীর প্রথম মানুষ অ্যাডামকে মাটি থেকে তৈরি ক'রে তাকে ইডেন উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই উদ্যানে জীবনবৃক্ষ এবং ভালমন্দের জ্ঞানবৃক্ষ দুই-ই ছিল, কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া অ্যাডামের ছিল বিশেষভাবে নিষেধ। অতঃপর এক সময় ঈশ্বর অ্যাডামকে দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত করলেন এবং এই সময়ে তারই দেহ থেকে শ্রীমতী ঈভ জন্ম নিল। এরপর এদের উভয়ের মাঝখানে শয়তানের প্রবেশ ঘটল। শয়তান প্রথমে ঈভকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে প্রলুব্ধ করল। পরে ঈভ অ্যাডামকে অনুরোধ ক'রে তাকেও উক্ত বৃক্ষের ফল খেতে বাধ্য করল। অতএব পাপ হ'ল এদের, এবং এই পাপে এরা ইডেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হ'ল। বাইবলেব মতে মানুষের আদি জনকজননী এই অ্যাডাম ও ঈভ। ৫৭৬

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াজনিত আদি পাপ বা 'ওরিজিন্যাল সিন' এতকাল ঈভের ঘাড়ে চাপিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ শয়তান তাকেই প্রথমে প্রলুব্ধ ক'রে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়েছিল। কিন্তু গত ২৬শে জানুয়ারি ইটালির ভ্যাটিক্যান সিটির একখানি খবরের কাগজে বলা হয়েছে, আদি পাপের জন্য ঈভ অপেক্ষা অ্যাডামই বেশি অপরাধী। বলা হয়েছে—স্যাটানের প্রলোভনে ঈভ আগে পড়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু তবু অ্যাডাম ঈভের কথায় ফল খেল কেন? তার দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি, কারণ সে সময়ে সেই ছিল মানবজাতির প্রধান ব্যক্তি। শ্রীমতী ঈভ শয়তান ও অ্যাডামের মধ্যবর্তিনী ছিল মাত্র। ৫৭৭

এই খবর প'ড়ে ঈভ সম্পর্কে আমাদের হাজার দুই বছরের ধারণা দূর হ'ল। আমার মতে অ্যাডামকে প্রলুব্ধ করার জন্য ঈভ আদৌ অপরাধী নয়, বরঞ্চ আমি বলি, ঈভ অ্যাডামকে ভুলিয়েছিল ব'লেই এই পৃথিবী এমন সুন্দর হয়েছে। নইলে ইডেন উদ্যানে ব'সে মানবজাতির জন্ম হ'লে সমস্ত পৃথিবী নির্জলা ভাল মানুষে ছেয়ে যেত। তারা মানুষ হ'ত কি পশু হ'ত বলা শক্ত। বড়জোর কোটি কোটি ঋষিতুল্য ব্যক্তি পৃথিবীর অরণ্যে জীবন কাটাত। পৃথিবীর স্বাদ থাকত না কিছু। ৫৭৮

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াকে অপরাধ মনে করাটাই তো একটা বড় রকমের ভ্রান্তি। পৃথিবীতে সবাই একই আদর্শের ভাল মানুষ, এমন অবস্থা কল্পনা করতেও ভয় হয়। ৫৭৯

সত্য বটে বর্তমান মানুষ দুর্নীতির দিক দিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে অনেক সময়। কিন্তু নীতির দিক দিয়েও সে কম বাড়াবাড়ি করেনি। দুই-ই সমান খারাপ। শুধু অন্ধকার অথবা শুধু আলো। এমন কি মেরু প্রদেশের মতো ছমাস অন্ধকার ছমাস আলোও বাড়াবাড়ি। আলো আঁধারের সুষমাপূর্ণ সমতাই আমাদের কাম্য। কারণ একমাত্র তেমন অবস্থাতেই আমরা আলো ও অন্ধকার দুই-ই বুঝতে পারি। অর্থাৎ সংসারে ভালমন্দের সুষমাপূর্ণ সমতা আছে ব'লেই ভালমন্দ বুঝতে পারি। জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খেলে এই বোধ আমাদের থাকত না। ৫৮০

স্যাটান নমস্য ব্যক্তি

জ্ঞানবৃক্ষের ফল যদি ঈভ না খেত এবং অ্যাডামকে না খাওয়াত, তা হ'লে পৃথিবীর কোনো চরিত্রই থাকত না। ভালমন্দের জ্ঞানহীন মানুষ পশু-জীবন যাপন করত। অতএব স্যাটান বা শয়তান পৃথিবীর পরম উপকার করেছে। সে মানবজাতিরই বড় বন্ধু। অ্যাডাম ও ঈভের ভিতর দিয়ে সে ভবিষ্যৎ মানুষের স্বপ্ন সফল করেছে। ঈভ স্যাটানের হাতের যন্ত্র মাত্র। সে নিজে কিছু না বুঝে অ্যাডামকে ফল খেতে রাজি করিয়েছে। ঈভ এ জন্য মানুষের হাতে যত গাল খাক—এখন বুঝতে পারি সে স্যাটানের কথায় রাজী না হ'লে পৃথিবী সৃষ্টিটাই ব্যর্থ হয়ে যেত। 'ভালয় মন্দে আলোয় আঁধারে গিয়েছে মিশি'—এ কাব্য আর লেখা হত না। ৫৮১

অতএব আদি পাপ ঈভেরও নয়, অ্যাডামেরও নয়, স্যাটানেরও নয়, এ সবের সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দরকার। সে ব্যাখার ইঙ্গিত আমি দিলাম। ভ্যাটিক্যান সিটির কাগজ 'নতুন দৃষ্টি পাবে কোথায়, সে কাগজ হাজার দুই বছরের এক ভ্রান্তিকে দ্বিতীয় আর এক ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করল মাত্র। ৫৮২

করাচীর খবর

এবং সেও করল অনেক দেরিতে। মাসখানেক আগে করলেও সম্ভবত করাচীর একটি মেয়ে বেঁচে যেত। বিয়েতে রাজী করাতে না পেরে করাচীর এক যুবক একটি মেয়ের নাক দাঁতে কেটে নিয়ে পালিয়ে গেছে। মেয়েটি চিৎকার ক'রে

কাঁদতে কাঁদতে থানায় গিয়ে খবর দিয়েছে, কিন্তু পুলিস অপরাধীকে খুঁজে পায়নি। ৫৮৩

আদি পাপ ঈভের, এই ধারণা প্রাচীনকাল থেকে লোকের মনে এমনই শিকড় গেড়ে বসেছে যে, দৈনন্দিন জীবনেও ঈভের জাতের নির্যাতন বেশি মনে হয়। অন্তত কাগজে-কলমে। ভ্যাটিক্যান সিটির কাগজ সম্ভবত সেটি লক্ষ ক'রেই আদি পাপ ঈভের ঘাড় থেকে অ্যাডামের ঘাড়ে চালান করতে চেয়েছে। অর্থাৎ এতদিন তো মেয়েরা নির্যাতিত হয়েছে, এখন থেকে পুরুষেরা নির্যাতিত হোক। ৫৮৪

ভ্যাটিক্যান সিটির উক্ত কাগজকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, আদি পাপের বোঝা অনেকদিন আগে থেকেই পুরুষের ঘাড়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যদিও সেটি খবর হিসাবে অনেকে না জানতে পারে—যেমন জানে না করাচীর ঐ যুবক। বিহারে লোক গণনার সময় যেমন বহু বাংলাভাষীকেও হিন্দিভাষী করা হয়েছে, আদি পাপের নামেও তেমনি পুরুষ নির্যাতিত হলেও, হিসাবে লেখা হয় মেয়েরা নির্যাতিত। ৫৮৫,৬-২-৫৫

গাছের বেলেল্লাপনা

বর্ধমানের খবর—গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একখানা বাসের প্রায় বারোজন আরোহী জখম হয়েছে এবং বাসখানি ভেঙে গেছে।—এ জাতীয় খবর নতুন নয়, পথের ধারের গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়ি হামেশাই ভাঙছে। কিন্তু এই যে প্রকাশ্য পথের উপর গাছেরা মাতলামি ক'রে বেড়ায়, এর বিরুদ্ধে আইন হওয়া দরকার। অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেকটি গাছ যাতে নিজ নিজ নির্দিষ্ট জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে এবং গাড়ি দেখলেই গাড়ির সামনে ছুটে না আসে, তার জন্য কড়া পাহারা বাঞ্ছনীয়। ৫৮৬

মধুসূদনের উপাধি

দৈনিক বসুমতীর 'সাহিত্যপত্র' বিভাগে কোনো কলেজের একটি ছাত্রী প্রশ্ন করেছেন—"মাইকেল উপাধি মধুসূদন কোন্ প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছে?"—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সন্দেহ হয়—যাঁরা শেক্সপীয়ারকে উইলিয়াম, জনসনকে স্যামুয়েল, মিলটনকে জন, ব্রাউনিংকে রবার্ট এবং শ'কে বারনার্ড উপাধি দিয়েছিলেন, মধুসূদনকে মাইকেল উপাধিও তাঁরাই দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে মতভেদ থাকা সম্ভব। ৫৮৭,১৩-৩-৫৫

পরীক্ষা ও যুদ্ধ

এবারের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময় বাংলাদেশের যাবতীয় খবরের কাগজের পাঠক নিশ্বাস বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করছিল, কবে যুদ্ধ আরম্ভ হবে। কিন্তু কিছুই না হওয়াতে সব কেমন যেন মিইয়ে গেল। প্রথম দিন খবর বেরুলো—আজ কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেনি। দ্বিতীয় দিনের খবর—পরীক্ষা আজও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল। তৃতীয় দিনের খবর—আজও দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর শোনা যায়নি—ইত্যাদি। ৫৮৮

খবরের কাগজও যে গুরুতর কিছু আশঙ্কা করছিল, তা ঐ খবরের ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু কলকাতা শহরে কিছু না ঘটলেও শিলিগুড়ি এবারে আমাদের মান রক্ষা করেছে। এখানে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার শেষে এক ক্রুদ্ধ জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে জনৈক ইনভিজিলেটর বা নজরদার আহত হন এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের বহু জানালা ও কাঁচের শাসি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। ৫৮৯

'অসদুপায়' অবলম্বনের জন্য পূর্বাহ্ণে পরীক্ষাঘর থেকে কয়েক জনকে বা'র ক'রে দেওয়া হয়েছিল। পরে তাদেরই নেতৃত্বে এক ইন্‌স্পায়ার্ড জনতা এসে স্কুল আক্রমণ করে। তারা এক শোভাযাত্রা বা'র ক'রে 'পরীক্ষা বাতিল হোক' এমন দাবীও জানায়। ফলে ১৮ই মার্চ থেকে সেখানে পুলিসের অধীন পরীক্ষা চালানো হয়েছে। ৫৯০

শিলিগুড়ির ছেলেদের বুদ্ধিমান বলতে হবে কারণ তারা ধরতে পেরেছে প্রশ্ন কঠিন, কলকাতার ছেলেরা ধরতেই পারেনি। কলকাতায় যে গণ্ডগোল হয়নি তার আরও কারণ এখানে আগে থাকতেই পুলিসের ব্যবস্থা ছিল। শোনা যায় কেল্লায় মিলিটারি এবং চাঁদপাল ঘাটে যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত ছিল। মাথার উপর বমার এবং ফাইটারও যেন উড়তে দেখেছি কয়েক দিন। নইলে প্রশ্নপত্র যা দেখা গেল তাতে বড় রকম একটা যুদ্ধ অনায়াসে হ'তে পারত। প্রতিপক্ষ প্রবলতর জেনেই যুদ্ধ বাধেনি। নইলে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর লিখে পাসকরা-রূপ হীনতা সহ্য করা বরাবরই কয়েকজন পরীক্ষার্থীর সয় না, এবং তাদেরই নেতৃত্বে অন্য পরীক্ষার্থীদের সম্মান রক্ষা পায়। ৫৯১

তা ভিন্ন পরীক্ষায় যাকে অসদুপায় বলা হয়, তা সত্যই অসদুপায় কি না, এখনও

তার শেষ মীমাংসা হয়েছে ব'লে মনে হয় না। কারণ সন্দেহ হয়, পাস করবার জন্য পরীক্ষা নেওয়াটাই হয় তো একটা অসদুপায়। কে বলবে কোন্‌টা ঠিক। ৫৯২

টেলিভিশনে ক'নে দেখা ?

ক'নে দেখার রীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে যুগান্তরে। ভয় পাবার কিছু নেই, অল্প দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে একটি উন্নত উপায় এসে যাচ্ছে। কারণ অতঃপর ক'নে দেখা চলবে টেলিভিশনের সাহায্যে। টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট ফী নিয়ে ব্যবস্থা করতে পারবে অনায়াসেই। বর পক্ষের দর্শকদের আপ্যায়ন করতে হবে না, কনেকে পরীক্ষকদের সামনে উপস্থিত থেকে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হবে না, স্টুডিওতে ব'সে আবৃত্তি, কিংবা গান গাইতে গাইতে দাঁত দেখাবার ছলে হাস্য, চিরুনীর সাহায্যে চুল আঁচড়ানোর ছলে চুলের দৈর্ঘ্য দেখানো এবং দুখানা হাত এবং দুখানা পা ঠিক আছে কি না তা স্কিপিং ক'রে বা নেচে বেশ দেখানো যেতে পারবে। সঙ্গে কমেণ্টারি থাকবে, খেলাধুলা বা অন্যান্য উৎসব রিলে করবার সময় যেমন হ'য়ে থাকে অথবা সিনেমায় সংবাদচিত্রে যেমন হ'য়ে থাকে তেমনি। কনেরা দাবী করলে বর দেখানোর ব্যবস্থাও ঠিক এইভাবে হওয়া সম্ভব। ৫৯৩,২৭-৩-৫৫

ব্যাঙের বিয়েতে ভুল মন্ত্র ?

গত ১৬ই মার্চ তারিখের খবর ছিল করিমগঞ্জে অনাবৃষ্টির জন্য ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় রীতি এটি। সেখানকার লোকদের ধারণা এতে বৃষ্টির দেবতা তুষ্ট হন। আমরাও আশা করেছিলাম বৃষ্টির দেবতা তাঁর প্রিয় সন্তানের বিয়েতে তুষ্ট হবেন। কিন্তু ২২শে মার্চের খবরে যা দেখলাম তাকে তো তুষ্ট হবার নমুনা ব'লে মনে হ'ল না। ২১শে মার্চের ঝড়ে বহু বাড়ি ভেঙে গেছে, বহু লোক নিরাশ্রয় হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ব্যাঙের বিয়ের মন্ত্রপাঠে এমন কিছু ভুল ছিল না তো যাতে এই বিভ্রাট ঘটেছে ? পাত্র পাত্রীর গোত্রাদি মিলিয়ে নেওয়া হয়েছিল কি ? ৫৯৪

শস্তায় রেল টিকিট

এদেশে ফলিত বিজ্ঞানের নানা শাখা আছে। তার একটি শাখার কথা কিছুদিন আগে শুনিয়েছিলাম—লটারির টিকিট তৈরির কারখানার কথা। তারপর আর

একটি শাখার খবর বেরিয়েছে। এবারে লটারির টিকিট নয়, রেল টিকিটের কারখানা। একটা নয়, অনেক। ভারতীয় রেলের ক্রমোন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এটি বড়ই দরকার ছিল। ভারতীয় রেলওয়ের কল্যাণকামী একটি দলের পরিচয় আমরা অনেক দিন ধ'রে জানি। তারা বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে। এইবার দ্বিতীয় দলের পরিচয় পেলাম। এরা শস্তা টিকিটে ভ্রমণ করে। ৫৯৫

তাই তো এতদিন ভেবে পাইনি ট্রাম ভাড়া এক পয়সা বাড়লে এত গণ্ডগোল হয় কেন, আর ট্রেনভাড়া দ্বিগুণ তিনগুণ বাড়লেও খবরের কাগজ ভিন্ন আর কোথায়ও প্রতিবাদ শোনা যায় না কেন। এতদিনে বিষয়টি পরিষ্কার হ'ল। অপর পক্ষে এত ভাড়া বাড়িয়েও রেলের যথেষ্ট উন্নতির মতো টাকা হয় না কেন, কর্তৃপক্ষ তা সম্ভবত এতদিনে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। ৫৯৬

বন্যপ্রাণী সৌজন্য সপ্তাহ

বন্য জন্তুদের রক্ষা করা বিষয়ে স্টেটসম্যান কাগজে কিছুদিন আলোচনা চলছে। সর্বশেষ ২৯শে মার্চের কাগজে জুওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইণ্ডিয়ার ডাইরেক্টর ডক্টর হোরার একখানি চিঠি ছাপা হয়েছে। তাতে তিনি অন্যান্য পত্রলেখক-লেখিকার মত সমর্থন ক'রে জানিয়েছেন প্রত্যেক রাজ্যে একটি ক'রে বন্যপ্রাণী-দিবস পালন ক'রে বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য চাঁদা তোলা দরকার। এটি যে অত্যাবশ্যক এতে সন্দেহ নেই। ঐ সঙ্গে বন্যপ্রাণী সৌজন্য সপ্তাহও একটা পালন করা উচিত। সেই সপ্তাহে জঙ্গলের বাঘ ভাল্লুক সিংহ প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের দেখাশোনা, কুশলাদি প্রশ্ন এবং সংস্কৃতি বিনিময় ইত্যাদি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৫৯৭

গোরু চোর

"দিবালোকে গোরু চুরি" শীর্ষক একটি খবর বেরিয়েছে। গোরুসহ চোর ধরাও পড়েছে। ঘটনাস্থল মেদিনীপুর জেলার কোনো গ্রাম। চোর ধরা পড়েছে জেনে মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গেল। কারণ, সংসারে যত রকমের চোর আছে তার মধ্যে গোরু চোর হচ্ছে সবচেয়ে নিরীহ এবং করুণ-দর্শন। একেবারে গোবেচারা। এমন কি কোনো নিরীহ সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই লোকে ব'লে থাকে লোকটার চেহারা গোরুচোরের মতো। প্রাচীনকাল থেকে কথাটি প্রচলিত। তাই গোরুচোর ধরা পড়েছে শুনলেই কথাটা খচ ক'রে মনে বেঁধে। মেদিনীপুরের খবরটা আরও মারাত্মক এই কারণে যে, লোকটি প্রকাশ্য দিবালোকে গোরু চুরি

করেছে। সে বলেছে সে খেতে না পেয়ে এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। স্বাধীন ভারতে এই গোরুচোর সম্প্রদায়ের উন্নতির কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে জানতে ইচ্ছা করে। ৫৯৮

কবি নেহরু

কে সি বোস রোড থেকে শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য এক চিঠিতে লিখেছেন—

মহাশয়, গত ২২শে মার্চ মঙ্গলবারের যুগান্তরে আই-ই-এন-এস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনোপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত ভাষণের যে অনুলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ৫ম পৃষ্ঠার ৭ম কলমের ৬ষ্ঠ প্যারাগ্রাফে শ্রীনেহরুকে বার বার কবি হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সূক্ষ্ম অর্থে শ্রীনেহরুকে কবি বলা হয়তো অন্যায় নহে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেরূপ কোন প্রতীতি হইতে উক্তরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এরূপ মনে করিবার সম্ভবতঃ কারণ নাই। আর তাহা হইলে স্বভাবতঃই ইহাতে কৌতুক বোধ না করিয়া পারা যায় না। ৫৯৯

এটি ভুল নয়। সংস্কৃতে পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞকে কবি বলা হয়। "পণ্ডিত" জবাহরলালকে "কবি" জবাহরলাল বলায় সেই জন্যই অন্যায় হয় না। তা ভিন্ন আইডিয়ালিস্ট বা ভাববাদী মাত্রকেই দার্শনিক অথবা কবি বলা সমাজে রীতি আছে। আমরা সবাই আংশিক কবি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ও কবি। তবে কত অংশ কবি তা তাঁর সঙ্গে ইণ্টারভিউ-এর ব্যবস্থা ক'রে জানতে পারেন। ৬০০,৩-৪-৫৫

পশুবলি

কাঠমাণ্ডুতে চৈত্র অষ্টমী উপলক্ষে ৫০০ মোষ, ১৫০০ ছাগল ও ৩০০০এর বেশি অন্যান্য ক্ষুদ্র পশু ও পাখী বলি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় থানার কাছে কোয়াট নামক স্থানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবে নেপালের প্রধান সেনাপতি, ভারতীয় সামরিক মিশনের নেতা এবং বহু বিশিষ্ট সামরিক অফিসার ও বে-সরকারী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নেপালের এটি বার্ষিক উৎসব। ৬০১

গৃহপালিত পশুর কথা স্বতন্ত্র, হত্যা করা বিষয়ে সবারই স্বাধীনতা আছে। কিন্তু বন্য পশু-পক্ষী এক সঙ্গে কয়েক হাজার বলি দেওয়ার খবর প'ড়ে মনে হয় ওখানে বন্য প্রাণীদের বংশ রক্ষার আন্দোলন এখনও কেউ করেনি। ৬০২

হিন্দুদের অবশ্য মোষ বলি দেবার রীতি সর্বত্রই প্রাচীনকাল থেকে আছে। বাংলা দেশেও খুব বেশি ছিল আগে, এখন বিশেষ শোনা যায় না। তার কারণ বোধহয় এই যে, যে-ধারণা থেকে বলি দেওয়া হ'ত তার পরিবর্তন ঘটেছে। শোনা যায় পাশবিক শক্তি দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়াতে মানুষেরই মধ্যকার পশুশক্তির দমন হয়। কথাটা সত্য হ'লে খুব যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয় না। সাধারণ যুক্তিতে এই বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে পশুশক্তির আধিক্য না ঘটলে বৃথা পশু হত্যার প্রশ্নই ওঠে না। মানবীয় যুক্তিতে, শুধু রীতি পালনের খাতিরে, পশু বা পাখীবধ-উৎসব খুব উচ্চাঙ্গের উৎসব ব'লে মনে হয় না। ৬০৩

অকারণ পাঁচ শ বা হাজার মোষ বধে আমাদের বিবেক পীড়িত হয় না এটা খুবই বিস্ময়কর। অথচ গোরু এবং মোষের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কোনো পার্থক্য নেই। গোরু দুধ দেয়, মোষ দুধ দেয়। গোরু গাড়ি টানে, মোষ গাড়ি টানে। গোরুর দুধ থেকে ঘি হয়, মোষের দুধ থেকে ঘি হয়। গোরুর দুধ থেকে দই হয়, মোষের দুধ থেকে দই হয়। গোরুর চামড়া থেকে জুতো হয়, মোষেব চামড়া থেকে জুতো হয়। তবে পার্থক্য শুধু এই যে গোরু 'দেবতা', মোষ দেবতা নয়। কিন্তু এই পার্থক্য বস্তুগত নয়। ৬০৪

এর মূলে শুধু সেন্টিমেন্ট। সেন্টিমেন্ট খুব উচ্চাঙ্গের জিনিস সন্দেহ নেই, আর ঠিক এই কারণেই এর নামে ফ্যানাটিকও হওয়া যায় খুব সহজে। অথচ একটু যুক্তি চালনা করলেই বোঝা যাবে দুধ দেবার জন্য গোরু যদি গোমাতা হ'তে পারে তা-হ'লে মোষ এবং ছাগও ঐ একই দাবীতে মাতা হ'তে পারে। অন্তত পক্ষে মাসি হওয়ায় বাধা কি? সুতরাং মাসি হত্যাতেও সেন্টিমেন্ট জাগা উচিত। কিন্তু কাজের বেলায় এদের সম্পর্কটা আমরা ভুলে যাই। ৬০৫,১২-৪-৫৫

প্রতিবাদ ও দাড়ি

মাউন্ট আবু বম্বে থেকে আলাদা ক'রে রাজস্থানের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, এবং যতদিন তা না হয় ততদিন তার প্রতিবাদস্বরূপ একদল লোক চুল এবং দাড়ি গজাবে এই শপথ গ্রহণ করেছে। মাউন্ট আবুর রাজস্থানভুক্তির সমর্থক দলের (অ্যাকশন কমিটির) পাঁচজন সভ্য ১৯৫১ সন থেকে এই উদ্দেশ্যে চুল-দাড়ি রেখেছেন। তাঁরা সম্প্রতি তাঁদের তরঙ্গায়িত চুল এবং দাড়িসহ রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের সঙ্গে দেখা করেছেন। ৬০৬

সামাজিক রীতি-নীতি বা সংস্কৃতির বিবর্তনে চুল ও দাড়ি একটি বিশিষ্ট স্থান দখল ক'রে আছে। কোনো কোনো স্থানে বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা ও-দুটির কোনোটাতেই হাত দেয় না। এই সম্প্রদায়ের কোনো লোক কোনো কিছুর প্রতিবাদে চুল দাড়ি রাখে না, রীতি পালনের জন্যই রাখে। কিন্তু যারা স্বভাবত দাড়ি কামায় এবং চুল ছাঁটে তারা যদি হঠাৎ চুল দাড়ি রাখতে শুরু করে, তা হ'লে তা শুধু প্রতিবাদমূলক না হ'য়ে অন্য কোনো উদ্দেশ্যমূলকও হ'তে পারে। প্রতারণার কৌশল হতে পারে, বিশেষ উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণের প্রয়োজন হতে পারে (যেমন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র), অশৌচ পালনের উদ্দেশ্যে হ'তে পারে (যদিও সম্প্রতি নেপালীরা তাদের রাজার মৃত্যুতে দেশসুদ্ধ সবাই চুলদাড়ি কামিয়ে অশৌচ পালন করেছিল)—অতএব দেশ, সম্প্রদায় ও প্রয়োজন ভেদে চুল-দাড়ির উদ্দেশ্য বিভিন্ন। ৬০৭

আমাদের দেশে চুল-দাড়ি অবশ্য-পালন বা কর্তন সামাজিক সংস্কৃতি নয়। এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-সংস্কৃতি। কাজেই এদেশে চুল-দাড়ির ব্যাখ্যা সব সময়ে দেওয়া যায় না। বোঝা যাচ্ছে, উপরোক্ত রাজস্থান-পক্ষীয় প্রতিবাদকারীরা দাড়িহীন ছিলেন এবং চুল ছাঁটতেন। দাড়িহীনতা সম্ভবত তাঁদের কম্পাল্‌সরি রীতি ছিল, অপশোনাল নয়। অতএব প্রতিবাদ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে চুল দাড়ি রাখা এঁরা হয়তো ভাবতেই পারেন না। হয়তো এঁরা শিখদের প্রতি সন্দেহপূর্ণ দৃস্টিতে তাকিয়ে থাকেন এবং সেজন্য বাংলা দেশের শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের ছবি দেখে তাঁদের দাড়িও উদ্দেশ্যমূলক ভেবে নিজেদের কাজের নৈতিক সমর্থন পেয়ে থাকবেন। ৬০৮

আনুষ্ঠানিক পুলিস পূজা

'পুলিসদেবী'র সন্তুষ্টি বিধানের এক অদ্ভুত খবর বেরিয়েছে। রাঁচি জেলার কোনো গ্রামের সরল অধিবাসীরা পুলিসের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পুলিস দেবতাকে পুজো করবার উদ্দেশ্যে চাঁদা তুলতে শুরু করেছে। এ নাগাদ এক হাজার টাকা উঠেছে। কিভাবে পুজো হবে প্রকাশ নেই, তবে মনে হয় মাটির পুলিস প্রতিমা গড়া হবে এবং অন্যান্য দেবতার পুজোর অনুকরণেই পুলিসদেবীও পুজো করা হবে। ৬০৯

এরা ঠিক আর্য পথ ধরেছে। এই পথই আমাদের বহুদিনের অভ্যস্ত পথ। মাঝখানে বহু রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেছে এদেশে, তাই হয়তো পথ ভুলে থাকব। সে যুগে দেবতামাত্রকেই তোয়াজ করার রীতি ছিল। যে-কোনো দেবতার তপস্যা করলেই তপস্যাকারী যত অভাজন হোক তার কিছু বর-প্রাপ্তি ঘটত। দেবতাদের গুণগান করতে হ'ত বিধিমতে। তা করতে পারলে ঘৃণিত রাক্ষসেরাও দেবতাদের কাছ থেকে অমরত্ব বর কিম্বা মারাত্মক অস্ত্র বর লাভ করতেন। শত শত বছর ধ'রে তোয়াজ করতে হ'ত তখন। দেবতারা কখনও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে কাউকে বর দেননি। ইউরোপীয় হিউম্যানিজম এই দেবতাদের অজানা ছিল। জনসেবা, সাধারণ নরের মধ্যে নারায়ণকে দেখা (যেমন দেখেছেন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি) দেবতাদের যুগে অজানা ছিল। তাঁদের মটো ছিল, ফেল কড়ি মাখ তেল। ৬১০

ক্রমে ফিরে আসছে সেই প্রাচীন কাল। তবে উপরের ঐ পুলিসদেবীব পুজো ব্যাপারটা রাঁচির খবর ব'লেই ওতে একটু সন্দেহ থেকে গেল। ৬১১

বিনা পরীক্ষায় ছাত্রী পাস

কিছুদিন আগে জোড়হাটের একটি খবর থেকে জানা যায় আসাম সরকার পরিচালিত বিগত মধ্য-ইংরেজী পরীক্ষায় গোলাঘাটের একটি বাঙালী ছাত্রী পরীক্ষা না দিয়ে পাস করেছে। সে পরীক্ষার্থিনী ছিল, কিন্তু পরীক্ষার সময় তার বিয়ে হয়, সেইজন্য সে পবীক্ষা দিতে পারেনি। কিন্তু তথাপি উক্ত ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে এবং তাব নাম আসাম গেজেটে পাসকবা ছাত্রীদের তালিকায় ছাপা হয়েছে। ৬১২

ঘটনাটি নতুন হ'লেও বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। আমাদের দেশে অধিকাংশ মেয়েকেই এখন স্কুল-কলেজে পড়ানো হয় বিয়ের প্রস্তুতির জন্য। আগে এ সব ছিল না। আগে শুধু দাঁত দেখাতে হ'ত, চুলের দৈর্ঘ্য দেখাতে হ'ত, হাত পায়ের রিফ্লেক্স ঠিক আছে কি না দেখাতে হ'ত। এখনও এ-সব আছে, উপরন্তু তার সঙ্গে স্কুল-কলেজি বিদ্যা। ৬১৩

সুতরাং বিয়েই মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার মূল উদ্দেশ্য ধ'রে নিয়ে কোনো রাজ্য সরকার যদি বিয়ে এবং পরীক্ষা পাসকে সম-মর্যাদা দেয় তবে আপত্তি কি? অর্থাৎ

বিয়েকে পরীক্ষার বিকল্প ধরা। মেয়েদের দৃষ্টিতে ও দুটিই সমান মারাত্মক। অনেক সময় অবশ্য পরীক্ষাই বেশি মারাত্মক, এবং সেজন্য পরীক্ষা কাছে এলে অনেক মেয়ে বিয়েতে চট ক'রে রাজি হয়ে যায়। বলে, মা—পাত্র দেখ। ৬১৪

গুজব এই যে বাংলাদেশের ক'নে দেখার রীতি একেবারে বদলে যাচ্ছে শিগ্‌গিরই। আজকাল ক'নে দেখায়, ক'নেকে যে-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সে দিকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। শুনছি বিবাহার্থিনীদের এখন উক্ত কমিশনের হাতে পড়তে হবে এবং সেখান থেকে সুপারিশ পেলে তবে বিয়ের উপযুক্ত হওয়া যাবে। ৬১৫

তিরস্কারে তস্করের সুবুদ্ধি

আসানসোলের কাছে এক গ্রাম থেকে এক অভিনব উপায়ে চোরাই টাকা ফিরে পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে গ্রামের বাসিন্দা তিনজন মহিলার ঘর থেকে গোপনে রক্ষিত প্রায় ৯০০ টাকা চুরি যায়। চোরের কোনো উদ্দেশ না পেয়ে মহিলারা পালা ক'রে চোরদের উদ্দেশে অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকেন। এইভাবে তিনদিন ধ'রে শাপান্ত চলবার পর চতুর্থ দিন সকালে দেখা যায় চোর একটি পুঁটুলিতে মোট টাকার দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬০০ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। কি ভাষায় গালাগাল দেওয়া হয়েছিল উল্লেখ নেই, তবে হিন্দিতে যে দেওয়া হয়নি তার প্রমাণ ঐ ফেরত টাকার পরিমাণ। হিন্দীতে গাল দিলে সবটাই ফেরত পাওয়া যেত। ৬১৬,১৭-৪-৫৫

স্ত্রীর মুখে মুখোশ ~

ইটালির মাসা নামক একটি জায়গায় এক যুবক তার সদ্যোবিবাহিত স্ত্রীর মুখে সাউণ্ড-প্রুফ মুখোশ পরিয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য স্ত্রীর বকবকানি বন্ধ করা। স্ত্রী পুলিসকে খবর দিয়েছে। ৬১৭

মেয়েরা একটু বাচাল হয়, বেশি কথা বলে, এ ঘটনা পৃথিবীর কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ নয়, সবকালে সবদেশে মেয়েদের ওটি স্বভাবধর্ম। পুরুষের মধ্যেও বাচাল আছে অনেক, কিন্তু তারা ব্যতিক্রম, সাধারণ নিয়মাধীনে নয়। এবং একথাও সত্য যে, পুরুষরা যে সাধারণতঃ কম কথা বলে এবং মেয়েরা বেশি কথা বলে তা কারো অজানা থাকবার কথা নয়। সবাই জানেন এই দুই বিপরীতে মিলে শঙ্কিত সংসারের ভারসাম্য রক্ষা হয়, সংসার সুখে চলে। নইলে স্বামী-স্ত্রী

দুজনেই বাচাল হ'লে অথবা দুজনেই কম কথা বললে এই ভারসাম্য নষ্ট হ'য়ে যেত। ৬১৮

অতএব এই অতি পরিচিত সত্যটি সবাই মেনে নেবে এটা আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু তবু যে ঐ ইটালীয় যুবক তার স্ত্রীর মুখে মুখোশ পরিয়েছে তার কারণ স্বতন্ত্র। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। ব্যক্তিগত রুচি সাধারণ নিয়মের বাইরে। অতএব সমালোচনারও বাইরে। যদি কোনো স্বামী কম কথা বলা স্ত্রী পছন্দ করে, তার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই। উপরোক্ত ইটালিয়ান স্বামী হয়তো এই শেষোক্ত দলের। কিন্তু একটি সন্দেহ থেকে গেল। সে বিয়ের আগে স্ত্রীজাতির এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথাটি ভুলে গিয়েছিল কেমন ক'রে? অথবা বুঝতে পারেনি কেন?—ভাবতে অবাক লাগে। তবে কি ইটালিতেও আমাদের দেশের মতো ক'নে দেখার রীতি প্রচলিত আছে? অর্থাৎ ক'নেকে একদিন দেখে গোটাকত প্রশ্ন ক'রেই পছন্দ করা হয়েছে? ৬১৯

ইংরেজের দেশে কিন্তু পুরুষদের নিজ নিজ স্ত্রী সম্পর্কে আশাভঙ্গের প্রশ্ন নেই—অন্তত বাচালতার দিক দিয়ে নেই। অর্থাৎ মেয়েরা যে বেশি কথা বলে তা জেনেই তারা বিয়ে করে, এবং সহ্যও করে। এমনকি কোনো কোনো স্বামী সংযতবাক স্ত্রী পছন্দ করলেও বাচাল স্ত্রীকে মেনে নেয়, এবং মুখোশ পরায় না। তবু অনেক ইংরেজ পুরুষই যে বাচাল স্ত্রী পছন্দ করে না, তা তারা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভয়ে প্রকাশও করে। ৬২০

একটি গল্প জানা আছে। হাইড পার্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক যুবক এবং যুবতী পাশাপাশি ব'সে ছিল। বসাটা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা। তবু তারা অনেকক্ষণ ব'সে ছিল—এবং স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ নীরবে। যুবকটির মনে কিছুক্ষণের মধ্যে একটি বিস্ময় ফুটতে লাগল। সে কথা না ব'লে থাকতে পারল না। মেয়েটিকে সে জিজ্ঞাসা করল "তুমি বিনা দরকারে কথা বল না?" মেয়েটি সংক্ষেপে বলল "না।" "কখনো না?" "কখনো না।" তখন যুবকটি গদগদ-ভাবে মেয়েটিকে বলল, "আমাকে বিয়ে করবে? আমি এই রকম একটি মেয়ে খুঁজছি।" ৬২১

ইউরোপের কোনো মেয়ে, পাশে লোক থাকা সত্ত্বেও, কয়েক ঘণ্টা চুপ ক'রে ছিল এটি পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য। মনে হয় উক্ত ইংরেজ যুবক-যুবতীর পরে বিয়ে

হয়েছিল এবং তাদের দাম্পত্য জীবনও সুখেই কেটেছে। তাদের সম্পর্কে আমার কোনো কৌতূহল নেই। আমি ভাবছি ইটালিয়ান যুবকটির কথা। তাকে তার স্ত্রীর মুখে মুখোশ পরাতে হ'ল কেন? স্ত্রী কি এতই বেশি কথা বলত? না থেমে তিন দিন পর্যন্ত কথা বলার রেকর্ড ইংরেজ স্ত্রীর আছে। সে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে কোনো শান্তি পায়নি। খবর থেকে জানা যায় ইটালিয়ান দম্পতির মাত্র এক মাস বিয়ে হয়েছে। তবে কি তার স্ত্রী এই এক মাস ধরেই অবিরাম কথা ব'লে গেছে? এটি যদি প্রমাণ হয় তা'হলে বিচারকের সহানুভূতি যে স্বামীর দিকেই যাবে এতে সন্দেহ নেই। ৬২২

কিন্তু এটি হ'ল ইউরোপীয় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। ইউরোপীয় স্বামীর স্ত্রীর উপর কতটা অধিকার আছে, তার কথা এটি। স্ত্রীর মুখে মুখোশ বেঁধে দেওয়ার অধিকার হয় তো তার আছে, হয় তো নেই। আদালতের বিচারে সেটা ঠিক হবে। কিন্তু কায়রোর একটি খবরে তথাকার দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারের এমন একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে, যাতে সবাই মুগ্ধ হবে। এটি মানবিক আধকারের ছবিও বটে। ৬২৩

কায়রোর ২২ বছরের এক স্ত্রীর মুখে তার স্বামী চড় মেরেছে, এবং এ ক্ষেত্রেও স্ত্রী আদালতে নালিশ করেছে। এই উপলক্ষে স্ত্রীর মুখে চড় মারার অধিকার স্বামীর আছে কি না, কায়রোর বিচার থেকে তা জানা গেল। অধিকার নেই। জজ শেখ মাহমুদ মিকোয়াই বিবাহ বিচ্ছেদের অনুকূলে রায় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন স্ত্রীকে মারার অধিকার স্বামীর অবশ্যই আছে (অর্থাৎ মারবেই তো, স্বামী যখন) —কিন্তু মুখে নয়। এ বিষয়ে কতকগুলো বিধি মানতে হবে। বিচারক বলেছেন, "although a husband may beat his wife with a cane no thicker than a finger, he must not strike her on the face which reflects beauty of woman." অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে আঙুলের চেয়ে বেশি মোটা নয় এমন বেত দিয়ে অবশ্যই মারতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর মুখে মারা উচিত নয়, কেন না স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের আয়না হচ্ছে তার মুখ। ৬২৪

খাঁটি কথা। কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীর বাচালতা সহ্য করতে পারে না, স্ত্রী সমস্ত দিন বকবক করলে তার যে মুখেই ঘা মারতে ইচ্ছা হবে, বিচারকের এই দিকটাও ভেবে দেখা উচিত ছিল। বিচারক বেতের ব্যবহার সমর্থন করেছেন, কিন্তু এটি আরও

বেশি নিষ্ঠুর নয় কি? কারণ এটি হ'ল হাতে কলমে মার। এর চেয়ে মৌখিক মার অনেক ভাল। ৬২৫

মন্ত্রীরা তামাক খাবে না?

লোকসভায় শ্রীট্যাণ্ডন মন্ত্রীদেব ধূমপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়ায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মন্ত্রীদের আসন থেকে কয়েকজন এর কড়া জবাব দেন এবং ডঃ পঞ্জাবরাও দেশমুখ মন্তব্য কবেন, মন্ত্রীরা প্রায় সবাই ধূমপায়ী। ৬২৬

মন্ত্রীরা ধূমপান ছেড়ে দেওয়ায় আপত্তি কবলেন কেন বোঝা যায় না। মার্ক টোয়েনকে স্মবণ ক'রে ছেড়ে দেবেন বললেই গণ্ডগোল চুকে যেত। ছেড়ে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, "ধূমপান অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া খুবই সোজা, তার প্রমাণ, আমি বহুবার ছেড়েছি।" ৬২৭

টেমস—তমসা

ভূগোল পরীক্ষায় টেমস নদীর পরিচয়ে একটি ছেলে লিখেছে—"ইহা ভারতের বিখ্যাত তমসা নদীরই অপব নাম।" লিখে ঠিকই করেছে, কারণ ছেলেদেব সাধারণ জ্ঞান কতখানি তমসাচ্ছন্ন হয়েছে, এ থেকে তা বোঝা যায়। ৬২৮,১-৫-৫৫

স্কুল ফাইনালে রবীন্দ্রনাথ

এক পরীক্ষার্থী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচনা লিখতে এক জায়গায় বলেছে—"যখন ইংরেজ ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করিয়া শক্তিহীন করিতে চাহিল, সে সময় এক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধকে রাস্তার সবার হাতে রাখী বাঁধিয়া দিতে দেখা গেল। দেশবাসী অবাক। কে এই বৃদ্ধ? ইনিই রবীন্দ্রনাথ।" ৬২৯

ভঙ্গিটা খুবই নাটকীয় এবং আধুনিক। এ যুগটাই যে নাটকীয়, তাই এ যুগের বড়রা যেমন জীবনী নাট্য রচনা করছেন, ছোটরাও তেমনি পরীক্ষার খাতায় জীবনী লিখতে তাতে একটুখানি নাটকীয়ত্বের ছোঁয়া লাগিয়ে দিচ্ছে। তাই ঐ রচনায় প্রথমে রবীন্দ্রনাথ "এক" বৃদ্ধ মাত্র। ভঙ্গির সাহায্যে পাঠকমনে কৌতূহল জাগাবার কৌশল এটি। তারপর যখন কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠবে, মনে প্রশ্ন জাগবে, তাই তো কে এই বৃদ্ধ? তখন বলা হবে ইনিই রবীন্দ্রনাথ। পাঠক স্তম্ভিত হবে: তাই তো, এমন কথা তো আগে ভাবিনি। ৬৩০

উক্ত রচনাটির কথা যতই ভাবছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি। মুগ্ধ হবার প্রধান কারণ ছেলেটি তার অজ্ঞাতসারে একটি সত্য প্রকাশ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য উল্টোটাই মনে হবে। সবাই বলবে ১৯০৫ সনের ঘটনাকে কবির মৃত্যুর পরের ঘটনার সঙ্গে একাকার ক'রে তাল-গোল পাকিয়ে ফেলেছে। এমন কি যিনি, বিশেষ কোন্ নেশায় স্থান ও কালের বোধ নষ্ট হয়ে যায় জানেন, তিনি বলবেন এটি সেই নেশারই ক্রিয়া। কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমার মতে ছেলেটি মহাকালের দালাল। সে নিজ বুদ্ধিতে কিছুই করেনি, কালের সত্য তার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র। ৬৩১

সে সত্যটি হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সনে যে স্বদেশপ্রেমে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যে গানের ঐক্য-স্থত্রে সবাইকে বেঁধেছিলেন, তা কখনো বাইরের জিনিস ছিল না, তা সবার রক্তে মিশে গেছে, তা প্রত্যেকটি বাঙালীর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে, গত পঞ্চাশ বছর ধ'রে তা একটা জাতির মর্মমূলে বাসা বেঁধেছে, তার নূতন জীবন-দর্শন রচনা করেছে। অস্বাভাবিক কিছুই নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ যে রাখী একদিন সবার হাতে বেঁধেছিলেন সেটি ঐক্যসূত্রের বহিঃ-প্রতীক মাত্র। আসলে তা কি, সে কথা তিনি আর একটি গানে প্রকাশ করেছেন : "বাঁধিনু যে রাখী পরানে তোমার সে রাখী খুলো না খুলো না।" ৬৩২

১৯০৫ সনে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সেই স্মরণীয় দিনটির চেহারা কেমন ছিল তা তাঁর জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী (২য় খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেখাচ্ছি—

৩০শে আশ্বিন কলিকাতায় যে রাখীবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইল তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের সহিত মিলিয়া অংশ গ্রহণ করিলেন। প্রাতে 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় পরিচালিত শোভাযাত্রার পুরোভাগে তিনি ছিলেন। গঙ্গাঘাটে তিনি বাংলাদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া 'বাংলার মাটি'র মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। আপামর জনের হস্তে 'রাখীবন্ধন' করিয়াছিলেন।......অতঃপর সেই বিপুল জনতা......পশুপতি বসুর বাটির দিকে চলিল, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে আছেন : সহস্র কণ্ঠে কবির নবরচিত সঙ্গীত গীত হইতেছে—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে···
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে···

ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥

এই গান শেষ হইলে পুনরায় ধরিল—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমনি শক্তিমান
মোদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এতই অভিমান। ৬৩৩

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র চুয়াল্লিশ বছর। তিনি "দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ" নন। এবং উপলক্ষটাও ভারত বিভাগ নয়, বঙ্গ বিভাগ। কিন্তু উক্ত পরীক্ষার্থী ছেলেটি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছে পঞ্চাশ বছরের জাতীয় জীবন পরিব্যাপ্তকারী রূপে। কবি-কলোসাসের দুখানি পা-কে দেখেছে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে দৃঢ়-স্থাপিতরূপে। যে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের ছবি সে দেখেছে, সেই বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথই তার কাছে চিরন্তন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্কীর্ণ স্থান ও কালের মধ্যে-তাঁকে সে দেখতে শেখেনি বলেই সে প্রশ্ন-পত্রের পঁচিশ মার্ক অতিক্রম ক'রে ব্যাপক স্থান ও কালের মার্কে গিয়ে পৌঁছেছে। এ জন্য পরীক্ষায় হয়তো সে ফেল করবে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাব সত্যদ্রষ্টা হবার একটা সম্ভবনা রয়ে গেল। ৬৩৪

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার উক্তিটি আমার ভাল লেগেছে, তাই আমি তাকে সমর্থন করি। কারণ রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে কোনো বিশেষ ব্যক্তি নন। চেহারায় তাঁকে চিরতরুণ বা চিরবৃদ্ধ যাই মনে করি না কেন, তিনি আমাদের কাছে একটি ভাবসত্তা মাত্র। গভীর প্রীতি দিয়ে তিনি আমাদের ঢেকে রেখেছেন, তাই তাঁকে সম্পূর্ণ ক'রে দেখতে পাই না। তাই তিনি সমুদ্রের সঙ্গে তুলিত হন। আমরা সবাই এই সমুদ্রে ডুব দিয়ে নিজ নিজ পছন্দমতো রত্ন আহরণ করি। তাঁকে কোনো একটি বিশেষ সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করতে পারি না, এমনি বিচিত্র তিনি। ৬৩৫

সব মিলিয়ে একটি মনকে তবু যেন কিছু স্পর্শ করা যায়; অত্যন্ত আপনার মনে হয়; অন্তরঙ্গ মনে হয়; যেন কিছু বোঝা যায়, কিছু চেনা যায়; শুধু এক বাঁধনে বহুক্ষণ বেঁধে রাখা যায় না। সেই ব্যক্তি-মানসের কল্যাণময় স্পর্শে মন প্রসন্ন হয়, শুচি হয়, মনে প্রেরণা জাগে। একটু দূর থেকে যে মেঘ স্পষ্ট দেখা যায়, সেই মেঘের ভিতরে প্রবেশ করলে তাকে আর স্পষ্ট দেখা যায় না, ধরা যায় না, তেমনি। ইংরেজ কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায়—

Others abide our question
—Thou art free!
We ask and ask
—Thou smilest and art still. ৬৩৬

কবি আমাদের মনে প্রবেশ করেছেন মনের পথে। অন্তরকে আর এক অন্তর যখন জড়িয়ে ধরে, তখন কি পেয়েছি কি পাইনি তার হিসাব করা বড়ই কঠিন। এ ক্রিয়া অদৃশ্য। তা ঊর্ধ্ব চেতনায় বা অবচেতনায় পাক খেয়ে ফেরে। কখনো বোঝা যায়, কখনো যায় না। তবু বোঝা না বোঝার উপরে একটা উপলব্ধি হয় এই যে, সেই অদৃশ্য শক্তি আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এর বেশি কিছু উপলব্ধি করা যায় না। চেষ্টা করা হয় অবশ্যই। সে চেষ্টার চেহারা অনেকটা এই রকম—"রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা কে? সংক্ষেপে লেখ।" "রবীন্দ্রনাথের বর্ষ-শেষের সঙ্গে শেলীর ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ডের তুলনা কর।" "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ কবিতাটির রূপক ব্যাখ্যা কর।" "নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোবে —ব্যাখ্যা কর।"—ইত্যাদি। ৬৩৭

গোড়ার কথায় ফেরা যাক। ১৯০৫ সনে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর হাতে যে রাখী বেঁধেছিলেন সেই রাখীকে ১৯৪৭ সনের ভারত বিভাগের সময় পর্যন্ত প্রলম্বিত করায় কিছু ভুল হয়নি। যে প্রলম্বিত করেছে সে আর সবারই মতো রবীন্দ্রনাথকেই অর্ধশতাব্দী কালের উপর বিস্তৃত দেখেছে। শুধু তাব প্রকাশ ভঙ্গিটি কিছু বালকোচিত বলেই যেটুকু আপত্তি। ৬৩৮,৮-৫-৫৫

সাহিত্য ও গাঁজা

পশ্চিমবঙ্গে কয়েক বছর ধরে কখনো 'কম খাও', কখনো 'খাদ্য অপচয় বন্ধ কর', কখনো 'অধিক খাদ্য উৎপাদন কর', কখনো 'অধিক গাছ ফলাও' ইত্যাদি নানাবিধ আন্দোলন হয়েছে, বনমহোৎসব হয়েছে দেশব্যাপী। এই সমস্ত আন্দোলনের যোগফলে পশ্চিমবঙ্গ এবারে গাঁজার উদ্বৃত্ত রাজ্যরূপে পরিণত হ'ল। ৬৩৯

এত আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল এই একটিই? বনমহোৎসব তবে কি এই একটিমাত্র উদ্ভিদকে লক্ষ করেই হয়েছিল? একেবারে গঞ্জিকা-বনমহোৎসব? নইলে ১৯৫৪ সনেও যে বাংলাদেশ গাঁজা বিষয়ে ঘাটতি রাজ্য ছিল, মাত্র ২৭৫

মোন ফলন হয়েছিল, সেই বাংলাদেশে এবারে ১২০০ মোন গাঁজা ফলনের আর কি হেতু থাকতে পারে? ৬৪০

কিন্তু যাই হোক, কল্পনা করতে বাধা নেই যে এতে আমাদের কল্যাণ হবে। অবশ্য গাঁজায় যে কল্যাণ হ'তে পারে এ ধারণা আগে আমার ছিল না, সম্প্রতি হয়েছে। শুনেছি রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে কেউ কেউ গঞ্জিকা-সেবীও। গাঁজা কিছুকাল ধ'রেই এদেশের সাহিত্যের মূলে ধোঁয়া দিতে আরম্ভ করেছে। ব্যাপারটি অবশ্য এতদিন একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এখন শুনছি তা গণ্ডি ভেঙে সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে, কারণ সাহিত্যের মূলে গাঁজা না থাকলে তা খুব জনপ্রিয় হয় না। স্পষ্ট গন্ধ থাকলে বিশ পঁচিশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায় বেরোতে না বেরোতে। ৬৪১

"কেমন লাগছে বইখানা?" পাঠককে প্রশ্ন করলে প্রথমত কথাটা তার কানেই যায় না, প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিতে চমকে উঠে বলে, "কেমন বই জিজ্ঞাসা করছেন?—স্রেফ গাঁজা, কিন্তু ছাড়তে পারছি না।" বলতে ইচ্ছা করে "গাঁজা বলেই ছাড়তে পারছ না।" কিন্তু বলে লাভ কি? প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে গাঁজার ধোঁয়া কাব্যের মূলেও লেগেছে। যে কবিতার প্রথম লাইন চোখের নাকে ঢুকলেই মগজকে আচম্বিতে ধাক্কা মেরে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর আর কাব্যের লক্ষ্য বা ভাবের সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য থাকে না, সেই কবিতারই মূলে আছে গাঁজার ধোঁয়া। গঞ্জিকাহীন কাব্য কে আর এখন পড়ে? ৬৪২

১২০০ মোন ফলেছে! জাত নেশাখোরেরা নাকি ৫০০ মোন বেশি খাবে না। বাকী রইল ৭০০ মোন। তার কিছু চালান যাবে বাইরে, বাকী থাকবে অনেক। সেই বাকী অংশ আসবে লেখকদের হাতে। ৬৪৩

পথ চলতে সেদিন গাঁজা ও সাহিত্যের কথা বলছিলাম এক বন্ধুকে। বলছিলাম সাহিত্যের মূলে গাঁজার ধোঁয়া লাগানোর এই হচ্ছে সুযোগ, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। পাশে অপরিচিত এক যুবক যে সেই আলোচনার দিকে কান বেঁকিয়ে আমাদের অনুসরণ করছিল লক্ষ করিনি। সে আমাদের অলক্ষ্যে আমার ঐ কথাটিতে খুব ইণ্টারেস্টেড হয়ে উঠেছিল, পরে বুঝলাম। কারণ সে "মাপ করবেন, আমি একটি কথা বলতে চাই" ব'লে আমাকে প্রশ্ন করল, "মশায়ের

কি গুলি খাওয়া অভ্যাস আছে?" আমি বললাম, "না, কিন্তু এরকম সন্দেহ হ'ল কি ক'রে বলতে পার?" যুবক বলল, "কি ক'রে কল্পনা করলেন সাহিত্যে গাঁজার ধোঁয়া লাগাতে হবে?" আমি বললাম, "ধোঁয়া লাগানো সহজ ব'লে।" ৬৪৪

যুবক এ কথায় গদগদ হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলল, "তাই বলুন! তার মানে পশ্চিমবঙ্গ যে গাঁজার চাষে এগিয়ে গেছে তা আপনি জানেন দেখছি। আমি মশায় এ বিষয়ে ঘোর আশাবাদী। তাই আমি আরও গাঁজা-সাহিত্য চাই, অর্থাৎ আরও গাঁজা চাই।" ৬৪৫

আমি বললাম, (তখনই কথাটা মনে এলো)—"গাঁজা-সাহিত্য যদি হয়, তবে অন্যান্য নারকোটিকই বা বাদ যাবে কেন? ধর, আফিং-সাহিত্য হতে বাধা কি?" যুবক বলল, "আফিং-সাহিত্য সাহিত্যই নয়। বঙ্কিমবাবু কমলাকান্তকে দিয়ে সামান্য চেষ্টা করেছিলেন, বেশিদূর এগোতে পারেননি। তবে ইংরেজদের মধ্যে অন্তত দুজনের নাম জানি, একজন ডি কুইন্সি, অন্যজন কোলরিজ। দুজনেই বাল্যকাল থেকে আফিং খাওয়া অভ্যাস করেছিলেন, এবং দুজনেই লেখকরূপে খ্যাত, একজন গদ্যে, অপরজন কাব্যে। দুজনেই আফিং-সেবীর স্বপ্নে তাঁদের সাহিত্যকে মুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু কে পড়ে তাঁদের লেখা?" ৬৪৬

আমি বললাম, "এদেশে রবীন্দ্রোত্তর লেখকদের মধ্যে আফিং-সেবী তো কেউ কেউ ছিলেন, সম্ভবত এখনো আছেন।" যুবক বলল, "না শুধু আফিং হ'লে তাঁদের লেখা কেউ পড়ত না, ওর সঙ্গে গাঁজাও আছে, আমি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ। আর এইজন্যই তো গাঁজা চাই, এবং সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সে ইচ্ছা আমার পূরণ করেছে। আমি বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। অতএব সব প্রেজুডিস ছেড়ে এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে গাঁজাকে অভ্যর্থনা করা, গাঁজা প্রশস্তি রচনা করা। কারণ একমাত্র গাঁজাতেই মাটির মানুষকে শূন্যে উড়িয়ে নিতে পারে, একমাত্র গাঁজা-সাহিত্যই পাঠককে তুরীয় অবস্থায় আনতে পারে। লিখতে আরম্ভ করেছি প্রশস্তি। কেন লিখব না? দেখবেন নমুনা?" ৬৪৭

যুবক ফস্ ক'রে একখানা ছোট ভাঁজকরা কাগজ পকেট থেকে বা'র ক'রে আমার

হাতে দিতে দিতে বলল, "এটি আরম্ভ মাত্র। কিন্তু এতেই আমার মোটিভটা বুঝতে পারবেন।", আমি পড়তে লাগলাম, পড়ে মুগ্ধ হলাম। যুবক বলল, "রেখে দিন ওখানা, আমার কপি আছে।" বন্ধুকে পড়তে দিলাম। বন্ধু চেঁচিয়ে পড়তে লাগল—

"নহ ব্র্যাণ্ডি নহ হুইস্কি নহ তাড়ি কিংবা ধান্যেশ্বরী,
হে নওগাঁ-বংশের মঞ্জরী।
ওষ্ঠে যবে অগ্নি জ্বলে, জ্বলে জিহ্বা জ্বলে কণ্ঠনালী,
তুমি বিনাআড়ম্বরে কণ্ঠেপথে শুধু ধোঁয়া ঢালি,
অন্বিধাজড়িত হাতে দমে দমে সোজা শিরে ঢুকে
ভক্তেরে টানিয়া লও ব্যোমপথে স্বরগের বুকে
সুশীতল সুখে।
পশ্চিমবঙ্গেতে নব, হে মনোরঞ্জিকা,
তুমি সে গঞ্জিকা॥"

বন্ধু বলল "চমৎকার!" যুবক বলল, "মনে রাখবেন ১২০০ মোন।"—বলেই হঠাৎ বিদায় নিয়ে একটা গলিতে প্রবেশ করল। গলিটি গাঁজার দোকানের জন্য খ্যাত। ৬৪৮, ১৫-৫-৫৫

অভাবে

জামের সঙ্গে জামদানি শাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই বলা বাহুল্য, কিন্তু আমের সঙ্গে যে আমদানি গাড়ির সম্পর্ক আছে তা এবারের গাড়িব অভাবে, আমদানির অভাবে এবং আমের অভাবে অস্থিতে অস্থিতে টের পাচ্ছি আমরা কলকাতা-বাসীরা। ৬৪৯

বাঙালীই বাংলা কম জানে

কুমারী তান-ওয়ান, বিশ্বভারতীর চীনা ছাত্রী ১৯৫৫ সনের বি-এ পরীক্ষায় বাংলায় অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সে শান্তিনিকেতন চীনাভবনের অধ্যাপক তান-উন-সানের কন্যা। এটি সংবাদ হ'ল কেন, দুর্বোধ্য। বাংলা এখন সব চেয়ে কম জানে বাঙালী। এ বিষয়ে বাঙালী ছেলেমেয়ে সবাই প্রায় সমান। ব্যাকরণ জানে না, বানান জানে না, শুদ্ধ বাক্য রচনা জানে না এবং সে জন্য লজ্জিত হয় না। তাই এখন যে-কোনো অবাঙালী বাংলায় পরীক্ষা দিলেই সর্বোচ্চ স্থান পাবে, এ অতি স্বাভাবিক ঘটনা। ৬৫০

“পড়ে থাকি ভাই নিচুতেই ভাই নিচুতে”

আমাদের উত্তর শিয়রে যতগুলো পর্বতচূড়া ছিল একে একে ইউরোপীয়েরা তাদের উপর বিজয় পতাকা পুঁতে চলেছে। তাদের শেষ বিজয় পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম চূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা। উপরে ওঠার বিদ্যা শুধু ওরাই শেখে, আর আমরা শিখি শুধু অধঃপাতে যাবার কৌশল।—ওদের সঙ্গে আমাদের এই বৈষম্য কেন ভাবা দরকার। ৬৫১

অন্ধগণ, অবধান কর

বিলেতের পিটার বার নামক এক ৩৪ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি দু বছর আগে অন্ধ হয়ে যায় এবং অন্ধ অবস্থাতেই বিয়ে করে। গত মে মাসের শেষের দিকে সে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় নিজের হাতের চেটোয় ঘুসি মারতে গিয়ে হঠাৎ চোখে স্ত্রীকে দেখতে পায়। অর্থাৎ তার অন্ধত্ব সম্পূর্ণ ঘুচে যায়।—অথচ কেন যে স্বামীরা স্ত্রীদের সঙ্গে ঝগড়া করতে ভয় পায়! অন্ধগণ, একবার সাহস কর, দেখবে চোখ খুলছে। ৬৫২, ১২-৬-৫৫

স্বামী উদ্ধার

একটি খবর থেকে জানা গেল, অ্যামেরিকায় প্রতি বছর নানা বয়সের প্রায় দশ লক্ষ লোক নিরুদ্দেশ হয়। এরা কিন্তু অপরাধী নয়, অধিকাংশই ভাল মানুষ। কিন্তু তবু এরা বিবাগী হ'তে বাধ্য হয়। এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে (১) অর্থসঙ্কট, (২) শাশুড়ি সঙ্কট, (৩) অল্প বয়স্কদের দুঃসাহসিক কাজে উৎসাহ। খবর থেকে আরও জানা গেল, ত্রিশ বছরের একটি ‘নিরুদ্দিষ্ট সন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান’ ৭৪,৮৩১ জন গৃহত্যাগী স্বামীকে উদ্ধার করেছে। ৬৫৩

ইংরেজ বা ইংরেজ-আত্মীয় মার্কিনদের মধ্যে শাশুড়ি কর্তৃক বধূ নির্যাতন নেই, এটি আমাদের দেশের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলেতে গিয়ে ওদেশের বিলাসিনীদের স্বাধীনতার উচ্ছল রূপ দেখে পরিহাসছলে বলেছিলেন “তাঁদের দোরস্ত করতে হলে দিন-দুই আমাদের দিশি শাশুড়ি ও বিধবা-ননদের হাতে রাখতে হয়।” ৬৫৪

ইংরেজদের দেশে আছে শাশুড়ি কর্তৃক জামাতা নির্যাতন। ইংরেজ যুবক বহুদিনের পায়ে ধরার পর যখন বিয়ের অনুমতি পায় তখন সে দেখতে পায় সে শুধু স্ত্রীই

পায়নি, সঙ্গে একটি শাশুড়িও পেয়েছে। অর্থাৎ 'ডাউরি'টা এসেছে 'শাউড়ি'র বেশে। এটি যে হয় তো জানত কিন্তু ঝোঁকের মাথায় এর গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। তার এই দুর্বলতার খবর শাশুড়ি জানে, অতএব এ সুযোগ সে ছাড়বে কেন? আরও জানে তার মেয়ে দুর্লভ, বহু ভজনার পর জামাই তাকে পেয়েছে, তাই সে জামাইয়ের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে সম্পূর্ণ নিরাপদে। ৬৫৫

আমাদেব দেশে এর উল্টো। হয় কারণ এদেশে মেয়েরা অনেকটা পণ্য-সামগ্রীব মতো। বিয়ের বাজারে অত্যন্ত শস্তা। যে কোনা অভাজন ইচ্ছে হ'লে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে। মেয়ে প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছে—যার ইচ্ছা দেখে যাও। ৬৫৬

কিন্তু সে কথা যাক। ইংরেজদের দেশের কথা হচ্ছিল। সেদেশে অনেক বিবাহিত যুবকের ভাগ্যেই শাশুড়িব লাঞ্ছনা ঘটে। ইংরেজের বাড়িতে আগুন লেগেছে, গৃহকর্তা আছেন অফিসে। ভৃত্য ব্যস্তভাবে টেলিফোন ক'রে মনিবকে জানাচ্ছে —"বাড়িতে আগুন লেগেছে, আপনার শাশুড়ির তেতলার ঘরে ঘুমোচ্ছেন, তাঁকে জাগাব কি?"—এই হচ্ছে শাশুড়ি সম্পর্কে ইংরেজ জামাই ও তাব ভৃত্যের মনোভাব। ৬৫৭

তবে দেখেছি বটে জামাইয়েব মতো জামাইকে। সে একেবারে শাশুড়িপ্রুফ, শকপ্রুফ, ওয়াটারপ্রুফ, অ্যান্টিম্যাগনেটিক জামাই। দেখেছিলাম সিনেমা ছবিতে। শাশুড়ি অকথ্যভাষায় জামাইকে অপমান করে। মেয়ে দুঃখ পায়, কাঁদে, কিন্তু মায়ের হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা করতে পারে না। জামাইয়ের কিন্তু নির্যাতন সহ্য হয়ে গেছে, সে গ্রাহ্যও করে না। যত অপমান ও গ্লানি বেচারা স্ত্রীকেই সহ্য করতে হয়। জামাই নিচেরতলার ঘরে তার অফিসের কাজ ক'রে যায়। একদিন শাশুড়ির অপমান চরমে উঠল। মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো উপর থেকে। তার স্বামী আদর ক'রে তাকে চেয়ারের হাতলে বসাল এবং তার মাথাটি বাঁ ধারে বুকের উপর টেনে তাতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডান হাতে অফিসের কাজ ক'রে যেতে লাগল। স্ত্রীর দুচোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। স্বামীর আদরে অভিভূত স্ত্রী অবিরাম কেঁদে চলেছে। ইতিমধ্যে স্বামীর অনেকগুলো খামে ঠিকানা লেখা হ'য়ে গেল। তারপর দেখা গেল সে একখানা ক'রে ডাক টিকিট নিচ্ছে আর তা বৌয়ের চোখের জলে ভিজিয়ে খামে আঁটছে। ৬৫৮

কিন্তু সংসারে এমন মনোবল ক'জন স্বামীর আছে? ইংরেজ বা ইংরেজ-আত্মীয় মার্কিন যুবক তার দুর্বলতম মুহূর্তে বিয়ে করবার পর যখন ভুল বুঝতে পারে, যখন দেখে আর সহ্য করা যায় না, প্রাণ যায়, তখনই সে নিরুদ্দেশ হয়। দুর্গম মেরুদেশে, দুরধিগম্য অরণ্যদেশে বা দুরারোহ পর্বতে যত যুবককে অভিযান চালাতে দেখা যায়, আমার বিশ্বাস, তারা সবাই পলাতক স্বামী। হাজার হাজার স্বামী বছরের পর বছর শুধু গৃহত্যাগের আনন্দে ছুটে চলেছে পথে। লক্ষ্যহীনভাবে কেবলই চলেছে। পা টলছে, মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার নেমে আসছে তবু চলছে। কত স্বামী পথের পাশে লুটিয়ে পড়ছে তার হিসেব কে রাখে। ৬৫৯

ম্যাথিউ আরনল্ডের 'স্কলার জিপসি' ব্যক্তিটি কে ভেবেছেন কেউ? অক্সফোর্ডের পণ্ডিত, ভবঘুরেদের দলে ভিড়ল কেন? কেউ আর তাকে ধরতে পারল না কেন? ভেবে দেখেছেন? আমার বিশ্বাস গবেষণা করলে দেখা যাবে তারও গোড়ায় ইতিহাস ঐ একই। গোড়ায় শাশুড়ি কিংবা স্ত্রী। ৬৬০, ১৯-৬-৫৫

সাপের ভুল বোঝা

গতবারে যে শাশুড়ি-জামাইয়ের মধ্যেকার অহিনকুল সম্পর্কের কথা বলেছিলাম, সেটি আমাদের দেশের শাশুড়ি-জামাই সম্পর্কে নয়। যতদূর মনে হয় কথাটা স্পষ্ট করেই বলেছিলাম কোথায়ও সন্দেহের অবকাশ না রেখে। তাই ভাবতেই পারিনি কেউ কেউ আমার কথা ভুল বুঝে তা উল্টো অর্থে নেবেন। অথচ দেখছি বিপরীত ফল ফলেছে। একটি খবর পড়ে তাই স্তম্ভিত হয়েছি। দুটি সাপ যে অন্তত আমার কথা ঠিক মতো বুঝতে পারেননি তা ঐ খবর থেকে জানা গেল। ৬৬১

খবরটি এই: ঝড়ের ফলে হেমতাবাদ থানায় দেহচি গ্রামের এক স্ত্রীলোক ঘর চাপা পড়লে, তার জামাই তাকে উদ্ধার করতে যায়, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করতে না করতে দুটি সাপ উক্ত জামাইয়ের পা জড়িয়ে ধরেন। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর জামাই ছাড়া পায় বটে, কিন্তু সাপ দুটি তাকে ছোবল মেরে যান। কিন্তু কেন? আমার লেখায় কি এ রকম ইঙ্গিত ছিল? আমি সাপ দুটিকে অনুরোধ করি ভবিষ্যতে তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পড়েন। ৬৬২

পূর্বাভাস

গ্ল্যাসগোর এক ২৪ বছরের যুবক—নাম হথর্ন স্টুয়ার্ট—বিয়ের সময় গীর্জার

বেদীর কাছে একবার এবং বিয়ের পর ঘরে ফিরে তিনবার মূর্ছিত হয়েছে। সে বলে, জীবনে প্রথম এই বিয়ের ব্যাপারেই তার সবচেয়ে বেশি স্নায়বিক দুর্বলতা ঘটেছে। উক্ত যুবককে অভিনন্দন জানাই এই পূর্বজ্ঞানের জন্য। দেখছি কারো কারো বোধশক্তি বেশ তীব্র থাকে, এবং তাতে আগেই ভবিষ্যতের ছায়াপাত হয়। ৬৬৩

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জ্ঞানী যুবকের কাহিনী স্মরণীয়। তৃতীয়বার যখন পুরোহিত বিয়ে দিতে অস্বীকার ক'রে পাত্রীকে বললেন—বারবার মাতাল অবস্থায় পাত্রকে গীর্জায় আনছ কেন, ঐ অবস্থায় আমি বিয়ে দিতে পারি না, তখন পাত্রী করুণভাবে বলেছিল মাতাল না হলে ওকে যে রাজী করাতেই পারি না ৬৬৪

অসৎ কাজে হাতী

একটা হাতী কত অশ্বশক্তিসম্পন্ন তা আমি জানি না। দেখে মনে হয় কম ক'রেও ২০ অশ্বশক্তি। তাই উত্তরপ্রদেশে যে হাজারখানেক বন্য হাতী মানুষের বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বিরুদ্ধে লেগে সর্বত্র তছনছ ক'রে বেড়াচ্ছে। তাদের সমগ্র হস্তীশক্তিকে সৎ কাজে লাগালে অনুমান করা যায় তা থেকে প্রায় ২০,০০০ অশ্বশক্তি পাওয়া যাবে। সম্ভবতঃ সে জন্যই হাতীকে দিয়ে লাঙল চালানো যায় কি না তা পরীক্ষা ক'রে দেখা হবে। হাতীর পক্ষে লাঙল টানা অবশ্য একটু দৃষ্টিকটু হবে এবং তার সম্মানেও একটু আঘাত লাগবে। কিন্তু হাতী যদি নিজের সাম্প্রতিক চরিত্র স্মরণ ক'রে দেখে, তা হ'লে তার চাষের কাজে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়। ৬৬৫

আরও গভীর

ভারত ও সিংহলের মধ্যবর্তী সমুদ্রকে আরও গভীর করা যায় কিনা তা পরিবহন বিভাগ প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে দেখেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা পাবার পর ভারত ও সিংহল মধ্যস্থ সমুদ্র কি আপনা থেকেই আরও গভীর হয়নি? ৬৬৬

ফুটবল মাঠের আইন

ফুটবল মাঠে দর্শকদের হাঙ্গামা নিয়ে কথা উঠেছে। কিন্তু আমার মতে কথা ওঠা অন্যায়। কারণ খেলা একটি আমোদ এবং এই আমোদের সঙ্গে হাঙ্গামারূপ দ্বিতীয় আর একটি আমোদ একই খরচে উপভোগ করা যায়। অতএব এতে

উৎসাহ দেওয়াই উচিত। আসলে দর্শক ও খেলোয়াড়ের মধ্যকার ভেদ ঘুচে যাবার ব্যাপার। দর্শক ও স্টেজ প্লেয়ারের মধ্যকার ভেদ দুটি নাটকে (শেষরক্ষা ও রীতিমত নাটকে) সাময়িকভাবে ঘুচে যেতে দেখেছি আমরা শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্যে। স্টেজে যাকে অভিনবত্বের সম্মান দেওয়া হয়েছে খেলার মাঠে তাকে হাঙ্গামা বলা হবে কেন? স্টেজের ঐ অভিনবত্বেরই এটি মাঠ্যরূপ একে শাঠ্য মনে করা অন্যায়। ৬৬৭,২৬-৬-৫৫

শিশু-সমালোচক

একটা বইয়ের দোকান থেকে ছেলের মা তাঁর ছেলের জন্য একখানা বই কিনে নিয়ে যান, কিন্তু পরদিন উক্ত ছেলে বইখানা ফেরত দিতে এলো, বলল : মা এই বইখানা এই দোকান থেকে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখানা ছোটদের উপযোগী নয়। পুস্তকবিক্রেতা জিজ্ঞাসা করল : তোমার মা কি বইখানা পড়ে দেখেছেন? ছেলেটি তার উত্তরে বলল : মা পড়েনি, আমি সবটা পড়ে দেখেছি, চলবে না, অশ্লীল। ৬৬৮

ছোটদের আমরা যতটা বোকা মনে করি তারা ততটা বোকা নয়। কথা উঠেছে ছোটদের সাহিত্য থেকে horror comics বাদ দিতে হবে। বিভীষিকাপূর্ণ খুনোখুনি ও নিষ্ঠুর পীড়নের গল্প প'ড়ে প'ড়ে তাদের মনেও অপরাধ প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, অতএব এ ধরনের কাহিনী তাদের আর পড়তে দেওয়া উচিত নয়। ৬৬৯

কথাটা অত্যন্ত সত্য। কিন্তু যে বই বা সিনেমা থেকে ছেলেরা অপরাধমূলক কাজে প্রেরণা পায় শুধু সেই বই বা সিনেমা বাদ দিলেই কর্তব্য শেষ হবে কি? আমার এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ সমস্ত দুনিয়াব্যাপী এমন এক horror comics সাহিত্যের প্রচার হচ্ছে তা থেকে ছোট ছেলেদের মুক্ত থাকা অসম্ভব। ৬৭০

এই হরার কমিকস্-এর অন্য নাম হচ্ছে কোল্ড ওয়র বা ঠাণ্ডা লড়াই। এক দেশ অন্য দেশের উপর কি রকম হিংস্র আক্রমণ করতে পারে, কোন্ অস্ত্র নিক্ষেপ করলে একেবারে লক্ষ লক্ষ লোক পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কোন্ অস্ত্রে মারাত্মক ব্যাধির জীবাণু ছড়াবে, কোন্ অস্ত্রে বংশ বংশ ধরে বিকলাঙ্গ বীভৎস চেহারার মানুষ জন্মাতে থাকবে এ সব কথা যতদূর সম্ভব ভয়াবহ ভাষায় ছোট বড় সবার মধ্যেই প্রতিদিন প্রচার করা হচ্ছে। আর যদি ভয়াবহ নাই বলা যায়, কমিক

ভাষায় তো বটেই। এই প্রচার-সাহিত্য থেকে ছোটদের রক্ষা করবে কে?—এই 'কমিক' সাহিত্য থেকে? ৬৭১

সাহিত্যে ছোট বড় ভেদ অতি সামান্যই আছে। তাই হরার কমিকস থেকে বেছে বেটে ছোটদের বঞ্চিত করতে গেলে সে চেষ্টা সফল হবে না। মোটের উপর দেখা যায় খুনোখুনির গল্প প'ড়ে এদেশে ছেলেরা অন্তত অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠেনি। এ দেশে এবং সম্ভবত অন্যান্য দেশেও ছেলেদের (যেমন বড়দের) নৈতিক অধঃপতনের হেতু হচ্ছে সর্বগ্রাসী যুদ্ধ গরম অথবা ঠাণ্ডা। যুদ্ধই মানুষের মন থেকে নীতিবোধ নষ্ট ক'রে দেয়। ৬৭২

উদীয়মান গুণ্ডা

কলকাতা শহরে গুণ্ডাদের ধরা হচ্ছে হাজার হাজার। তাদের মধ্যে ছোট ছেলেরাও আছে অনেক। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে উঠতি গুণ্ডা বা উদীয়মান গুণ্ডা। বাংলা দেশের মতো নিরীহ দেশেও এমন ব্যাপক গুণ্ডামির মূল কারণ গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধই (অর্থাৎ এর পটভূমিতে যে দুষ্ট রাজনীতি আছে সেই রাজনীতিই) সমস্ত মানুষকে, মানুষের পরিবারকে, মানুষের সমস্ত স্থায়ী বিশ্বাসকে উন্মূলিত করেছে। সাহিত্য যে এই বিপর্যয়ের হেতু নয় আশা করি এ সকলেই স্বীকার করবেন এবং আরও স্বীকার করবেন যে, হরার কমিক সাহিত্য নয়। ৬৭৩

কতিপয় ভূত

আমার এতখানি ভূমিকার উদ্দেশ্য, আমি নিজেই দু একটা ভৌতিক কাহিনীরূপ হরার কমিক অবতারণা করছি। নিজের মন থেকে নয়, কেন না সবাই নিজের নিজের মনের ভূতকে বাড়িয়ে দেখে। আমি যে ভূতের কথা বলছি তা খবরের কাগজে বেরিয়েছে। সুতরাং আশা করি হরার কমিক প্রচার করছি এমন অপবাদ আমাকে কেউ দেবে না। ৬৭৪

একটি বিলিতি ভূত। প্লিমাথের এক নাবিকের স্ত্রী তিনটি সন্তানসমেত উক্ত বন্দরে এক ফ্ল্যাটে এসে বাসা নেয়। এক রাত্রে নাবিক কাজে বেরিয়ে গেছে, স্ত্রী ও সন্তানেরা তার ফ্ল্যাটে আছে, এমন সময় উক্ত স্ত্রী তার পিঠে কারো হাতের স্পর্শ পায়। তার স্কার্টেও টান পড়ে। ভয়ে সে তার এক বন্ধুকে ডেকে

আনে কিন্তু তার পিঠেও সেই একই হাতের হিমশীতল স্পর্শ। কয়েকদিন ধ'রে চলতে থাকে এই কাণ্ড। তখন এক রেভারেণ্ড এসে ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা করেন। ৬৭৫

দ্বিতীয় ভূতটি ভারতীয়—কানপুরবাসী। বিলিতি ভূতের প্রচারক রয়টার, ভারতীয় ভূতের ইউনাটেড প্রেস। প্রকাশ, কানপুরের আর্মাপুর এস্টেটের অধিবাসীরা ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছে। কারণ গত ১৭ই জুন রাত্রে রামসরম নামে এক ঝাড়ুদার অর্মাপুর হাসপাতালে আত্মহত্যা করেছে, এরই প্রেতাত্মা দেখা যাচ্ছে সেই হাসপাতালে। ১৮ই জুন ভূত রামসরম হাসপাতালের নার্সকে কাজ দিতে বলে। ১৯শে জুন সে পুনরায় কাজে আসে। দারোয়ান জিজ্ঞাসা করলে ভূত বলে যে, তার মৃত্যু হয়নি। ৬৭৬

বিলিতি ভূতটি প্রেমিক এবং ভারতীয় ভূতটি বেকার। প্লিমাথের প্রেমিক ভূত চক্ষুলজ্জাবশত গা ঢাকা দিয়েছে, কিন্তু ভারতীয় ভূতের লজ্জা নেই, সে মরীয়া। ভূত অবস্থাতেও সে বেকার, তাই তাকে মৃত্যু ভাঁড়াতে হচ্ছে। কাজ না করলে তার খাওয়া জুটবে না। বেকারত্বের সমস্যা ভারতীয় ভূতদের মধ্যে এত বেশি তা আমার জানা ছিল না। আমি জানতাম আমরাই ভূতের কাজ করি, ভূত আমাদের প্রভু, প্রভুর বোঝা বয়ে দিন কাটে আমাদের। ডি এল রায় স্মরণ করিয়েও দিয়েছিলেন কথাটা—"কেন ভূতের বোঝা বহিস মিছে।" ৬৭৭

কানপুরের রামসরমেরও কিছু দোষ আছে, অন্তত তার বাপমায়ের। রাম নামে যার সরম সে তো ভূত হবেই। এমন নাম কেউ জেনেশুনে রাখে? রামশরণ রাখলে কি ক্ষতি হ'ত? ৬৭৮,৩-৭-৫৫

জবাবহীন প্রশ্ন

দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে চার লক্ষ ত্রিশ হাজার মুসলিম্ পূর্ব পাকিস্থানে চলে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে দুই লক্ষ পাঁচ হাজার জন ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছেন। এঁদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পুনর্বসতির সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। যাঁরা ফিরে এসেছেন তাঁদের মনে নিশ্চয় এ প্রশ্ন জেগেছিল—পাকিস্থান আদৌ হ'ল কাদের জন্য? কিন্তু তার উত্তর তাঁরা পাননি। পাবেনও না। কেননা উত্তরের মালিকেরা সর্বদা পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে আছেন—তাঁদের দৃষ্টিসীমা ওদিকে আপাতত তুর্কি পর্যন্ত বিস্তৃত। ৬৭৯

পাগল বানাবার অস্ত্র

জীবাণু যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইউ-এস আর্মি কেমিক্যাল অফিসার প্রসঙ্গত বলেছেন রাসায়নিক বা জৈবিক কোনো অস্ত্রে মানুষকে পাগল বানানো যায় এমন কথা তিনি মনে করেন না। ব্যাপকভাবে মনুষ্যজাতির মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাবার মতো অস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। ৬৮০

কিন্তু সেই সঙ্গে এই খবরটিও বেরিয়েছে যে, পৃথিবীতে পাগলের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এ কথা যদি সত্য হয় তা হ'লে আব অতিরিক্ত পাগল স্বষ্টির জন্য রাসায়নিক বা জৈবিক অস্ত্র বা'র ক'বে লাভ কি? পৃথিবীতে যে পাগলের সংখ্যা বাড়ছে এ কথা সম্প্রতি প্রচার করেছেন ফরাসী দেশের মানসিক স্বাস্থ্যবক্ষা সঙ্ঘ। তাঁদের রিপোর্ট থেকে জানা যায় প্রতি ২০০ অ্যামেরিকানের মধ্যে ১ জন, প্রতি ৩০০ ফরাসীর মধ্যে ১ জন এবং প্রতি ১০০০ ইজিপশিয়ানের মধ্যে ১ জন উন্মাদ। —কিন্তু পাগল বৃদ্ধি আজকের কথা নয়। ১৯৩০ সনে বিলেত থেকে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতেও বলা হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেনে প্রতি বছব ২০০০ হিসাবে পাগল বাড়ছে। ৬৮১

কথা হচ্ছে—যে হিসাবেই হোক, তাকে অভ্রান্ত মনে করা উচিত কি না। কারণ পাগলের সংখ্যা যদি স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে তুলনা ক'রে স্থিব করা হয়, তা হ'লে সব হিসাবই ধাপ্পা; কেন না পৃথিবীতে স্বাভাবিক মানুষ একটিও নেই। প্রত্যেকেই এক বা একাধিক বিষয়ে পাগল। স্বাভাবিক মানুষ বা আদর্শ মানুষ সমস্ত মানুষের অ্যাবস্ট্র্যাকশন দিয়ে গড়া, অর্থাৎ মনগড়া। আদর্শ স্বাস্থ্যের মানুষও সংসারে নেই; নেই কেন তা খুঁজতে হবে ঐ "আদর্শ" কথাটির মধ্যে। যা আমাদের লক্ষ্য, যা হলে ভাল হয় অথচ যা হয়নি এবং হয় না, তাকেই আদর্শ বলে জানি। এই লক্ষ্যে পৌছলেই কিন্তু সর্বনাশ। আদর্শে পৌছলেই সব মাটি। আদর্শে পৌছনো যায় না ব'লেই আদর্শ সুন্দর, দূরে থাকে ব'লেই ভাল। আদর্শ-দেহ দ্বারা গ্রীক ভাস্কর আর্ট স্বষ্টি করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা অবাস্তব বলেই টিকল না। কারণ চেহারায় বা স্বভাবে কিছু ত্রুটি না থাকলে মানুষের প্রীতি-ভালবাসাও আকর্ষণ করা যায় না। অর্থাৎ প্রিয় মানুষ হ'তে হ'লে চেহারায় এবং চরিত্রে কিছু ত্রুটি থাকা চাই। ৬৮২

কিন্তু প্রশ্ন এই: ত্রুটি কতদূর পর্যন্ত টানা যেতে পারে? মানসিক ত্রুটি কতদূর

গেলে কোনো মানুষকে মহোন্মাদ বলা যাবে অথবা মহামহোন্মাদ? তা অবশ্য উপোন্মাদেরাই এক রকম ঠিক ক'রে নিয়েছে—অর্থাৎ আমরা, যারা দাগী উন্মাদ নই। যদিও অপর কাউকে উন্মাদরূপে চিহ্নিত করার অধিকার আমাদের আছে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন ৬৮৩

বলেছি মহোন্মাদ বা দাগী পাগল ভিন্ন বাদবাকী সমস্ত লোক উপোন্মাদ। অর্থাৎ পাগলে পাগলে শুধু ডিগ্রীর তফাত। মানুষের দেহও পাগল, ঠিক মনের মতোই। দৈহিক পাগলামিকে ইংরেজিতে অ্যালার্জি বলা হয়। কারো দেহ চিংড়ি মাছ খেলে পাগল হয়, কারো দেহ ফুল শুঁকলে পাগল হয়, কারো দেহ নাকে ধুলা ঢুকলে পাগল হয়। এর সঙ্গে মনের কোনো সম্পর্ক নেই। ৬৮৪

মনের পাগলামিকেও মনের অ্যালার্জি বলা চলে বোধ হয়। এই মানসিক অ্যালার্জি সকল মানুষের আছে। সেই জন্য, যে-পাগল বলেছিল "দুনিয়ার সব শালা পাগল, আমি শুধু ক্ষেপে ঠকেছি", সে বৈজ্ঞানিক সত্য বলেছিল। এটি বানানো কথা নয়, কলকাতার পথেরই এক পাগলের উক্তি। ৬৮৫

অতএব পৃথিবীতে পাগল বাড়ছে বললে কি বোঝায় বলা শক্ত। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়ছে, হয়তো সেজন্য নিতান্তই স্বাভাবিক কারণে পাগলও বাড়ছে। কিন্তু এটি তো তা হ'লে নতুন কথা কিছু নয়। আমার মনে হয় পৃথিবীতে এখন যে যুগটা চলছে সেটি আত্মবিশ্লেষণের যুগ। প্রেরণাটা প্রধানত ফ্রয়েডের কাছ থেকে এসেছে। সব দেশেই এখন আত্মজীবনী অথবা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখা হচ্ছে ঝুড়ি ঝুড়ি। দৃষ্টিভঙ্গি সবারই বৈজ্ঞানিক। তাই পাগল আবিষ্কার হচ্ছে বেশি। পাগল আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে, এতদিন শুধু দেখার চোখ ছিল না। ৬৮৬,১০-৭-৫৫

বিপরীত অথচ সত্য

গত ১১ই জুলাই তারিখের যুগান্তরে রয়টার প্রেরিত এই খবরটি বেরিয়েছে :

মঙ্গলগ্রহের গাছপালার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন

মস্কো, ১০ই জুলাই—রুশিয়ার তাস সংবাদ সংস্থা আজ খবর দিয়াছে যে, মঙ্গলগ্রহে যে পৃথিবীর অনুরূপ গাছপালার অস্তিত্ব রহিয়াছে রুশ-বিজ্ঞানীরা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।—রয়টার। ৬৮৭

ঐ একই তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় রয়টার প্রেরিত এই খবরই বেরিয়েছে :

মঙ্গলগ্রহে গাছপালা নাই—সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত।

মস্কো, ১০ই জুলাই—সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তাসের একটি খবরে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, পৃথিবীর আকৃতি সদৃশ মঙ্গলগ্রহে কোন গাছপালা নাই। —রয়টার। ৬৮৮

রয়টারের খবর—অতএব দুটোই সম্ভবতঃ সত্য, কিন্তু আমি যুগান্তর দলের সমর্থক, তাই আমার বিশ্বাস যুগান্তরের রয়টার বেশি নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীর অনুরূপ উদ্ভিদের অস্তিত্ব বিদ্যমান এই আবিষ্কার বিশ্বাস করা চলতে পারে। ৬৮৯

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল

কলকাতার কোনো এক পল্লীর এক দশ বছরের ছেলে নিরুদ্দেশ হয় এবং দুদিন পরে ফিরে এসে অভিভাবকদের কাছে তার অন্তর্ধানের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনায়। সে বলে শিয়ালদহের কাছে অবস্থিত এক সার্কাস পার্টির লোকেরা তাকে হরণ করেছিল, তারা তাকে বেলুড়ে নিয়ে আটকিয়ে রাখে, কিন্তু সে কোনোমতে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। পুলিস কিন্তু তদন্ত ক'রে জানতে পেরেছে যে, ছেলেটি তার অপহরণের কাহিনীটি সম্পূর্ণ বানিয়ে বলেছে, কেউ তাকে অপহরণ করেনি, সে নিজে স্বাধীনভাবেই ঘুরে বেড়িয়েছে। ৬৯০

এই ছেলেটি ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত কথাশিল্পী হবে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এই রকম গল্প রচনায় তাকে এখন থেকেই উৎসাহ দেওয়া উচিত। সামান্য বস্তু-অংশকে আশ্রয় ক'রে যে ছেলে দশ বছর বয়সে এমন একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করতে পারে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তার ভবিষ্যৎ সত্যই উজ্জ্বল। ৬৯১

স্বামীর একচেটে অধিকার

কায়রোর ধর্ম-আদালতের এক নির্দেশে বলা হয়েছে স্বামীর ফিরতে বেশি রাত হলেও স্ত্রী তাকে প্রহার করতে পারবে না। বিচারকের মতে মারবার অধিকার স্বামীর আছে স্ত্রীর নেই। শোনা যাচ্ছে নিখিলবিশ্বস্বামী আত্মরক্ষা-সমিতি থেকে উক্ত ধর্ম-আদালতকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। ৬৯২

শাদিওয়াল ও শাদি

গত ৮ই জুলাই লাহোরের শাদিওয়াল শহরে ১০০ বছরের এক মহিলার সঙ্গে ৯০ বছরের এক ভদ্রলোকের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। নাতিনাতনি ও নাত-জামাইয়েরা বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন—সমগ্র শহর এই বিবাহ উপলক্ষে আনন্দ করেছে। বর-বধূর পরিচয়ঃ বধূ গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ বিধবা, এবং বর ইতিপূর্বে চারবার বিয়ে করেছেন।—আনুমানিক ব্যাখ্যাঃ পঞ্চাশ বছর আগে বিধবা হবার পর উক্ত মহিলা তাঁর ৯০ বছরের বর্তমান স্বামীকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। ভদ্রলোক বিধবাকে বিয়ে করবেন কি না ভাবতে থাকেন কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না। ইতিমধ্যে তিনি কোনো রকম চিন্তা না ক'রে একটির পর একটি বিয়ে করতে থাকেন। তারপর যখন হিসেব নিতে গিয়ে দেখেন চারটি স্ত্রীর একটিও বেঁচে নেই এবং ইতিমধ্যে ৫০ বছর কেটে গেছে তখনই তাঁর মনে হ'ল আর দেরি করা ঠিক নয়। তিনি ৫০ বছর আগের প্রস্তাবের উত্তরে বললেন, হ্যাঁ রাজি। শহরের সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এবং হৈ-হৈ ক'রে সবাই বিয়ের আসরে এসে উপস্থিত হ'ল। ৬৯৩

শহরের নাম শাদিওয়াল। নাম সার্থক হ'ল ৯০ বছর বয়স্ক ঐ শাদিওয়ালার জন্য। শাদিওয়ালীর কৃতিত্বও অবশ্য কম নয়। ৬৯৪, ১৭-১০-৫৫

ভূত নিয়ে গবেষণা

একটি নতুন খবর এসেছে ক্যামব্রিজ থেকে। ১৭ই জুলাইয়ের খবর—সেখানে সমস্ত পৃথিবীর সর্বাধুনিক ভূত সম্পর্কে নানা রকম গবেষণা চালাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দুই জাতীয় ভূতই গবেষণার বিষয় হবে—নিরীহ ভূত ও উপদ্রবকারী ভূত। সব দেশের ভূতের গল্প নিয়ে পরীক্ষা করা হবে, সে সব গল্পের মূলে কতখানি সত্য আছে দেখা হবে। পূর্ব সপ্তাহে ২৯ জন মার্কিন ও ইংরেজ অধ্যাপক ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েৎ হয়ে বিশেষ বিশেষ স্থানের বাসিন্দা-ভূত, উপদ্রবকারী ভূত, টেলিপ্যাথি বা হৃদ্ভাষ সম্পর্কিত স্বপ্ন, এবং ছায়ামূর্তি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বৈঠক শেষ হয়েছে ১৬ই জুলাই। (হ্যামারশিল্ড এঁদের শুভকামনা জানিয়েছেন, স্টেটস্‌ম্যানের হেডলাইন।) ৬৯৫

বহু যুগ আগে প্রাচ্যদেশের জ্ঞানীরা ভূত নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। আলকেমিস্টরা তিনটি মৌলিক ভূত ও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পাঁচটি মৌলিক ভূত (পঞ্চভূত)

আবিষ্কার করেন। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র (রবার্ট বয়েল থেকে যার শুরু বলা যেতে পারে) মতে মৌলিক ভূতসংখ্যা ১০০টি ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রাচীন মৌলিক ভূত অধিকাংশই বাতিল। কিন্তু ক্যামব্রিজে যে বৈঠক বসেছে তার সঙ্গে অজৈব রসায়নের কোনো সম্পর্ক নেই, বরঞ্চ ওটিকে জৈব রাসায়নিক ভূতের ব্যাপার বলা চলে, কারণ এরা সবাই জীবের মৃত্যুর পর ভূত, অর্থাৎ জীব থেকে জাত ভূত। অর্গ্যানিক গোস্টস্ বলা চলে বোধ হয়। ৬৯৬

কিন্তু এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সম্প্রতি ভূত সম্পর্কে গবেষণার জন্য জরুরি বৈঠক আহ্বান করলেন কেন? গত ১৯৫৩ সনে হল্যাণ্ডের উট্রেক্ট শহরে ভূত গবেষণার প্রথম বৈঠক বসে—ক্যামব্রিজের বৈঠক তারই জের। ৬৯৭

দুটি কারণ অনুমান করি। প্রথমতঃ ভূত সম্পর্কে নতুন গবেষণা শুরু হ'লে এ বিষয়ে অনেক তথ্য প্রকাশিত হবে এবং প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন আর একটি ক'রে বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা হতে পারবে। ডিপ্লোমা পাওয়া যাবে—বি-এ (ভূত) এম-এ (ভূত), ইংরেজীতে B. A. (Ghosts) M. A. (Ghosts) (বি-এসসি, এম-এসসিও হতে পারে)। 'এ'-গ্রুপ 'বি'-গ্রুপ পৃথক ভাগ থাকবে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পাঠ্যে। এতে ভূতের সুবিধা হোক না হোক, অনেক অধ্যাপক গ্রন্থকার ও প্রকাশকের আধিভৌতিক দুঃখকষ্টের কিছু লাঘব হবে, অন্তত আধা-ভৌতিক সুবিধা তো কিছু হবেই। ৬৯৮

দ্বিতীয় কারণ আরও বাস্তব। গত মহাযুদ্ধে ভূতদের প্রাচীন আশ্রয়গুলির প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে অথচ এরা পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ি ভিন্ন অন্য কোথায়ও থাকা পছন্দ করে না। তার ফলে অল্প সংখ্যক বাড়িতে এখন গাদা গাদা ভূত বাস করছে এবং কলকাতার একটা বড় অংশ আজও প্রাচীন এবং জীর্ণ ব'লে দেশ-বিদেশের বন্দে্দি ভূত সব এখন কলকাতায় চ'লে আসছে। অসংখ্য ভূত তোআশ্রয়হীনভাবে পথে পথেই দিন কাটায়। ৬৯৯

ভৌতিকতাবোধ

এই উদ্বাস্তু ভূতদের পুনর্বাসন দরকার। সম্ভবত এই কারণেই ভূতদের আদমসুমারী, শ্রেণী-বিভাগ, বর্ণ-বিভাগ, প্রবৃত্তি-বিভাগ, কারা মেজরিটি, কারা মাইনরিটি প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে সকল যুগেই মানবতাবোধ-

ইটের গুঁড়ো খেলে সব রকম অসুখ সারে। শোনা যায় কয়েক দিনের মধ্যে সেই জীর্ণ সাঁকোটি পরিষ্কার হয়ে যায়। বিনা পয়সায় রাবিশ সরাবার মতলবে যদি কেউ মিথ্যা ক'রেও ঐ রকম রটনা ক'রে থাকে, তবু তাকে প্রশংসা করা উচিত। কারণ মনের বিশ্বাসেই অধিকাংশ অসুখ সেরে যায়। যারা ঐ ইটের গুঁড়ো খেয়েছে তাদেরও অসুখ সেরেছে, উপরন্তু জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কলকাতা কর্পোরেশন বা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারেন। (এই প্রসঙ্গে ১৬, ১৭ ও ১৮নং প্যারা দেখুন।) ১৪৮

খবরের কাগজে রান্না

ট্রামে চলতে পিছনের মহিলা-সীটের আলাপ কানে এলো। একজন জিজ্ঞাসা করছেন "খবরের কাগজে যে সব রান্না বেরোয় তা কি তুমি পরীক্ষা ক'রে দেখেছ?" উত্তর শোনা গেল, "হ্যাঁ। নিয়মিত পরীক্ষা করি। তবে নির্দেশ মতো রান্না ক'রে আগে কর্তাকে খাইয়ে দেখি। যদি তিনদিনের মধ্যে তাঁর কিছু না হয়, কোনো অসুখবিসুখ না করে, তখন তা আমাদের সবার জন্য করি।" ১৪৯

মেলা অথচ লোক নেই

নাসিকের খবর—তথায় একটি বড় মেলা উপলক্ষে অনেকগুলি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু যাত্রীর অভাবে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। যখন প্রথম গাড়িখানি আসে সবাই বিস্মিত হয়ে দেখতে পান তা থেকে মাত্র চারজন যাত্রী নামছে। মেলা অফিসারগণ ও অন্যান্য উচ্চ কর্মচারীরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দেখেন মাত্র চারজন যাত্রী—এবং তারা সবাই ভিক্ষুক। পুনা থেকে আর একখানি স্পেশাল ট্রেন এলো, তা থেকে নামল ৬৪ জন যাত্রী, তার মধ্যে ২৪ জন ভিক্ষুক। ১৫০

মেলায় আদৌ লোক আসে না এ বড়ই আশ্চর্য। তবে কি বোম্বাই রাজ্য অনেক উন্নত? কারণ বড় মেলার নামে স্পেশাল ট্রেনেও মাত্র ২৮ জন ভিক্ষুক আসে যেখানে, সেখানে সাধারণ লোকেরা তো মেলার নামে নাসিকা কুঞ্চন করবেই। বিশেষ ক'রে নাসিকে উন্নাসিকের দল মরতে আসবে কেন। পরমাশ্চর্য ব্যাপার এই যে বোম্বাইতে এতগুলো সিনেমা স্টুডিও থাকাতেও ভিখারীর সংখ্যা এত কম। ১৫১, ২-১০-৫৫

প্রকৃতির আক্রমণ

গত যুদ্ধে জার্মান বিমানবহরের সঙ্গে ব্রিটেনের প্রাণান্তকর যুদ্ধের মতো বর্তমান আবহাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে ভারতবর্ষের। জার্মান বিমানবহর একের পর এক ব্রিটেনের শহরগুলি ধ্বংস করতে শুরু করেছিল। তেমনি বর্তমান আবহাওয়া ভারতের এক একটি রাজ্যকে পর পর ধ্বংস ক'রে চলে। হাওয়াই হামলার বদলে আবহাওয়াই হামলা। বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব—একে একে ঘায়েল হয়েছে—কখনো অনাবৃষ্টিতে, কখনো অতি বৃষ্টিতে। আরও যে সব রাজ্য বাকী আছে, যদি বন্যা বা ঝড়ে না কুলোয়—ভূমিকম্প আছে, মহামারী আছে। ১৫২

প্রকৃতি কতগুলো মূল আইন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে, স্থানীয় বা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের ছোটখাটো তথ্যে তার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই। সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে ঘোরার ব্যাপারে কখনো তার শিথিলতা নেই। ভুলেও কখনো দু'চার মিনিট থামবে না, কিন্তু অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প—এ সবের বেলায় সে কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। ১৫৩

পৃথিবীতে প্রাণীকুল আসবে ব'লে বহুদিন আগে থাকতে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু হাজার রকম ত্রুটি আছে তাতে। এখনও ভূগর্ভস্থ ভাঙা গড়া শেষ হয়নি। ভয়াবহ ভূমিকম্পে বা আগ্নেয়গিরিতে বিধ্বস্ত হচ্ছে শত শত বাড়িঘর এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এর কি দরকার ছিল? পৃথিবীকে কোনো একটা স্থায়ী পরিকল্পনার ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে তারপর প্রাণীকুল সৃষ্টি করা উচিত ছিল না কি? মানুষের শক্তি কম ব'লে সে স্থায়ী পরিকল্পনা করতে পারে না, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে, বিধাতার তো শক্তি কম নেই, তবে তিনি কেন এমন অস্থায়ী পরিকল্পনা করলেন? ১৫৪

বিধাতা বলতে পারেন: "যা পেয়েছ তার জন্যই কৃতজ্ঞ থাক। শুধু তাই নয়, জীবনটা এই রকম অনিশ্চিত ব'লেই তা এমন উপভোগ্য। দামোক্লিসের তরবারি-খানা একটি চুলে বেঁধে আমিই তোমাদের মাথার উপর সর্বদা ঝুলিয়ে রেখেছি, নইলে তোমাদের মনে কোনো বিস্ময় বা আনন্দ বা রহস্যবোধ থাকত না। এই অনিশ্চয়তা যে তোমাদের জীবনে কত বড় একটি আশীর্বাদ, তা বুঝতে শেখ, তা হলেই মনটা ভাল থাকবে।" ১৫৫

আমি কিন্তু বিধাতার এই কথার সবখানি মানতে রাজি নই। এতে তাঁর পলায়নী

মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তিনি স্বর্গের গজদন্ত মিনারে বাস ক'রে মাটির সুখ-দুঃখ সবখানি বুঝবেন কি ক'রে? বলতে চাই যে মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা থাক, যেমন আছে তেমনি থাক, কিন্তু মানুষকে হঠাৎ ব্যাপক মৃত্যু এবং হাজারে হাজারে অপ্রস্তুত মৃত্যুর মধ্যে না ফেললেই কি চলত না? ১৫৬

অকারণ এজন্য মানুষের কি বিরাট এবং ব্যাপক দুঃখ। কিন্তু তবু একথা ঠিক যে, বিধাতার এই চ্যালেঞ্জ মানুষ চিরদিন চুপ ক'রে মেনে নেবে না, এর উত্তর দেবে। মানুষের বুদ্ধি মানুষের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া এখন স্বয়ং বিধাতার পক্ষেও অসম্ভব। এই বুদ্ধিই তার আত্মরক্ষার সহায় হবে। মৃত্যুকে সে জয় করতে পারবে না, কিন্তু প্রকৃতিকে সে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে অনেকখানি। এ পথে ইতিমধ্যেই কিছু পরিমাণ এগিয়েছে সে। যে মানুষ জাতিগতভাবে আত্মধ্বংসের জন্য পরমাণু বোমা তৈরি করেছে, তাকে চিরদিনের মত দমিয়ে রাখা অসম্ভব। ১৫৭

ভগবান নরকেই বাস করুন

ইতিমধ্যে খবরের কাগজের একটি শিরোনামায় আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম ভগবান আত্মকৃত অন্যায়ের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ দার্শনিক ডক্টর রাধাকৃষ্ণন বলেছেন—"স্বর্গ নয়, নরকই ভগবানের উপযুক্ত বাসস্থান।" —কিন্তু তার পরের অংশ প'ড়ে দেখলাম আমার অনুমান আধা সত্য, পুরো সত্য নয়। তিনি বলেছেন: "আমি অবিরাম চিন্তার ফলে বুঝেছি ভগবানের স্থিতির পক্ষে যদি কোনো স্থান থেকে থাকে তবে তা স্বর্গ নয়, নরক।" কিন্তু তারপর কিছুক্ষণ থেমে বলেছেন—"সেখানকার লোকদের জন্যই বিশ্বপ্রেম ও মমত্ববোধ বেশি দরকার।" ১৫৮

এক চশমাবিক্রেতার উপদেশ মনে পড়ে। তিনি তাঁর পুত্রকে চশমার ব্যবসা শেখাচ্ছেন: "ধর, এই চশমা জোড়ার দাম দশ টাকা। কিন্তু দশ টাকা ব'লেই যে সব সময় দশ টাকায় বিক্রি করতে হবে তা নয়। চশমার দাম বলা একটা আর্ট, সেটি ভাল ক'রে শিখতে হবে। প্রথমে বলবে দশ টাকা, এবং ব'লে ক্রেতার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। যদি দেখ ক্রেতার মুখের ভাব বদলায়নি, তখন বলবে, 'চশমার কাঁচের দাম দশ টাকা।' তখনও যদি তার মুখে বিকার না দেখ তা হ'লে বলবে 'প্রত্যেকখানা কাঁচ দশ টাকা।' ক্রেতার মুখের ভাব ভাল ক'রে

লক্ষ করবে। এর পরেও যদি দেখ সে ঠিক আছে, তখন বলবে—'এবং ফ্রেমের দাম দশ টাকা।' এইভাবে তুমি চশমাটা ত্রিশ টাকায় বেচতে পারবে। কিন্তু যদি প্রথমে দশ টাকা শুনেই ক্রেতা চমকে ওঠে তা হ'লে দশ টাকাতেই ছেড়ে দিও, কারণ তাতেও সাত টাকা লাভ থাকবে।" ১৫৯,২৩-১০

পূজা সাহিত্যের সার্থকতা

নতুন জামাকাপড় কেনা পূজার প্রধান আকর্ষণ, তার পরেই পূজা-সাহিত্য। সাহিত্যের সঙ্গে পূজার সম্পর্ক ক্রমে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে যে, ভবিষ্যতে পূজার পোশাক কেনার রীতি বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে, শুধু এরই জন্য। ভবিষ্যতের পূজায় বিক্রি হবে শুধু পূজা-সাহিত্য এবং তার জন্য দোকানে দোকানে প'ড়ে যাবে কাড়াকাড়ি মারামারি। লাউড স্পীকারের স্থানই সর্বোচ্চ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে পূজা-সাহিত্যেব এগিয়ে যাবাব চান্স এখন সব চেয়ে বেশি। ১৬০

বর্তমানে সাধাবণ গল্প উপন্যাস প্রবন্ধের বইতে, এমনকি টেক্সট বইতে, যে ধরনেব টেক্সটাইল-অনুকৃত মলাটের ডিজাইন দেখা দিয়েছে তাতে ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত হচ্ছে সন্দেহ নেই। ছাপা শাড়ির ডিজাইনে এই যে বইয়ের মলাটের আবির্ভাব, এটি সত্যিই নিরর্থক নয়।. ভাবিকালের পূর্বাভাস বহন করছে এই সব ডিজাইন। এটি শাড়িকে উৎখাত করবার ডিজাইন। ১৬১

সত্যই তো, পূজায় জামাকাপড় কেনাব কি কোনো অর্থ হয়? কাপড় লোকের বারোমাস চাই, কারণ এটি অবসর বিনোদনের ব্যাপার নয়, মানসিক আনন্দের ব্যাপার নয়। এমন নয় যে মাসের পর মাস কাজ ক'রে কাজের উপর এমন অরুচি ধ'রে গেছে যে, পূজার সময় নতুন জামাকাপড় প'রে একটু ছুটির আনন্দ উপভোগ করি। আদৌ তা নয়। পোশাক দৈহিক প্রয়োজনের ব্যাপার। যে অবস্থাই হোক, লোকের কাপড় চাই। কিন্তু মানুষের জীবনে সাহিত্যের উদ্দেশ্য পৃথক। মনের আনন্দবিধান এর প্রধান লক্ষ্য। এই আনন্দ একটা কম্প্লেক্স বস্তু, এক কথায় বুঝিয়ে বলা শক্ত, তবু আনন্দ কথাটাই ব্যবহার্য। মোটকথা সাহিত্য মনের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিস, দেহের পক্ষে নয়; অতএব সাহিত্যের জন্য চাই অবসর, চাই ছুটি। সেই জন্যই পূজার ছুটির ব্যবস্থা। এ ছুটি কাপড় পরবার নয়, বই পড়বার। ১৬২

পূজার ছুটি ক্ষেত্রবিশেষে চারদিন থেকে একমাস। কাপড় পরতে দু'চার মিনিট মাত্র সময় লাগে। কাপড় পরার জন্য এত ঘটা ক'রে ছুটি দেওয়া হয় না, রেল ভ্রমণের কনসেশন দেওয়া হয় না। ছুটি দেওয়া হয় মানসিক ভোজের জন্য। বাঙালী বারোমাস দেহের ভোজের ব্যবস্থা ক'রে মনকে বঞ্চিত রাখে। অথবা করতে বাধ্য হয়। এটি অন্যায়। মনের জন্যও খাদ্য চাই দেহের মতোই। মনকে কল্পনার রাজ্যে উধাও করা দরকার, কিছুকালের জন্য বাজারের হিসাব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে। পূজার ছুটির এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। ৭৬৩

বছরে এই একবারই সাহিত্য-পাঠের ছুটি পাওয়া যায়, এবং একথা বাঙালী ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে। তাই পূজায় পূজা-সাহিত্যের এত বৃদ্ধি। এ সব সাহিত্য সবাই হয় তো পড়ে না, কিন্তু পড়া হোক বা না হোক একখানা বই কিনে বা উপহার দিয়ে যে আনন্দ, ঐ দামে অন্য কিছুতে সে আনন্দ নেই। ভাল একখানা বই হাতে থাকলে মানুষের একটা বড় পরিচয় ফুটে ওঠে, তার দাম কম নয়। মেয়েদের বেলাতেও অলঙ্কারবহুল হাতে একমুঠো অহঙ্কারের চেয়ে অলঙ্কারবিরল হাতের মুঠোয় একখানা ভাল বই থাকলে সে হাতের মর্যাদা অনেক বেশি। ৭৬৪

পূজা-সাহিত্য তাই ক্রমে বাড়ছে। ছোট ছেলেরাও পয়সা জমিয়ে জমিয়ে একখানা ক'রে পূজা-সাহিত্য বা'র করছে—প্রকাশনা বা সম্পাদনা বিদ্যা না জেনেও। এতে লোকসান নেই কিছু। আতসবাজির চেয়ে সাহিত্যবাজি অনেক ভাল। ছাপার অক্ষরে নাম দেখার মধ্যে একটা আত্মমর্যাদা আছে। লেখকে লেখকে ভেদবোধ ঘুচে যায়, নিজেকে সমসাময়িক লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। পূজা-সাহিত্য বাঙালী ছেলেদের এইভাবে হীনতার ভাব থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। ৭৬৫

এতে বনস্পতি শ্রেণীর (তেল নয়) লেখকদের একটা গৌণ লাভ অবশ্যই হচ্ছে। কারণ সাধারণ লোকের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস জাগছে এই সব ওষধি-সাহিত্যে। পড়ার নেশা একবার ধ'রে গেলে ছাড়ানো শক্ত। এই সব শস্তা-সাহিত্যে একবার নেশা ধ'রে গেলে পাঠক বইয়ের দোকানে যেতে বাধ্য হবে। আরও সাহিত্য চাই, আরও সাহিত্য চাই, দাবী শোনা যাবে তাদের মুখে। অতএব পূজা-সাহিত্যের প্লাবনে ভয় পাবার কিছু নেই, বরং এই সাহিত্যকে অভিনন্দন জানানোই উচিত। ৭৬৬

ঋতুব পুনর্বিন্যাস বাঞ্ছনীয়

বাংলাদেশে ছটি ঋতু আছে, এই মিথ্যা কথাটি অনেকদিন ধ'রে বাঙালী আত্মতৃপ্তভাবে মেনে চলেছে। সত্য কথাটা প্রকাশ করবার দিন কি এখনও আসেনি? মোহ সৃষ্টি ক'রে নিজেকে ভুলিকে রাখা সাময়িকভাবে দরকার হ'তে পারে, চিরদিনের জন্য নয়। মোহমুক্তির দিন এসেছে। এখন স্বীকার করা ভাল যে, বাংলাদেশে মোট চারটি ঋতু, ছটি নয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত ও শীত। শবৎ কালটা ধাপ্পা। ওটি সেকালের কোনো ঋতু-পুনর্গঠন কমিশনের কাজ। বসন্ত ঋতুও ধাপ্পা। বর্ষা ও শরৎ এক ঋতু আব বসন্ত ও গ্রীষ্ম এক ঋতুভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ বর্ষা ও শরতের মাতৃভাষা এক, বসন্ত ও গ্রীষ্মেব মাতৃভাষা এক। বর্ষা থেকে শবৎকে এবং গ্রীষ্ম থেকে বসন্তকে জোর ক'রে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া হয়েছে। হয়তো প্রাচীন কবিদের সুবিধার জন্য। আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথও প্রথা রক্ষা কবেছেন শবৎ ও বসন্তকে স্বীকার ক'রে। আসলে তাঁব শরৎ, হেমন্তেরই ছবি। 'আজি কি তোমার মধুব মুরতি' অবশ্যই ভাদ্র আশ্বিন বা আশ্বিন কার্তিকেব বাংলা নয়, ওটি অগ্রহায়ণের বাংলা। ১৬৭

অতএব শরৎকে বর্ষাব এবং বসন্তকে গ্রীষ্মেব অন্তর্ভুক্তির জন্য পুনরায় আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্ততপক্ষে শরৎকালকে বর্ষার অন্তর্ভুক্ত করা অবিলম্বে দরকার। নইলে সমস্ত ভাদ্র আশ্বিন এবং কার্তিকের অর্ধেক কালব্যাপী দেশ যখন বৃষ্টিতে, প্লাবনে এবং সাইক্লোনে বিধ্বস্ত হচ্ছে, তখন এই কালটিকে শরতকাল নাম দিয়ে রচনা বইতে বা কাব্যে এর নির্মল আকাশ আর নির্মল রৌদ্রালোকের মাহাত্ম্য কীর্তন কবার মানে হয না। আশাকরি ঋতু বিভাজনের এই ধাপ্পার কথাটা ভবিষ্যৎ কবি ও বচনা লেখকেরা মনে রাখবেন। ১৬৮

মেয়েরা চতুর্গুণ বুদ্ধিমতী

মাদ্রাজের বাজ্যপাল বলেছেন মেয়েরা পুরুষের তুলনায় চতুর্গুণ বুদ্ধিমতী। ঠিক কথাই বলেছেন। প্রাচীনেরাও এটা জানতেন। তাই নানাভাবে তাদের নির্বোধ বানাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু পুরুষেরা নির্বোধ বলেই স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি আন্দোলন প্রধানত পুরুষদের দিয়েই ওরা চালিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষদের তৈরি ফাঁদ ওরা পুরুষদের দিয়েই কাটিয়ে নিয়েছে। ওদের বুদ্ধির আর একটি প্রমাণ হচ্ছে ওরা এখনও বিয়ে করে পুরুষের উপার্জনে ভাগ বসাবে ব'লে। এবং নিজেরা খবরের কাগজ বা'র না ক'রে পুরুষ চালিত কাগজে সংখ্যালঘু এবং

অনুন্নত সম্প্রদায়ের নামে সংরক্ষিত বিশেষ আসনের (পৃথক নারী বিভাগ), এবং অন্যান্য পৃষ্ঠার মুক্ত ক্ষেত্রে সমান আসনের, সুবিধা ভোগ ক'রে থাকে। ১৬৯

৩০-১০ ৫৫

শুধু সাধুরা নয়

এক নির্জন পার্বত্য গুহায় তিন সাধু তপস্যায় রত ছিলেন। একদিন গুহার সামনে দিয়ে একটা জানোয়ার চ'লে গেল। এর এক বছর পর সাধুদের একজন ব'লে উঠলেন একটা চিতা গেল। এর দু বছর পর দ্বিতীয় সাধু বললেন চিতা নয়, টাইগার। আরও পাঁচ বছর পর তৃতীয় সাধু ব'লে উঠলেন তোমরা যদি এ রকম গোলমাল কর তা হ'লে আমি এখান থেকে উঠে যাব। ১৭০

কিন্তু সাধুও নয় বাঘও নয়, উত্তর প্রদেশের এডুকেশন বোর্ড ও পাঁচজন ইনভিজিলেটরের সম্পর্কে প্রায় ঐ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে। ইনভিজিলেটর, বাংলা ভাষায় 'গার্ড'। পরীক্ষায় অসাধুতার যাঁরা সাক্ষী থাকেন, তাঁরা। উত্তর প্রদেশের তাঁরা কার্যশেষে দৈনিক কাজের, ও (সম্ভবত) টাঙ্গা ভাড়ার জন্য, বোর্ডের কাছে বিল পাঠান ১৯৫০ সালে। এক বছর পর জবাব এলো—'তোমরা যে রেল ভ্রমণ করেছ তা জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে কি না এই মর্মে সার্টিফিকেট দাখিল কর।' স্তম্ভিত ইনভিজিলেটররা রেল ভ্রমণ আদৌ করেননি জানালেন। তিন বছর কেটে গেল। বোর্ড থেকে এলো জবাব—'তোমরা যে ইতিমধ্যে তোমাদের প্রাপ্য টাকা বোর্ড থেকে নাওনি সেই মর্মে পুনরায় সার্টিফিকেট দাখিল কর।" ১৭১

এই সংবাদ যিনি সরবরাহ করেছেন তিনি অতঃপর কি হবে, ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেছেন, বোর্ড সম্ভবত এর পর জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠাবেন—'তোমরা যে এখনও জীবিত আছ সেই মর্মে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল কর।' জিজ্ঞাসা করলে অন্যায় হবে না। কিন্তু বোর্ডের সঙ্গে উক্ত তপস্যারত সাধুদের তফাৎ এই যে, বোর্ড সরকারী বোর্ড, সাধুরা প্রাইভেট সাধু। ১৭২

স্বামীকে মারার অধিকার

বিলেতের এক আদালতে একবার এক অদ্ভুত ফৌজদারি কেস্-এর বিচার হয়। ফরিয়াদি জনৈক গ্যাস-পাইপ মেরামতকারী মিস্ত্রি, আর আসামী মিসেস জোন্স্

নামক এক স্ত্রীলোক। অভিযোগঃ উক্ত মিস্ত্রি গত সন্ধ্যায় মিস্টার জোন্‌সের বাড়িতে গ্যাস পাইপ মেরামত করতে যায়, সে সময় মিসেস জোন্‌স্ তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছেন। মিসেস জোন্‌স্ আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছিলেন, 'লোকটি সন্ধ্যায় এসেছিল, আমি ভাল দেখতে পাইনি, আমি তাকে আমার স্বামী মনে ক'রে মেরেছি। আমি নিরপরাধ।' ১১৩

মিসেস জোন্‌স্ বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন। কিন্তু এবারে আমেরিকায় যে ঘটনা ঘটেছে তাতে তো আর আত্মপক্ষ সমর্থনে বলবার কিছুই নেই। ঘটনাটি এই যে এক মার্কিন সুন্দরী তাঁর স্বামীকে অনধিকার প্রবেশকারী ভ্রমে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁকে কেউ সমর্থন করবেন ব'লে মনে হয় না। কারণ মিসেস জোন্‌সের পক্ষে যুক্তি ছিল, এঁর যুক্তি নেই। অর্থাৎ স্ত্রীর যে স্বামীকে মারবার অধিকার আছে, এটি সব দেশেই স্বীকৃত, কাজেই মিসেস জোন্‌স্ নিরপরাধ। কিন্তু মার্কিন সুন্দরী অন্য লোক ভ্রমে স্বামীকে মেরেছেন। অর্থাৎ অন্য লোককে স্বামী ভ্রমে মার দিলে শাস্তি হয় না, কিন্তু স্বামীকে অন্য লোক ভ্রমে মারলে শাস্তি হবেই। অবশ্য দুজনেই অনধিকারপ্রবেশকারী। এখন আইন যদি এই সত্য কথাটি স্বীকার ক'রে নেয় তবেই উক্ত সুন্দরী বাঁচতে পারে। ১১৪

দক্ষযজ্ঞ

বসুমতীতে প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানা যায়—তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত কোনো গ্রামে সম্প্রতি শ্বশুর ও জামাইয়ের মধ্যে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। গত ২০শে অক্টোবর (পূজার তিন দিন আগে) অন্য একটি গ্রামের জনৈক ব্যক্তি তার মেয়েকে পূজা উপলক্ষে নিজের বাড়িতে নেবার জন্য জামাই-বাড়িতে আসে। কিন্তু জামাই তাকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। তখন মেয়ের বাপ আরও লোক সংগ্রহ ক'রে মেয়েকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে লড়াই আরম্ভ হয়ে যায়, এবং মেয়ের শাশুড়িসহ তিনজন আহত হয়। এ সম্পর্কে একুশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—খবরে প্রকাশ। ১১৫

পূজার আগেই ঘটনাটা ঘটেছে, এর তাৎপর্য আছে। যাঁদের নিয়ে বাংলাদেশে পূজার এমন ঘটা তাঁদের কর্তা কি করেছিলেন? তিনি তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে যে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়েছিলেন তা সবারই জানা। সেই ভৃগুঋষির যজ্ঞ, শ্বশুর দক্ষকে শিবের অভিবাদন না করা, দক্ষের ক্রোধ, জামাই শিবকে অপমান, কন্যার কাছে

জামাইয়ের বিরুদ্ধে মানহানিকর উক্তি, সতীর দেহত্যাগ, এবং পরে শিবের অনুচরদের আক্রমণে যজ্ঞ পণ্ড, শ্বশুরের মুণ্ডপাত ইত্যাদি। তবে? ৭৭৬

লেখার নেশায়

পূজা-সাহিত্যের সংখ্যা এবারে অগণিত, তেমনি বাংলা দেশের কোনো কোনো লেখক ও লেখিকা এবারে এক মাসে এত গল্প লিখেছেন যে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো গল্প-লেখক বা লেখিকা এক মাসে এত গল্প লিখতে পারেন নি। শোনা যাচ্ছে দু-একজন লেখক ও লেখিকা অবিরাম লিখে চলেছেন—আজও। তাঁদের বলা হচ্ছে পূজা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সে কথা তাঁরা বিশ্বাস করছেন না। ৭৭৭,৬-১১-৫৫

স্বদেশী কুকুরের আচরণ

কলকাতার পথে দেশী কুকুরের সংখ্যা আবার খুব ভয়াবহ রকমের বেড়ে যাচ্ছে, সেদিন খবর বেরিয়েছে। এই দেশী কুকুরদের কেউ কেউ নাকি মানুষকে কামড়ায়। কিন্তু কেন কামড়ায়, তার কারণ অনুসন্ধান করা হয় নি। ধৈর্যের বাঁধ কতদূর পর্যন্ত ভাঙলেও ওরা অধৈর্য দেখায় না, তা আমি অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছি। পথে চলতে দেখলাম একটি দেশী কুকুর পথপার্শ্বের জঞ্জালের মধ্যে মুখ গুঁজে খাদ্য সন্ধানে ব্যস্ত ছিল, অন্য একটি কুকুর সেই দিকে যাচ্ছিল পথ অতিক্রম ক'রে। এমন সময় এক লাঠিধারী ছোকরা তাকে হঠাৎ চমকে দিয়ে মজা করার জন্য তার মাথা লক্ষ ক'রে লাঠি তুলে ধরল, কুকুরটিও চমকে উঠে তার প্রতিবাদে ভীষণভাবে চেঁচাতে লাগল। মজা হ'ল খুবই, কারণ কুকুরটি তাকে অপমানজনক ভাষায় শুধু গাল দিয়েই নিবৃত্ত হ'ল, কামড়ালে আর মজাটা হত না। পক্ষপাতিত্ব থাকলে কুকুরের বিরুদ্ধে কর্পোরেশনে অভিযোগ পাঠাতাম। কিন্তু আমি ছিলাম নিরপেক্ষ দর্শক, তাই মনে মনে তার প্রশংসা করলাম। ৭৭৮

প্রশংসার কারণ সহজেই অনুমেয়। দেশী পথের কুকুর, শিক্ষিত নয়, আদুরে নয়, সাবানঘষা মার্জিতদেহ নয়, উপরন্তু অনাহারে শীর্ণ। কিন্তু তবু এই রকম এক অনুন্নত সম্প্রদায়ের আত্মসংযমে অনভ্যস্ত দুঃখী কুকুর হলেও তার মান অপমান বোধ অবশ্যই আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সে নিষ্ঠুর আমোদপ্রিয় ছোকরাটিকে দংশনের বদলে তাকে শুধু তিরস্কার ক'রেই ক্ষান্ত হ'ল, এ তো শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির গুণেই। এ যদি কোনো বোম্বাই সিনেমা দেখা কক্কড় কুকুর হ'ত, তা হ'লে ছোকরাটি অত সহজে নিষ্কৃতি পেত না। ৭৭৯

কিন্তু তবু দেশী কুকুর এত অবহেলিত কেন? কেন তারা শ্রেণীহীন, গোত্রহীন, কুলহীন, শুধুই দেশী কুকুর? শুধুই পারিয়া ডগ্? এটি কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নয়। শুধু দেখতে খারাপ, তাই ওরা এমন ঘৃণিত। অথচ প্রভুভক্তিতে, চোর তাড়ানোয়, আদরে ল্যাজ নাড়ায়, দেশী কুকুর বিলিতি কুকুরের মতোই দক্ষ। সবার মতো না হ'লেও তাদের কোনো না কোনো একটি সম্প্রদায়ের সমান তো বটেই। দেশী কুকুরকে বিলিতি কুকুরের মতো সযত্নে সাবান ঘ'ষে পরীক্ষা ক'রে দেখলেই কথাটা সত্য কি না বোঝা যাবে। ১৮০

কিন্তু সাবান ঘষলেও যদি তার দেহ কর্কশ থাকে তবে মনে করতে বাধা কি যে দেশী পদ্মরও তো কর্কশ। তা ভিন্ন বর্তমানের এই মেক-আপের যুগে একটি কুকুরের চেহারা মনের মতো ক'রে বদলে নিতেই বা বাধা কোথায়? ওরা বাইরে ন্যাশন্যাল হ'লেও অন্তরে তো ইণ্টারন্যাশন্যাল বটেই। কুকুরত্ব নামক কুকুর-সারেই পৃথিবীর সকল কুকুর গড়া, যদিও বাইরে সম্প্রদায় বা প্রজাতির ছাপ এবং অন্তরে আদি-পুরুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের ভেদ। এ সত্য সাধারণ লোকে যদি নাও মানে, তবু কর্পোরেশনের মানা উচিত। কর্পোরেশন কেন যে সমস্যা সমাধানের সহজ পথ খুঁজছেন দেশী কুকুরদের হত্যাগৃহে পাঠিয়ে তা বোঝা যায় না। ১৮১

অবশ্য দেশী কুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ভয়ানক রকম। দেশী মানুষের সংখ্যাও তো ঐ একই রকম বাড়ছে। এবং মানুষরাও তো অধিকাংশই দেশী কুকুরের জীবনই যাপন করছে, ক্ষেপেও যাচ্ছে অনেক। কিন্তু তবু তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের মনুষ্যত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে যথাসাধ্য। তবে দেশী কুকুরদের যথার্থ কুকুরত্বে প্রতিষ্ঠা অসম্ভব মনে হবে কেন? ১৮২,২০-১১-৫৫